যেমন শুনিয়াছি

(তৃতীয় ভাগ)

শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর উপদেশ

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বেলানগর, পোঃ অভয়নগর, জেলা হাওড়া

প্রকাশক ঃ
[redacted]তিমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বেলানগর
পোঃ অভয়নগর—হাওড়া

প্রথম সংস্করণ
(তৃতীয় ভাগ)
১২ই আশ্বিন, সোমবার
১৩৬৬

মুদ্রাকর ঃ
ইম্প্রেশন
শ্রীসুধাতোষ বসু
৩৩ বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ ও ফটোমুদ্রন ঃ
কলো প্রিণ্ট
৯৫, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ ঃ
চিত্রকুমার
১২বি, গড়পার রোড
কলিকাতা—৯

ব্লক ঃ
ঈগল প্রসেস
৩৩ ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা—৬

বাঁধাই ঃ
গণেশ ভট্টাচার্য্য
৯৬, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা—৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ
১। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বেলানগর, হাওড়া,

৩। মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
(কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা—১২

উৎসর্গ

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদো লীলাসহচরোঽপিয়ঃ
অভেদানন্দরূপং তং কালীতপস্বিনং তথা
প্রণমামি সদাভক্ত্যা বেদান্তজ্ঞানভাস্করম্ ॥

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব !

"যেমন শুনিয়াছি" পাঠ করিয়া আপনি বলিয়াছিলেন, "তুই আমার মুখের কথাগুলি ঠিক লিখেছিস,—বেশ সুন্দর হয়েছে।"

আজ আপনার আশীর্বাদে উহার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। আপনার পাদপদ্মে পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম। আপনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন।

ইতি—

১২ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩৮২ } আপনার স্নেহের রবি

প্রকাশকের নিবেদন

গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥

অবসর সময়ে গুরুসঙ্গ লাভ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর অন্তরঙ্গ সেবক-শিষ্য স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ নিষ্ঠাসহকারে প্রত্যহ ডায়েরী রাখিতেন। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দও যেন তাঁহার বাণী জগতের কাছে প্রচারের জন্যই তদীয় সেবক-শিষ্য রবির নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। আজ তাঁহারই ইচ্ছায় ও শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় উহা ধীরে ধীরে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে।

"যেমন শুনিয়াছি" পুস্তকখানির প্রথম খণ্ড শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর জীবদ্দশাতেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে পুস্তকখানির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। অদ্য পুস্তকখানির তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। "যেমন শুনিয়াছি" পুস্তকখানির প্রথম খণ্ডের দুইটি সংস্করণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের একটি সংস্করণ অল্পদিনেই নিঃশেষ হওয়ায় আমরা উহার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। আশা করি এই খণ্ডটিও পূর্ব পূর্ব খণ্ডের ন্যায় ভক্তগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে। আমরা বিশ্বাস করি, এই জাতীয় পুস্তকের প্রয়োজন আমাদের জাতীয় জীবনে কখনও নিঃশেষ হইবে না এবং আজ এই অবক্ষয়ের দিনে উহা আরও গভীরভাবে অনুভূত হইতেছে। সেই জন্যই বর্তমানের এই আর্থিক সঙ্কটের দিনেও আমরা পুস্তকখানি প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই পুস্তকখানি পাঠে কেহ যদি সামান্যও উপকৃত হইয়া থাকেন, তবেই আমরা আমাদের যাবতীয় পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

ইতি—
বিনীত নিবেদক
শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়



ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।



শ্রীশ্রীসারদা দেবী।



শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ।



শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ



পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ।



পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ।



আমেরিকায় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ।



আমেরিকায় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ



প্রনাম রত

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ

(লণ্ডনে)



শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ।
(কালী তপস্বী)



আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ।



শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ



শ্রীশ্রীগুরুদেব স্বামী অভেদানন্দ সহ শিষ্য স্বামী অতুলানন্দ
(রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, কলিকাতা)

শ্রীমদ্ স্বামী অভেদানন্দ বন্দনা-পঞ্চকম্

ওঁ দিব্যমূর্তিধরং কৃপাযুতম্
বীরং যোগীশ্বরমতি পূতম্ ।
দেশিকেন্দ্রবরং সর্বনুতম্
নৌমি সদাচার্যাভেদানন্দম্ ॥ ১ ॥

সত্যং প্রেমময়ং সৌম্য-নিত্যম্
শিবং ক্ষমাময়ং শান্তচিত্তম্ ।
দানেষু বরেণ্যং জ্ঞানবিত্তম্
নৌমি সদাচার্যাভেদানন্দম্ ॥ ২ ॥

সদাব্রহ্মকথা-কৃতভাষম্
সভক্তদুষ্কৃতি কৃতনাশম্ ।
বদনকমলে ধৃতহাসম্
নৌমি সদাচার্যাভেদানন্দম্ ॥ ৩ ॥

কালীবেদান্তীতিখ্যাত বুদ্ধম্
দীপ্তানলসমং সদাশুদ্ধম্
হেলয়া কুতর্ক-কৃতরুদ্ধম্
নৌমি সদাচার্যাভেদানন্দম্ ॥ ৪ ॥

মন্ত্রজ্ঞং মন্ত্রদং যতিবরম্
রামকৃষ্ণ-লীলাসহচরম্ ।
শরণাগতেষু কৃপাকরম্
নৌমি সদাচার্যাভেদানন্দম্ ॥ ৫ ॥

ইতি বন্দনা-পঞ্চকম্ ।

স্বামী চিন্ময়ানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও লীলা-সহচর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জননী নয়নতারা দেবী কালীঘাটের মা কালীর নিকট একটি ভক্ত সন্তান প্রার্থনা করেন এবং মনস্কামনা পূর্ণ হইলে তিনি বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া মায়ের পূজা দিবেন বলিয়া মানৎ করেন। মা কালীর আশীর্বাদেই তিনি অভেদানন্দ মহারাজকে পুত্ররূপে লাভ করেন বলিয়া পুত্রের নাম রাখেন কালীপ্রসাদ। ১২৭৩ সালের ১৭ই আশ্বিন (১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা অক্টোবর) মঙ্গলবার, কৃষ্ণানবমী তিথিতে উত্তর কলিকাতার আহিরীটোলায় নিমু গোস্বামী লেনস্থ এক গৃহে কালীপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রসিকচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর একজন প্রবীণ (senior) শিক্ষক ছিলেন।

কালীপ্রসাদ প্রথমে যদু পণ্ডিতের বঙ্গ বিদ্যালয়ে এবং পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে শিক্ষা লাভ করেন। সেই সময়ে তিনি হাতীবাগানের টোলেও কাব্য-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে এনট্রান্স ক্লাসে পড়িবার কালেই তিনি ভট্টি, রঘুবংশ, কুমারসম্ভবাদি কাব্য এবং ভগবদ্গীতা, পাতঞ্জল দর্শন ও শিবসংহিতাদি ধর্মশাস্ত্র গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন।

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কালীপ্রসাদ যোগ সাধনের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হন এবং তজ্জন্য সদ্গুরুর অন্বেষণ করিতে থাকেন। সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যের নিকট দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজারী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংবাদ পাইয়া

তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য কালীপ্রসাদ ব্যাকুল হইয়া উঠেন। অবশেষে এক রবিবার বাটীস্থ সকলের অজ্ঞাতসারে পদব্রজে অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া, অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া বেলা প্রায় ১১টার সময় দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীর উত্তর ফটক দিয়া তিনি কালীমন্দিরে উপস্থিত হন। সেদিন প্রাতে পরমহংসদেব কলিকাতায় গিয়াছিলেন এবং তাঁহার ফিরিতে রাত্রি হইবে জানিয়া কালীপ্রসাদ সারাটা দিন সেখানেই অতিবাহিত করেন। রাত্রি ৯টার পর পরমহংসদেব লাটুর স্কন্ধে ভর দিয়া ভাবাবেশে টলিতে টলিতে এবং "কালী কালী কালী" (৩ বার) উচ্চারণ করিতে করিতে স্বীয় ঘরে প্রবেশ করেন। কালীপ্রসাদ ও পরমহংস-দেবের মধ্যে ইহাই প্রথম সাক্ষাৎ। ইহা ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগের কথা।

পরদিন কালীপ্রসাদ যোগশিক্ষা লাভের জন্য পরমহংসদেবের নিকট অভিলাষ জ্ঞাপন করেন পরমহংসদেব বলেন, "তুই গত জন্মে একজন বড় যোগী ছিলি, সিদ্ধি লাভের একটু বাকি ছিল। এই তোর শেষ জন্ম! আয়, তোকে যোগ সাধনের উপায় শিখিয়ে দিই।" এই কথা বলিয়া পরমহংসদেব কালীপ্রসাদের জিহ্বাগ্রে স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা একটি মন্ত্র লিখিয়া দেন এবং তাঁহার বক্ষোপরি দক্ষিণ কর স্থাপন করেন। নিমেষে কালীপ্রসাদ গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়েন। কালীপ্রসাদের বক্ষে হস্ত স্থাপন করিয়া পরমহংসদেব পুনরায় তাঁহার সংজ্ঞা আনয়ন করেন এবং নানাবিধ উপদেশ দিয়া তাঁহাকে বলেন,

"শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্যঘরে কবে শুবি।
তুই সতীনে পিরীত হ'লে তবে শ্যামা-মাকে পাবি॥"

সেইদিন হইতে কালীপ্রসাদ ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে থাকেন। কখনও কখনও পরমহংসদেব অন্য কাহাকেও বলিয়া কালীপ্রসাদকে নৌকা বা গাড়ী ভাড়া যোগাড় করিয়া দিতেন। কোন কারণে কালীপ্রসাদের দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বিলম্ব হইলে তিনি বলিতেন, "তুই না এলে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়।" পরমহংসদেব কলিকাতায় কোন ভক্তগৃহে গেলে কালীপ্রসাদকে তিনি সেখানে যাইয়াও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিতেন। কালীপ্রসাদ ও পরমহংসদেবের মধ্যে বন্ধন এই প্রকারেই ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে।

কালীপ্রসাদের ধ্যান গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। তিনি ধ্যানযোগে যখন যেরূপ দর্শন করিতেন সমস্তই পরমহংসদেবের নিকট বর্ণনা করিতেন। এক দিবস কালীপ্রসাদ ধ্যানে ভগবানের সর্বদর্শী-চক্ষু দর্শন

করিলেন। অপর এক দিবস তিনি গভীর ধ্যানে দর্শন করেন কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবী এবং বুদ্ধ, শঙ্কর, খ্রীস্ট, মহম্মদ প্রভৃতি অবতার পুরুষগণ জ্যোতির্ময় রামকৃষ্ণ মূর্তিতে একে একে মিশিয়া যাইতেছেন। এই দিব্য দর্শনের কথা শুনিয়া পরমহংসদেব কালীপ্রসাদকে বলিয়াছিলেন, "তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হল। এখন রূপ-দর্শনের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়েছিস্। এখন থেকে তুই অরূপের ঘরে উঠ্‌লি।"

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পরমহংসদেবের গলায় কর্কট রোগ (Cancer) ধরা পরে। তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতা শ্যামপুকুরের এক বাটীতে চিকিৎসার জন্য আনয়ন করা হইল। কালীপ্রসাদও এই সময় চিরতরে সংসার ত্যাগ করিয়া সারাক্ষণ পরমহংসদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গুরুসেবায় কালীপ্রসাদের অদ্ভুত নিষ্ঠা দেখিয়া তদীয় গুরুভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রায়শঃই বলিতেন, "Kali is the personal attache to His Holiness Sri Ramkrishna Paramhansa."

এক দিবস রাত্রিতে কালীপ্রসাদ পরমহংসদেবের সেবা করিতেছিলেন। ঘরে আর কেহই ছিল না। কালীপ্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া পরমহংসদেব অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তোর ভ্রূ দুটি, চোখ ও কপাল দেখে শ্রীকৃষ্ণের মুখের উদ্দীপনা হয় ও আমার ভেতর রাধার ভাব কেন জেগে ওঠে বল দেখি?" উত্তরে কালীপ্রসাদ বলেন, "আপনিই জানেন,—তা' আমি কি বলব?" পরমহংসদেব তখন বলিলেন, "তোর ভেতর শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে,—তা' না হলে আমার এ'রকম ভাব হবে কেন?"

কালীপ্রসাদকে পুনরায় সংসারে ফিরাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পিতা রসিকচন্দ্র অকস্মাৎ এক দিবস পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেব তখন রসিকচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তোমার এই ছেলে যুগে যুগে আমার সঙ্গে এসেছে ও আসবে। তাকে আমি খেয়ে ফেলেছি। এখন সে আর তোমার ছেলে নয়, সে আমার অন্তরঙ্গ পার্ষদ।" রসিকচন্দ্র বিফল মনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

পরমহংসদেবের সহিত কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অবস্থানকালে কালীপ্রসাদ গভীর অভিনিবেশ সহকারে গ্যানোর পদার্থ বিজ্ঞান, হর্সেলের জ্যোতির্বিজ্ঞান, জন স্টুয়ার্ট মিলের তর্কশাস্ত্র, লুইসের দর্শনের ইতিহাস, হ্যামিল্টনের দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। কালীপ্রসাদের অদ্ভুত পাঠস্পৃহা দেখিয়া পরমহংসদেব

এক দিবস তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুই-ই তো ছেলেদের মধ্যে 'বইপড়া' ঢোকালি!" কালীপ্রসাদের অলৌকিক মনীষার পরিচয় পাইয়া পরমহংসদেব অপর এক দিবস কালীপ্রসাদকে বলিয়াছিলেন, "ছেলেদের মধ্যে তুই খুব বুদ্ধিমান্, নরেনের নীচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, সেরকম তুইও পারবি।"

অপর এক দিবস সেবারত কালীপ্রসাদকে একাকী পাইয়া পরমহংসদেব হঠাৎ বালকের মত হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোকে আমি বুদ্ধিমান্ বলেই জানি, তুই বল্ দেখি,—নরেন বড়, কি আমি বড়?" ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কালীপ্রসাদ উত্তরে বলিলেন, "নরেন যদি আপনার চেয়ে বড় হয় তবে আপনার পায়ে মাথা দিয়ে সে জ্ঞান ভিক্ষা করবে কেন? সে যা জানে তা-ও তো আপনার কৃপাতেই লাভ করেছে।" কালীপ্রসাদের উত্তরে পরমহংসদেব সন্তোষ সহকারে বলিলেন, "তুই ঠিক বলেছিস্, তুই ঠিক বলেছিস্।"

সেদিন শিবরাত্রি। রাত্রিতে নরেন্দ্রনাথ ও কালীপ্রসাদ পাশাপাশি বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। ধ্যানান্তে নরেন্দ্রনাথ কালীপ্রসাদকে বলিলেন, "আমার শরীরে খুব জোরে একটা current (শক্তিপ্রবাহ) চল্‌ছে। পরমহংসদেব যে শক্তি সঞ্চার করেন তা' এই শক্তি কিনা, আমার হাতে হাত দিয়ে দেখতো।" কালীপ্রসাদ নরেন্দ্রনাথের দেহ স্পর্শ করিয়া অনুভব করিলেন নরেন্দ্রনাথের সর্বশরীর কাঁপিতেছে। নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু feel (অনুভব) কচ্ছ কি?" কালিপ্রসাদ বলিলেন, "হাঁ একটা strong vibration (জোর কম্পন) feel করছি।" সেই সময় ঘটনাস্থলে অন্য কেহ উপস্থিত ছিল না। অনেকে এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে নরেন্দ্রনাথ শক্তি সঞ্চার করিয়া কালীপ্রসাদকে জ্ঞানমার্গে আনয়ন করিলেন এবং এইজন্য নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, পরমহংসদেবই স্বয়ং কালীপ্রসাদকে জ্ঞানমার্গের উপদেশ দিতেন এবং কালীপ্রসাদের আধ্যাত্মিক জীবনও পরমহংসদেবের নিজ হস্তে গড়া। নরেন্দ্রনাথ শক্তিসঞ্চার করিয়া কালীপ্রসাদকে জ্ঞানমার্গে আনয়ন করেন নাই। ঐ সময় নরেন্দ্রনাথের মনে হয়ত একটা সামান্য অভিমান আসিয়াছিল যে, পরমহংসদেবের ন্যায় তাঁহার মধ্যেও শক্তিসঞ্চারের ক্ষমতা জন্মিয়াছে। পরমহংসদেবের তিরস্কারে নরেন্দ্রনাথের মন হইতে সেই অভিমান দূরীভূত হয়।

লীলা সংবরণের পূর্বে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে পরমহংসদেব যে এগার জন সন্তানকে স্বহস্তে গৈরিক বসন দান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কালীপ্রসাদও একজন। ইহার বৎসরাধিক কাল পরে (১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে) নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তাঁহারা বৈদিক বিধান অনুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কালীপ্রসাদ পরমহংস-দেবের পাদুকা সম্মুখে রাখিয়া বৈদিক বিধিমতে অগ্নিস্থাপন করিয়া বিরজাহোমের তন্ত্রধারক হইলেন এবং সকলে একত্রে আহুতি প্রদান করিলেন। কালীপ্রসাদ অদ্বৈত বেদান্তমতের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অভেদজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন বলিয়া নরেন্দ্রনাথ কালীপ্রসাদের ভাবানুসারে তাঁহার নাম দিলেন "স্বামী অভেদানন্দ"। বিরজাহোমের মন্ত্র কালীপ্রসাদই সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে পরমহংসদেবের লীলাবসানের পর স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু), স্বামী যোগানন্দ (যোগীন) ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী বৃন্দাবন গমন করেন। বৃন্দাবনে স্বামী অভেদানন্দ গভীর নির্জনে তপস্যা ও চুরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেন।

এদিকে পরমহংসদেবের গৃহী সন্তান সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় মাসিক ১১ টাকা ভাড়ায় বরাহনগরে এক পুরাতন বাটী সংগ্রহ করিয়া সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের জন্য মঠ স্থাপন করিয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামী অভেদানন্দ এই মঠেই অবস্থান করিতে থাকেন এবং মঠেই যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গভীর তপস্যা ও শাস্ত্রপাঠে নিমগ্ন হন।

এই কালে মঠে একদিবস একটি মজার ঘটনা ঘটে। ঐ দিবস মঠের রৌদ্রতপ্ত বারান্দায় শয়ন করিয়া তিনি ধ্যান করিতেছিলেন। শরীর মৃতবৎ অসাড় এবং নিস্পন্দ। মঠে বেড়াইতে আসিয়া মহেন্দ্রনাথ দত্ত (নরেন্দ্রনাথের অনুজ) কালীপ্রসাদকে ঐভাবে মাটিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে দুঃসহ তপোকষ্ট এবং আহারাদির ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া কালীপ্রসাদের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বিষণ্ণ চিত্তে মঠের অভ্যন্তরে আসিয়া তিনি স্বামী যোগানন্দকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহাকে এই দুঃসংবাদ দিলে স্বামী যোগানন্দ হাসিতে হাসিতে মন্তব্য করেন, "ও কি মরে ! ওই শালা অমনি করেই ধ্যান করে।" কালীপ্রসাদের অসাধারণ তপস্যা দেখিয়া তদীয় গুরু ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে "কালী তপস্বী" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

এই মঠে থাকিতেই তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কিত স্তোত্রগুলি এবং শ্রীশ্রীসারদাদেবী স্তোত্রটি (প্রকৃতিং পরমাং অভয়াং বরদাং) রচনা করেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী শেষোক্ত স্তোত্রটি শুনিয়া অতীব আহ্লাদের সহিত স্বামী অভেদানন্দকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, "তোমার মুখে সরস্বতী বসুক্।"

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ পুনরায় স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম), স্বামী সারদানন্দ (শরৎ) মহারাজের সহিত পুরীধামে যাইয়া ছয় মাস কাল অতিবাহিত করেন। পুরীধাম হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহারা ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং কতিপয় গুরুভ্রাতার সহিত পরমহংসদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটী গমন করেন। তথা হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদ লইয়া স্বামী অভেদানন্দ পরিব্রাজক বেশে ভারত পর্যটনে বহির্গত হইলেন। পথে গাজীপুরে তিনি পওহারী বাবাকে দর্শন করেন। এখানেই তিনি শ্রীশচন্দ্র বসু এবং ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় পরমহংসদেবের উপদেশগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ক্রমে স্বামী অভেদানন্দ কাশীধাম ও অযোধ্যা দর্শন করিয়া লক্ষ্ণৌ পৌঁছিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে তিনি হরিদ্বার হইয়া হৃষীকেশ হইতে উত্তরকাশী ও দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া তিনি বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হন। বদরিকাশ্রম হইতে কেদারনাথ গমন করিয়া স্বামী অভেদানন্দ কিছুকাল এক নির্জন পর্বতগুহায় থাকিয়া কঠোর তপস্যা করেন। এই স্থান হইতে তিনি গঙ্গোত্রী ও গোমুখী দর্শন করিতে গমন করেন। গঙ্গোত্রী হইতে পুনরায় তিনি উত্তরকাশী হইয়া যমুনোত্রী দর্শন করিতে গমন করেন। যমুনোত্রী দর্শন করিয়া যমুনার ধার দিয়া তিনি নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলেন এবং পর্যটনের পথে দেরাদুন হইয়া পুনরায় হৃষীকেশে আসিয়া উপস্থিত হন।

এইবার হৃষীকেশে আসিয়া স্বামী অভেদানন্দ কৈলাস মঠের বিখ্যাত ষড়দর্শনবিদ্ বেদান্তী ধনরাজ গিরির নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ধনরাজ গিরি অভেদানন্দের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "অভেদানন্দ অলৌকিকী প্রজ্ঞা।"

স্বামী অভেদানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানে যথার্থ সিদ্ধ হইয়াছেন কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য এই স্থানে কিছুকাল "বিষ্ঠা ও চন্দন এক", এই অভেদজ্ঞানের সাধনা করেন। ইহার কিছুকাল পর তিনি স্বেচ্ছায় স্বীয় দেহকে কঠিন রোগাক্রান্ত করিয়া পুনরায় ব্রহ্মজ্ঞানের পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় সাফল্যলাভের পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া স্বামী অভেদানন্দ হরিদ্বার হইয়া কাশী আগমন করেন।

কাশীতে স্বামী বিবেকানন্দ তখন মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী। এই সংবাদ শুনিবামাত্র স্বামী অভেদানন্দ গুরুভ্রাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং নিজে এই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন।

আরোগ্যলাভ করিয়া তিনি পুনরায় পর্যটনে বহির্গত হন এবং প্রয়াগের নিকটে যমুনার পরপারে ঝুসিতে যে সকল গুহা ছিল, তাহারই একটিতে কিছুকাল তপস্যা করেন। এইস্থানে তিনি রাজযোগের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

প্রয়াগ হইতে স্বামী অভেদানন্দ কাশীধামে প্রত্যাবর্তন করেন। কাশীধামে তিনি বিখ্যাত শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করেন এবং স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতীর সহিত বেদান্ত বিচার করেন। কাশীধাম হইতে স্বামী অভেদানন্দ বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

মঠে আসিয়া তিনি পুনরায় গভীরভাবে সাধন-ভজন ও শাস্ত্রালোচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। একদিবস স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী) তাঁহাকে গোপনে জানাইলেন যে তিনি অত্যধিক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন বলিয়া জনৈক গুরুভ্রাতা তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাকে মঠ হইতে বিতাড়িত করিবার চক্রান্ত হইতেছে। উক্ত গুরুভ্রাতার মতে মঠে শাস্ত্রাধ্যয়ন অন্যায়, কারণ পরমহংসদেব স্বয়ং লেখাপড়া করিতেন না। ইহা লইয়া গুরুভ্রাতাদের সহিত মনোমালিন্য ও বিবাদ হইবার আশঙ্কায় স্বামী অভেদানন্দ পুনরায় পর্যটনে বহির্গত হইলেন। কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, খেতড়ি, আবু, গির্নার প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি জুনাগড় গমন করেন। এই স্থানে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। স্বামী বিবেকানন্দের নিকট তিনি বরাহনগর মঠের ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন এবং তাঁহাকে জানাইয়া দেন যে তিনি আর কখনও বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, "তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান, তোমাদের লইয়াই মঠ ; তুমি মঠে না গেলে মঠ কাহার জন্য ?" অনেক বুঝাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করিতে রাজী করান।

জুনাগড় হইতে স্বামী অভেদানন্দ দ্বারকা ও প্রভাস তীর্থ দর্শন করিয়া জলপথে বোম্বাই আগমন করেন। বোম্বাই হইতে তিনি পুণা, বরোদা, নাসিক, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর গমন করেন। তথা হইতে তিনি তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, কাঞ্চী, কুম্ভকোনম্, কন্যা কুমারিকা

প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া মাদ্রাজ হইতে জলপথে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। মঠ তখন বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব সাফল্যলাভে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া জনৈক ব্রাহ্ম বঙ্গ সন্তান ও একদল খ্রীস্টান মিশনারী তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কুৎসা প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহারা প্রচার করেন যে বিবেকানন্দ ভারতীয় হিন্দুসমাজের প্রেরিত যোগ্য প্রতিনিধি নহেন এবং তিনি যে ধর্ম প্রচার করিতেছেন তাহাও প্রকৃত হিন্দুধর্ম নহে। স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতে এই সংবাদ আসিয়া ভারতবর্ষে পৌঁছাইলে কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের পক্ষ হইতে আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের কার্যের পূর্ণ সমর্থন করিয়া এক মহতী জনসভার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইল। স্বামী অভেদানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে কলিকাতার টাউন হলে এই সভার অনুষ্ঠান হয়। উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সভায় স্বামী বিবকানন্দ, ডাঃ ব্যারোজ (চিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের সভাপতি) এবং আমেরিকাবাসিগণকে ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণের পক্ষ হইতে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইল। এই সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "কালীবেদান্তী প্রাণপণে এই সময় খাটিয়াছিলেন। উন্মাদের মত দিবারাত্র কাজ করিয়া টাউন হলের সভা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সভার কার্যপ্রণালী মুদ্রিত করা এবং সেই সভার রিপোর্টগুলি নানা প্রেসে পাঠান প্রভৃতি সমস্ত কার্য তিনি সাধনার মতো করিয়াছিলেন।"

ইহার কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় পর্যটনে বহির্গত হন এবং নৈনীতাল প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আলমোড়ায় যাইয়া কয়েক মাস অতিবাহিত করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে স্বামী অভেদানন্দ বেদান্তধর্ম প্রচারের জন্য লণ্ডন যাত্রা করেন। লণ্ডনে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা (১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর) বেদান্তের "পঞ্চদশীর" উপর ভিত্তি করিয়া। স্বামী অভেদানন্দের এই বক্তৃতায় সমবেত সুধী শ্রোতৃবৃন্দ এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহারা সকলে এক বাক্যে তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্য প্রতিনিধিরূপে বর্ণনা করেন। স্বামী বিবেকানন্দের

ইংরাজ শিষ্য ক্যাপ্টেন স্যাভিয়ার এই বক্তৃতা শ্রবণে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "Swami Abhedananda is a born preacher ; wherever he will go he will have success." বক্তৃতায় গুরুভ্রাতার এই অসামান্য সাফল্য দর্শনে সমবেত পণ্ডিত জনমণ্ডলীকে স্বামী বিবেকানন্দও উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলিয়াছিলেন, "Even if I perish out of this plane my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it." স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যস্থতায় লণ্ডনে স্বামী অভেদানন্দ বিশ্ববিখ্যাত মনীষী অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এবং ডক্টর পল ডয়সনের সহিত পরিচিত হন। স্বামী অভেদানন্দের উপর ইউরোপে বেদান্তধর্ম প্রচার কার্যের গুরুদায়িত্বভার অর্পণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এক বৎসরকাল সাফল্য ও গৌরবের সহিত ইউরোপে কার্য করিবার পর স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দকে স্থায়ীভাবে আমেরিকায় বেদান্তধর্ম প্রচারের জন্য তথায় গমন করিতে হইল। নিউইয়র্কে প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তিনি যথারীতি কার্য আরম্ভ করেন।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার মিট্‌ফোর্ড, নিউটন, হাইল্যাণ্ড, স্যালেম, ডেট্রয়েট, মণ্টক্লেয়ার, এলিয়ট প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেকগুলি বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কের বিখ্যাত মট মেমোরিয়াল হলে ছয় মাসে 'বেদান্ত ও ধর্ম' সম্বন্ধে নব্বইটি মৌলিক চিন্তা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দান করেন। উক্ত বৎসরেই তিনি ওয়াশিংটনের সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত সমাজে কয়েকটি বক্তৃতা দান করেন। তথায় আমেরিকা যুক্তরাজ্যের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মিঃ ম্যককিনলির আমন্ত্রণে স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার সহিত রাষ্ট্রপতি ভবনে সাক্ষাৎ ও দার্শনিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। ভারতবাসীদের মধ্যে স্বামী অভেদানন্দই সর্বপ্রথম একজন বিদেশী রাষ্ট্রপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার (১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে) এই সুদুর্লভ সম্মানের অধিকারী হন।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিদ ডক্টর এলমার গেটসের সহিত এই সময় তাঁহার পরিচয় হয় এবং বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ মিঃ উইলিয়ম জেমসের আমন্ত্রণক্রমে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি "অদ্বৈতবাদ" সম্পর্কে বক্তৃতা দান করেন। আমেরিকার মনীষী সমাজে ক্রমেই স্বামী অভেদানন্দের সুখ্যাতি বিস্তৃত হইতে থাকে এবং তিনি অধ্যাপক ল্যানম্যান, রবার্ট ইঙ্গারসোল, রেভারেণ্ড ডক্টর

হিবার নিউটন, উইলিয়ম জ্যাক্সন, ডক্টর লুইস্ জি জেনস, অধ্যাপক জোসিয়া রয়েস প্রভৃতি মনীষীবৃন্দকে তাঁহাকে গুণগ্রাহী বন্ধুরূপে লাভ করেন।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইস্টার-পর্ব উপলক্ষে স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার চারিজন আমেরিকান শিষ্যকে ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত করেন। ইঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মচারী গুরুদাস পরবর্তীকালে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে সন্ন্যাস লাভ করিয়া স্বামী অতুলানন্দ নামে পরিচিত হন। স্বামী অভেদানন্দের নির্দেশে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া চিরতরে এই দেশেই থাকিয়া যান।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বারের জন্য আমেরিকা গমন করেন। স্বামী অভেদানন্দের উদ্যোগে নিউইয়র্কে ইত্যবসরে বেদান্ত সোসাইটির স্থায়ী ভবনের ব্যবস্থা হয়। অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রিয় গুরুভ্রাতার এই অভূতপূর্ব সাফল্য দর্শনে স্বামী বিবেকানন্দ সানন্দে স্বামী অভেদানন্দকে বলিয়াছিলেন, "Thrice I knocked at the door of New York, but it did not respond. I am glad that you have established a permanent headquarters. This is the first time I have found our home in New York." আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দের বেদান্তধর্ম প্রচারকার্যে এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার এই প্রিয় গুরু ভ্রাতাকে অন্ততঃ আরও দশ বৎসরকাল ঐ দেশে থাকিয়া কার্য করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। স্বামী অভেদানন্দ ইহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে এবং তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিতে চাহিলে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছিলেন, "I have no direction to give, I leave the work entirely to you." স্বামী বিবেকানন্দের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্বামী অভেদানন্দ স্বীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্বক পুনরায় প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দেই স্বামী অভেদানন্দের প্রথম গ্রন্থ Reincernation আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ এই গ্রন্থখানির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এই সময় মিস্ মিনিবুক নাম্নী স্বামী অভেদানন্দের এক শিষ্যা তাঁহাকে স্যান্ ফ্রান্সিস্কো হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে ১৬০ একর (৪৮৪ বিঘা) জমি দান করেন। এই জমি তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে অর্পণ করিলে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশানুযায়ী তদীয় গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরিনাথ)

তথায় গমন করেন এবং উক্ত জমিতে "শান্তি আশ্রম" নামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

আমেরিকায় অবস্থানকালে প্রায়শঃ নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকার হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ক্লার্ক, কলম্বিয়া, ইয়েল, বার্কলে এবং ইউরোপের অক্সফোর্ড, প্যারীস, বার্লিন, কীল, জেনেভা, প্রাগ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও ধর্মপ্রসঙ্গে বক্তৃতা করিতেন। স্বামী অভেদানন্দের সুগভীর পাণ্ডিত্য ও অপরিসীম মানব-প্রীতিতে মুগ্ধ হইয়া উদার মতের অনেক খ্রীস্টান যাজকও তাঁহাকে তাঁহাদের গির্জায় ধর্মোপদেশ দিতে মাঝে মাঝে আহ্বান করিতেন। নিউইয়র্ক হইতে স্বামী অভেদানন্দ বেদান্ত প্রচারের জন্য একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকাও (Vedanta Monthly Bulletin) প্রকাশ করিতেন।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রুকলীন ইনস্টিটিউট্ অব আর্টস এ্যাণ্ড সায়েন্সের পরিচালক ডক্টর ফ্রাঙ্কলীন ডব্লু হুবারের আমন্ত্রণে স্বামী অভেদানন্দ তথায় ভারতবর্ষের ধর্ম, দর্শন, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, হিন্দুনারীর আদর্শ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরস্পরের উপর প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে মৌলিক চিন্তা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিখ্যাত ধারাবাহিক বক্তৃতাগুলি প্রদান করেন। তাঁহার এই বক্তৃতামালাই পরবর্তীকালে India and her people গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি পাশ্চাত্য সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এই গ্রন্থ পাঠে বহু মনীষীর মনে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

স্বামী অভেদানন্দের চরিত্র-মাধুর্যে ও আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হইয়া আমেরিকার অনেক সম্ভ্রান্ত নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে স্বামী অতুলানন্দের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি ব্যতীত ব্রহ্মচারী রামদাস, ব্রহ্মচারী হরিদাস, ব্রহ্মচারী মহাদেব, ব্রহ্মচারিণী মহাদেবী, ব্রহ্মচারিণী কালী-মাতা, ব্রহ্মচারিণী কৃষ্ণমাতা, ব্রহ্মচারিণী সত্যপ্রাণা, ব্রহ্মচারিণী তেজস্বিনী, ব্রহ্ম-চারিণী সত্যপ্রিয়া, ব্রহ্মচারিণী ভবানী, ব্রহ্মচারিণী শিবানী, ব্রহ্মচারিণী গঙ্গা, ব্রহ্মচারিণী যমুনা প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুন স্বামী অভেদানন্দ পাঁচ মাস কালের জন্য ভারত-বর্ষে আগমন করেন। এই কয় মাস তিনি ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম, জাতীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত বৎসরই ১০ই নভেম্বর স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে করিয়া তিনি পুনরায় নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করেন। নিউইয়র্কে স্বামী পরমানন্দ

তাঁহার নিকট দুই বৎসরকাল বেদান্ত ধর্ম প্রচারকার্য সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। পরবর্তীকালে স্বামী পরমানন্দ বোস্টন বেদান্ত কেন্দ্রের ও লস এঞ্জেলস্, কালিফোর্নিয়ার আনন্দ-আশ্রমের অধ্যক্ষ হন।

এইবার তিনি ইউরোপ-আমেরিকায় এক নূতন পদ্ধতিতে বেদান্ত প্রচারের সংগঠন করেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসর তিনি স্বয়ং তিন চারি মাস কাল ইউরোপের বিভিন্ন বেদান্ত প্রচার-কার্য কেন্দ্রের অবস্থা পরিদর্শন করিতেন এবং লণ্ডন, প্যারীস, বার্লিন প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থানসমূহে ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করিতেন।

জনৈক শিষ্য স্বামী অভেদানন্দকে বার্কশায়ার নামক পল্লীতে প্রায় ১২০০ বিঘা জমি দান করিয়াছিলেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের তরুণ সন্ন্যাসীদের হস্তে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির কার্যভার অর্পণ করিয়া বার্কশায়ারের পার্বত্য পল্লী-অঞ্চলের উক্ত জমিতে ভারতীয় আর্য ঋষিদের অনুকরণে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বয়ং ভারতীয় প্রাচীন গুরুদের ন্যায় তাঁহার ইংরাজ, আমেরিকান, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি শিক্ষার্থী শিষ্যদিগকে বৃক্ষতলে আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রতিদিন যথারীতি ধর্ম, যোগ ও অন্যান্য সাধনপদ্ধতি শিক্ষা দিতেন।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ কিছুকালের জন্য সানফ্রান্সিস্কোতে আগমন করিয়া প্রচারকার্য ও সংগঠনের জন্য অবস্থান করেন। তথা হইতে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জুলাই প্রশান্ত মহাসাগরের পথে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে হনলুলুতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে তিনি একটি ভাষণ প্রদান করেন এবং জাপান, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় সাফল্যের সহিত ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বেদান্তধর্ম প্রচার করিয়া স্বামী অভেদানন্দ স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে বাস করিতে লাগিলেন এবং কলিকাতা সহরে তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হইল।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ মানসে কাশী, দিল্লী, লাহোর, রাওলপিণ্ডি হইয়া কাশ্মীর গমন করেন। কাশ্মীর হইতে তিনি পদব্রজে তিব্বতে উপস্থিত হন। তিব্বতের লে সহরে

বৌদ্ধ লামাদের হেমিস্ মঠে তিনি অবস্থান করেন। এই স্থানে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথি হইতে স্বামী অভেদানন্দ যিশু খ্রীস্টের জীবন সম্বন্ধে এক চাঞ্চল্যকর নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। উক্ত পুঁথিতে বর্ণিত হইয়াছে, ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যিশু খ্রীস্টের দেহত্যাগ হয় নাই। তিনি গোপনে ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। তিব্বত হইতে স্বামী অভেদানন্দ পেশোয়ার, জামরোড, লাণ্ডিকোটাল প্রভৃতি স্থানে গমন করেন।

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতাবাসীদের একান্ত অনুরোধে স্বামী অভেদানন্দ উত্তর কলিকাতা অঞ্চলে "শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ভাড়া বাড়ীতে মঠের কার্য নিষ্পন্ন হইত। পরে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা হাতীবাগান অঞ্চলে মঠের নিজস্ব জমি ক্রীত ও গৃহনির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। পরমহংসদেবের শততম জন্মতিথিতে (১৪ই মার্চ ১৯৩৬) স্বামী অভেদানন্দ উহার প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন করেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে দার্জিলিং সহরেও অনুরূপ একটি মঠ নির্মাণের জন্য তিনি জমি ক্রয় করেন এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মঠের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হয়। এই দুই মঠে অবস্থান করিয়া স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যদিগকে সেবাকার্যে যথোপযুক্তভাবে সংগঠিত করিতে থাকেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর বিভিন্ন কর্মোপলক্ষে যে সকল মনীষীর সহিত স্বামী অভেদানন্দের পরিচয় হয় তাঁহাদের মধ্যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কৃপাশরণ মহাস্থবির, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, লর্ড বিশপ ওয়েস্টকট, রেভারেণ্ড দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহাত্মা গান্ধী, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি), স্যার সি. ভি. রমণ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জ্যিয়াঁ হারবার, লুই সিনক্রেয়ার, লর্ড লিটন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্য শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে যে বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলন হয়, স্বামী অভেদানন্দ তাহার দুইটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১লা মার্চ তারিখে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সাধারণ সভাপতিরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ পাঠান্তে তিনি স্বামী অভেদানন্দকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তিনি এই দিবস বলেন যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের একজন দীন সন্তান ও সাক্ষাৎ

শিষ্যরূপে এবং সেই বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের সর্বশেষ একমাত্র জীবিত গুরুভ্রাতারূপে তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত প্রচারের জন্য তিনি যে পঞ্চবিংশতি বৎসর অশেষ বাধাবিঘ্নের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার সাফল্য পরিলক্ষিত হইতেছে মহাসভায় সমবেত প্রতিনিধিগণকে দর্শন করিয়া। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে। উক্ত সভায় তিনি আরও বলেন যে, প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করিয়াছিলেন,

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

কিন্তু সেই সুপ্রাচীন কালে এই ঘোষণার সত্যতাকে প্রমাণিত করিবার সুযোগ হয় নাই; কারণ তখন বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের উদ্ভব হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম-মতানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া এবং তাঁহার পূর্ববর্তী সকল অবতার, সাধক ও সিদ্ধ পুরুষের সম্মিলিত ধর্মজীবন নিজের মধ্যে যাপন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই মহতী ঘোষণাকে জীবন্ত সত্যরূপে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে সভাপতির আসন হইতে তিনি যে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন, তাহাতে তিনি ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া ও ভারত-বর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে দ্বিসহস্র বৎসর পূবে ঈশ্বরের সন্তান যিশু খ্রীস্ট জগতে সাম্য, মৈত্রী, শত্রুর প্রতি ভালবাসা স্থাপন করিবার জন্য যে বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, এখন নিশ্চয়ই সেই মহতী বাণী পুনরায় ঘোষণা করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এবং ধর্মগ্লানি বিনাশ করিয়া সত্য ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ এই যুগে নরদেহ ধারণ করিয়া পূর্ণাবতার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এমনি অপূর্ব ও অতুলনীয় ছিল তাঁহার জীবন যে, তাঁহার তিরোভাবের দশ বৎসরের মধ্যেই শুধু সমগ্র ভারতে নহে, ভারতের বাহিরেও উনবিংশ শতাব্দীর বহু প্রথিতযশা ইংরেজ ও জার্মান আচার্য ও মনীষীগণ যাঁহারা কিছুমাত্র এই অলৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদেরও হৃদয় উঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিভরে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে

স্বামী অভেদানন্দ অধ্যাপক সি. এইচ. টনি, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার, শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক্, মনীষী রোমাঁ রোলাঁ, ই. এফ. মেলফক্স প্রভৃতির নাম সশ্রদ্ধ চিত্তে উল্লেখ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ বলেন, "আমরা আদর্শ মহাপুরুষ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যেমন পবিত্র, সরল, কামজিৎ ও দিব্যভাবে পূর্ণ দেখিয়াছি তদপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন দেবমানব আমাদের কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি ছিলেন পবিত্রতার মূর্ত বিগ্রহ, অপহতকাম ও সত্যনিষ্ঠার জীবন্ত প্রতিমা। তাঁহার জীবন ছিল কামকাঞ্চন ত্যাগের সর্বোচ্চ অদ্বিতীয় আদর্শ। তিনি পার্থিব সুখ সাচ্ছন্দ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদ্যসীন ছিলেন, এমন কি জীবন ধারণ ব্যাপারকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিক্ষা দিয়াছেন নারীমাত্রেই আদ্যাশক্তি জগন্মাতার প্রতিনিধিস্বরূপা। পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম এই মত প্রচার করিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে কোন যুগে কোন দেশে কোন অবতার বা মহাপুরুষ এই মহান্ আদর্শ প্রচার করেন নাই। এই আদর্শের উপর নির্ভর করিতেছে আধুনিক সভ্য জগতে প্রচলিত অধর্ম, কলুষ ও পাপ হইতে সকল দেশের মানব জাতির, বিশেষতঃ নারীজাতির উদ্ধার ও ধর্মরক্ষা। তাঁহার বিবাহিত পত্নীকে তিনি সর্বদা শ্রদ্ধা করিতেন এবং জগন্মাতার প্রতিনিধিজ্ঞানে সম্মান দিতেন। তিনি তাঁহার পত্নীকে ষোড়শীদেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও দ্বিতীয় নাই।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলা জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই সভায় স্বামী অভেদানন্দ বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়াছিলেন বিশ্বমানবকে এই শিক্ষা দিতে যে ঈশ্বর এক, কিন্তু তাঁহার উপাসনার বিধান বহুরূপে আছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মানব তাঁহার এক একটি ভাব ও নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে। এই চিরন্তন সত্য ঘোষণা করা তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল জগন্মাতার উপাসনা প্রচলন করিয়া নারী জাতিকে দেবীত্বে উন্নীত করা। এই মহদুদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, যোগসাধনা দ্বারা যে সকল সিদ্ধাই লাভ করা যায় তাহা ভগবদ্দর্শন ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে বিষম অন্তরায়, সহায়ক নহে। আমরা দেখিয়াছি যে তাঁহার রোগারোগ্যকারিনী শক্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল, কিন্তু

তিনি উহা ব্যবহার করিতেন না। অধিকন্তু তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে সিদ্ধাই ও যোগের বিভূতি কামনা অথবা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতেন। তথাপি আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি একটি অলৌকিক দিব্য শক্তি ব্যবহার করিতেন যাহার প্রভাবে মহাপাপী দুশ্চরিত্র জীবের চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিত এবং একবার মাত্র স্পর্শ করিয়া তাহার মায়ামোহাচ্ছন্ন আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া উচ্চ সমাধির অবস্থাতে উন্নীত করিয়া দিতেন। এই শক্তির বিকাশ সাধারণতঃ যোগী সিদ্ধমহাপুরুষদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আরও দেখিয়াছি যে, তিনি মহাপাপীর পাপভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে পূত ও ধর্মভাবসম্পন্ন করিয়া দিতেন এবং তাঁহার শিষ্যগণের দিব্যচক্ষু উন্মীলন করাইয়া অসীম ব্রহ্মানন্দের অধিকারী করিয়া দিতেন।

আমরা স্বচক্ষে এই অবতার পুরুষের মর্ত্যলীলা অভিনীত হইতে দেখিয়াছি। যাহার দিব্যভাবের বিকাশে আজ সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাকে সর্বশেষ অবতার বলিয়া পূজা করিতেছে, আমরা স্বচক্ষে সেই মহাপুরুষকে দেখিয়াছি। যাহারা তাঁহার পবিত্রচরণ স্পর্শ করিতে পারিয়াছে এবং তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছে, তাহারাই ধন্য।"

উপসংহারে তিনি বলেন, "আমি আশা করি, এই ধর্মমহাসভার ফলে সকল সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান এবং ধর্মসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইবে।"

প্রকাশ্য জনসভায় ইহাই স্বামী অভেদানন্দের শেষ ভাষণ।

উক্ত বৎসরই ২১শে সেপ্টেম্বর দার্জিলিং হইতে কলিকাতা আসিবার পথে বাতাসিয়া লুপে স্বামী অভেদানন্দ এক ট্রেন দুর্ঘটনায় পতিত হন। ইহার পর হইতেই তাঁহার শরীর সুস্থ যাইতেছিল না। কলিকাতাস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের উপর তলাতেই তিনি অবস্থান করিতেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার অপ্রকাশিত বক্তৃতা ও রচনাবলী পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও সংশোধন করান। যে সকল ভক্ত ও ধর্মপিপাসু নরনারী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন, নিজ ঘরে বসিয়াই তিনি তাঁহাদের ধর্ম সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর ও ধর্মোপদেশ দান করিতেন। পরে রাত্রি দুই ঘটিকা পর্যন্ত তিনি তাঁহার শিষ্যবৃন্দ এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী সন্তানদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

কলিকাতার স্বনামখ্যাত কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া এই সময়ে তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছিলেন।

কিন্তু ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে অকস্মাৎ তাঁহার জ্বর হয় এবং শরীরের তাপ ১০৪° পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮ ঘটিকার পর তিনি শবাসনে ধ্যানস্থ হইয়া দেহত্যাগ করিবার মানসে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে দৃষ্টি স্থাপন করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সর্বসময়ের সেবক-শিষ্য (বর্তমান লেখক) বিষয়টি বুঝিতে পারিয়া অন্যান্য গুরু ভ্রাতাদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। সকলে সমবেত কণ্ঠে "হরি ওঁ রামকৃষ্ণ" এবং "জয় রামকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ঈষৎ মধুর হাস্যমুখে ধীরে ধীরে শ্বাসবায়ু ত্যাগ করিয়া ভারতীয় প্রাচীন আর্য মহাযোগীদের ন্যায় মহাসমাধিতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই দেহত্যাগের অপূর্ব ও অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া সমবেত সকলের মনে হইল গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই উক্তি—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথাবিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে স্বামী অভেদানন্দ দেহত্যাগের চৌদ্দ বৎসর পূর্বেই, যখন তিনি কলিকাতাস্থ বিডন স্ট্রীটে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন তাঁহার সেবক শিষ্যকে (বর্তমান লেখক) স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া নিজের দেহত্যাগ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "আমি ধ্যানস্থ হয়ে যোগাসনে দেহত্যাগ করব। আমার দেহত্যাগের সময় সংকীর্তন হতে থাকবে।" সত্যদ্রষ্টা ঋষির কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল।

স্বীয় সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দের প্রতি স্বামী অভেদানন্দের শেষ আদেশ ছিল, "কাশীপুর শ্মশানে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরণতলে আমাকে রাখিস্।" তদনুসারে শোভাযাত্রা সহকারে পুষ্প, মাল্য, চন্দন, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া স্বামী অভেদানন্দের মরদেহ কাশীপুর শ্মশানে আনয়ন করা হয়। সেখানেও তখন পদাবলী কীর্তন চলিতেছে। জয় রামকৃষ্ণ! *

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী সন্তানগণের মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ এবং সর্বশেষে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ দেহরক্ষা করেন।

"সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে"

স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার বি. সি. চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, "কলম্বাস আমেরিকার দেহ আবিষ্কার করেন; কিন্তু ভারতের দুই অমর সন্তান, বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ আমেরিকার আত্মা আবিষ্কার করেন।"

তিনি অন্যত্র এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "ঐতিহাসিকের ভাষায় বলিতে গেলে একজনকে বাদ দিয়া আর একজনের কথা ভাবা যায় না। পাশ্চাত্যের সেই সুদূর পশ্চিম জগতে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের দীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। একথা কে না জানে? কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটিও বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, আর কেহ নহেন, কেবল অভেদানন্দই সেই দীপটিকে প্রজ্বলিত রাখিয়াছিলেন, উহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিজের সমগ্র জীবনের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সাধনা দিয়া সেই শিখাটিকে এমনভাবেই পরিবর্ধিত করিয়াছিলেন যে, যাহা ছিল একদিন একটি শিখামাত্র, তাহাই হইয়া উঠিল অপূর্ব প্রভায় সমুজ্জ্বল একটি অনির্বাণ হোমানল। রামকৃষ্ণ মিশনের যে সকল প্রতিষ্ঠান সে দেশে জন্মলাভ করিয়াছে—অভেদানন্দের আত্মাহুতির পশ্চাতে যে দুষ্কর কর্মপ্রচেষ্টা বতমান ছিল—সেগুলি তাহারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।"

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী অধ্যাপক বিনয় সরকার তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় স্বামী অভেদানন্দের কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "রামকৃষ্ণ—সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ বাস্তবিক পক্ষে কানাই-বলাই।…অভেদানন্দ বিবেকানন্দের কাজগুলো বজায় রাখতে পেরেছেন—ফুলিয়ে তুলেছেন—বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রথম কয়েক বছর ধ'রে বিবেকানন্দকে

ইউরোপামেরিকায় বাড়তির পথে ঠেলে তুলেছিলেন অভেদানন্দ। …রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-যুগে প্রথম ঘটনাগুলার ভেতর বিবেকের কথা বলতে গেলে অভেদকে টান্‌তে হ'বে, আর অভেদের কথা বল্‌তে গেলে বিবেককেও টান্‌তে হবে।

যুবক ভারতের ইতিহাস যারা আলোচনা করতে চায় তারা এই দু'জনকে অন্তত সেই দশ বছরের জন্য জার্মান-সমাজতন্ত্রী মার্কস ও এঙ্গেল্‌সের মতন পুরামাত্রায় সহযোগীরূপে বিবৃত করতে বাধ্য। আমাদের দেশী দৃষ্টান্ত দিয়ে বল্‌বো যে, বিবেক আর অভেদ—এই দু'জন যেন আমাদের একালের বৈদিক অশ্বিনীকুমারদ্বয়।"

স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি) মাদ্রাজ হইতে লিখিয়াছিলেন, "স্বামী অভেদানন্দকে দুই একবার দর্শন করিবার সুযোগ আমার হইয়া ছল। আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং ধর্মতত্ত্ব তিনি যে-ভাবে পাশ্চাত্য শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট প্রচার করিয়াছেন, উহার উচ্চ প্রশংসা আমি সর্বত্র শুনিয়াছি। ভারতবর্ষে আমরা অনেকে তাঁহার রচনা পাঠে উপকৃত হইয়াছি।"

বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক স্যার সি. ভি. রমণ বাঙ্গালোর হইতে লিখিয়াছিলেন, "আমি ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে দার্জিলিং শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে স্বামী অভেদানন্দজীকে দর্শন করিয়াছিলাম। তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও পাণ্ডিত্যে আমি মুগ্ধ। তিনি বিদেশে আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির যেভাবে প্রচার করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে চিরস্মরণীয়।"

স্বামী অভেদানন্দ রচিত ও সম্পাদিত বিখ্যাত পুস্তকাবলী: (1) The sayings of Ramkrishna. (2) Mystery of death. (3) Life beyond death. (4) True Psychology. (5) Why a Hindu accepts Christ and rejects churchianity. (6) Science of Psychic Phenomena. (7) Path of Realization. (8) Attitude of Vedanta towards religion. (9) Religion of the twentieth century. (10) Philosophy and Religion. (11) Word and cross in ancient India. (12) India and her people. (13) Christian Science and Vedanta. (14) How to be a Yogi. (15) Divine heritage of man. (16) Swami

Vivekananda and his work. (17) Self Knowledge. (18) Doctrine of Karma. (19) Lectures in India. (20) Reincarnation. (21) Unity and harmony. (22) Spiritual unfoldment. (23) Ideal of education. (24) Great saviours of the world. (25) Memories of Ramkrishna. (25) Human affection and love. (27) An introduction of the Philosophy of Panchadasi. (28) Yoga psychology. (29) Vedanta Philosophy. (30) Bhagavad Gita the Synthesis. (31) হিন্দুনারী। (32) স্তোত্র-রত্নাকর। (33) কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ।

স্বামী অভেদানন্দ রচিত ইংরাজী গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতিপয় গ্রন্থকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে; তন্মধ্যে বিখ্যাত—(১) মরণের পারে, (২) পনর্জন্মবাদ, (৩) শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম, (৪) কর্মবিজ্ঞান, (৫) আত্ম-বিকাশ, (৬) ভালবাসা ও ভগবৎ প্রেম, (৭) মনের বিচিত্র রূপ, (৮) আত্মজ্ঞান, (৯) যোগশিক্ষা, (১০) ভারতীয় সংস্কৃতি।

স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এবং মিঃ জে. এইচ্. মুইর হেড কর্তৃক সম্পাদিত "আধুনিক ভারতীয় দর্শন" নামক সুবৃহৎ ইংরাজী গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দের "ভারতীয় হিন্দু দর্শন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে। উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "অদ্বৈত বেদান্ত পৃথিবীর সমস্ত দর্শনের শীর্ষস্থানীয়। পৃথিবীর অতি অল্প সংখ্যক দার্শনিকই এই বেদান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অথচ বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের সকল জটিল সমস্যার সমাধান উহাতে নিহিত।"

The religion of the twentieth century (বিংশ শতাব্দীর ধর্ম) পুস্তিকাখানিতে স্বামীজী মহারাজ বলেন যে, বিংশ শতাব্দী হইতেছে বিজ্ঞানের যুগ। যাহা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, বিজ্ঞান তাহাকে কখনও গ্রহণ করে না। সুতরাং বর্তমান যুগে ধর্ম হইবে বিজ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। একমাত্র বেদান্ত ধর্মই বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মই এত বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ নহে। উহারা উহাদের প্রতিষ্ঠাতাদের ব্যক্তিত্বের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। খ্রীস্টধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে যিশু খ্রীস্টের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া, বৌদ্ধধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া, ইসলাম-ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে মহম্মদের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া। কোন

ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক ধর্মই পৃথিবীতে সার্বজনীন ধর্ম হইতে পারে না। কারণ ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে সঙ্ঘাত অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র বেদান্ত ধর্মই কোন ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক ধর্ম নহে। যে আধ্যাত্মিক অনুশাসনগুলি জীবের আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করে, বেদান্তধর্ম সেই অনুশাসনগুলির উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহা পাঁচ সহস্র বৎসরের প্রাচীন ধর্ম এবং আরও অনন্ত কাল ইহা পৃথিবীতে প্রচলিত থাকিবে।

পুস্তিকাখানির পরিশেষে স্বামিজী মহারাজ বলেন যে, একমাত্র বেদান্ত ধর্মই, যাহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, জগতে প্রচার করা উচিত এবং ইহা দ্বারাই পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদিগের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। বিংশ শতাব্দীতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়োজন, একমাত্র বেদান্ত ধর্ম প্রচারের মাধ্যমেই তাহা করা সম্ভব। এই সম্পর্কে মনীষী ম্যাক্সমূলারও বলেন, "বেদান্তই যাবতীয় দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা প্রচলিত ধর্মগুলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। বেদান্তই পৃথিবীর সমস্ত প্রচলিত ধর্মকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে।"

স্বামী অভেদানন্দের একটি গ্রন্থের নাম "কেন হিন্দু যিশু খ্রীস্টকে গ্রহণ করে এবং গীর্জার ধর্মকে বর্জন করে।" এই গ্রন্থে তিনি বলেন, "খ্রীস্টবাণী হইতে গীর্জার বাণী স্বতন্ত্র। খ্রীস্ট এবং তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যগণ যে ধর্ম প্রচার করেন, উহার সহিত ভারতীয় ধর্মের নিকট সাদৃশ্য আছে।"

"বিশ্বের ক্রমবিকাশ ও উদ্দেশ্য" শীর্ষক এক প্রবন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেন, *"যখন আধ্যাত্মিকতা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় তখন মানবাত্মা উহার ব্রহ্মস্বরূপ* উপলব্ধি করে। পার্থিব জীবনে প্রতি মুহূর্তে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দিব্যভাব বিকাশ করেন। তখনই ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়। আমরা সকলে নিশ্চয়ই সেই অধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করিয়া ধন্য হইব।"

বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিসভায় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বক্তৃতা

আপনারা আমার পূর্ববর্তী বক্তাদের নিকট হতে শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দ) জীবনের কাহিনী ও গুণাবলীর কিছু শুনলেন। এখন আমাকে তাঁর বিষয়ে কিছু বলতে হবে। কিন্তু আমি আর কি বলব! আমি বলতে পারছি না। তাঁর দেহত্যাগে আমার দক্ষিণ অঙ্গ যেন খসে পড়েছে। আমার বাক্‌রোধ হয়ে যাচ্ছে! চোখ দিয়ে জল আস্‌ছে। আমার হৃদয়ের ভিতরে কি বেদনা হচ্ছে, তা' আমি প্রকাশ করতে পারছি না। আমাদের গুরু-ভাইদের মধ্যে কি গভীর ভালবাসা, তা' বর্ণনাতীত,—বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না! লোকাতীত ভালবাসা। মায়ের পেটের ভাইদের চেয়ে অধিক ভালবাসা।

আমার পূর্বকাহিনী সব স্মরণ হচ্ছে। ঐ দক্ষিণেশ্বরে থেকে ঠাকুরের নিকটে আমরা একত্রে শিক্ষা গ্রহণ করি। শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুর বাগানে এগার জনকে গেরুয়া দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এই সারদানন্দ স্বামী একজন। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের গেরুয়া দান করার পর বলেছিলেন যে,—তোরা আমার জন্য ভিক্ষা করতে পারবি? তাইতে আমরা বলেছিলাম, হ্যাঁ, পারবো! তারপর বিবেকানন্দ প্রমুখ আমরা মুষ্টিভিক্ষা করে আনলাম। ভিক্ষায় যা' পেয়েছিলাম, তা' শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট রেখে দিলাম। শ্রীমা (সারদা দেবী) তা' রেঁধে ঠাকুরকে দিলেন। ঠাকুর খেয়ে বললেন,—ভিক্ষান্ন হচ্ছে অতি পবিত্র। এই আমাদের জীবনের প্রথম ভিক্ষা। এর পূর্বে কখনও ভিক্ষা করিনি! এসব কথা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। সময় অল্প, সেজন্য সংক্ষেপে বলব।

ঠাকুরের অসুখের সময় ভক্তেরা যখন ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর হতে শ্যামপুকুরের বাসায় আনলেন, সেই সময় হতে আমরা সকলেই ঠাকুরের সেবা করতাম। সে সময় রাত্রিতে স্বামীজী বাগানে গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে জপধ্যান করতে বলতেন। শরৎ আর আমি তাঁর পাশে বসে জপধ্যান করতাম। কত শাস্ত্রালাপ হ'ত,—স্তবপাঠ, গান হ'ত। স্বামীজী আমাদের যা' করতে বলতেন, তাই

করতাম। সেজন্য স্বামীজী আমাদের নাম রেখেছিলেন—কালুয়া, ভুলুয়া। স্বামীজী শরৎ মহারাজকে ভুলুয়া বলতেন, আর আমাকে বলতেন কালুয়া। স্বামীজীর সাধনার স্থানে আমরাই তাঁর দুই সঙ্গী ছিলাম।

কাশীপুরে ঠাকুরের দেহত্যাগ হবার পর রামচন্দ্র দত্ত বলেছিলেন,—এখন সব শেষ হয়ে গেল! তোমরা সকলে আপন-আপন বাড়ীতে ফিরে যাও। সেই সময়ে স্বামীজী, শশী মহারাজ, শরৎ মহারাজ বাড়ী ফিরে এলেন। শরৎ মহারাজ পূর্বে মেডিকেল কলেজে পড়তেন। পুনরায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। আমি কিন্তু আর বাড়ী ফিরে গেলাম না,—যোগেন মহারাজ ও লাটু মহারাজের সঙ্গে শ্রীমাকে নিয়ে বৃন্দাবনে গেলাম। এদিকে সুরেশ মিত্র মশাই আমাদের মঠের জন্য বরাহনগরে একটা বাড়ী ভাড়া করলেন। সকলে সেটাকে ভূতের বাড়ী বলত। মাসে এগার টাকা করে ভাড়া দিতেন।

শরৎ মহারাজদের বাড়ী ছিল—যেখানে আমহার্স্ট স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোড কাট্ (cut) করেছে,—সেইখানে। এ বহুদিনের কথা। শরৎ মহারাজকে বাড়ী হতে আমরা টেনে আন্‌লাম। সুরেশ মিত্র বাড়ীর ভাড়াটা দিতেন, আর আমরা ভিক্ষে করে আমাদের আহার জোগাড় করতাম। ঐ বরাহনগর মঠে আমরা একত্র মিলে তপস্যা করতাম। বৈদিক বিধি-শাস্ত্র মতে বিরজা হোম করে আমরা সন্ন্যাস নিলাম। যাঁর যাঁর নিজের ভাবানুযায়ী নাম হল। ঐ স্বামীজীর নাম ছিল "বিবিদিষানন্দ" : যখন পরিব্রাজক অবস্থায় ছিলেন, ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন—তখন নাম ছিল "সচ্চিদানন্দ",—পাছে আমরা চিনে ফেলব। চিকাগোতে স্বামীজীর নাম হল "বিবেকানন্দ"। সেই নামই রয়ে গেল। ঐ নামেই বিশ্বজয়ী হলেন। শ্রীমার নাম ছিল সারদা দেবী। শরৎ মহারাজ সারদা দেবীর সেবা করতেন। সারদা দেবী তাঁকে খুব ভালবাসতেন। সেইজন্যে শরৎ মহারাজের নাম হল "সারদানন্দ"। আমি অভেদজ্ঞান ভালবাসতাম। তাইতে আমার নাম হল "অভেদানন্দ"। বরাহনগর মঠে সন্ন্যাস নেবার পর আমরা পদব্রজে ভারতের নানা তীর্থে, নানাস্থানে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে ঘুরে বেড়াতাম আর সর্বদা তপস্যা করতাম। শরৎ মহারাজ, স্বামী প্রেমানন্দ আর আমি একত্রে ছয় মাস পুরীতে থেকে তপস্যা করেছিলাম। এই রকম ভারতের নানাস্থানে, কখনো হিমালয়ে থেকে কঠোর তপস্যা করে সকলে দিন কাটিয়েছেন।

স্বামীজী তাঁর কার্যে সাহায্য করবার জন্য শরৎ মহারাজকে প্রথম বিলাতে

ডেকে পাঠান, তারপরে আমাকে ডাকেন। আমি যখন নিউইয়র্ক (New York) ছিলাম তখন শরৎ মহারাজ আমেরিকাতে প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য নরনারীরা সকলেই তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়েছিল। তিনি এদেশে প্রত্যাবর্তন করে সে গৌরবও বিসর্জন দেন, কখনো আত্মশ্লাঘা করেন নি। স্বামীজী আমেরিকা হতে ফিরে এসে যখন এদেশে মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন শরৎ মহারাজকে তার সেক্রেটারী করলেন আর রাখাল মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রেসিডেণ্ট করলেন। শরৎ মহারাজ জীবনে এই সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করলেন না। তিনি প্রেসিডেণ্ট হতে চাইলেন না,—সেক্রেটারী হয়েই রইলেন। আমি যখন ১৯০৬ সালে আমেরিকা হতে ফিরে আসি তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে পুরীতে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন, শরৎকে কেউ কেউ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট করতে চায়; আমি ঐ পদ ত্যাগ করব। ঐ কথা শুনে আমি বলেছিলাম,—সে কি! তুমি হচ্ছ আমাদের রাখাল রাজা! তুমি যতদিন বাঁচবে ততদিন তুমিই মিশনের প্রেসিডেণ্ট থাকবে। তোমার স্থান কেউ অধিকার করতে পারবে না। এ বিষয়ে আমি প্রস্তাব করব। পরে বেলুড় মঠে এসে আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে, রাখাল মহারাজকে Life President করা হোক। এই প্রস্তাবটি সকলেই অনুমোদন করেছিল।

আজ দেশে দেশে, স্থানে স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম, শাখাকেন্দ্র (centre) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর কত কাজ হতেছে। লোকের কত উপকার হচ্ছে। এই সবের মূল কর্মী ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। তিনি ত্রিশ বৎসর মিশনের সম্পাদকের কার্য করে এই রামকৃষ্ণ মিশনের এত উন্নতি করে গিয়েছেন। আমি যখন ১৯০৬ সালে এদেশে আসি, তখন রামকৃষ্ণ মিশনের এত উন্নতি হয়নি। এই বেলুড় মঠ অতি ক্ষুদ্রকায় ছিল। দুঃস্থের সেবা করা শরৎ মহারাজের একটি ব্রত ছিল। এমন প্রাণ দিয়ে সেবা করতে আর কাউকে আমি দেখিনি। আমি তা' বাক্যে প্রকাশ করতে পারি না। তার সেবা জগতে অতুলনীয়। বেলুড় মঠ হবার পূর্বে আমরা যখন আলমবাজারে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে থাকতাম, তখন আমার পায়ের অসুখে প্রায় চার মাস আমি শয্যাগত ছিলাম। সেই সময় শরৎ মহারাজ প্রাণ দিয়ে আমার সেবা করেছিলেন। সে সেবা কখনো মানুষ করতে পারে না, দেবতা ভিন্ন! তিনি সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন। তিনি স্বর্গে চলে গেলেন। ঠাকুরের লীলাসহচর ঠাকুরের সান্নিধ্যে—

রামকৃষ্ণলোকে চলে গিয়েছেন। একে একে, পর পর সকলেই চলে যাবে। তাঁর সন্তানদের তিনি একের পর একজনকে নিয়ে যাবেন। যাঁরা আছেন, তাঁরা শীঘ্রই যেতে পারেন, আবার কিছুদিন পরেও যেতে পারেন। সবই তাঁর ইচ্ছা। মানুষের ইচ্ছাতে তো নয়, সবই ঠাকুরের ইচ্ছা। আপনারা তাঁর স্বর্গারোহণে শোক করবেন না। মুক্তাত্মা সন্ন্যাসীর জন্য শোক করতে নাই। আপনারা এইসব মহাপুরুষের আদর্শ গ্রহণ করে,—স্বামী সারদানন্দের, স্বামী বিবেকানন্দের, স্বামী ব্রহ্মানন্দের, স্বামী প্রেমানন্দের আদর্শ—আপনাদের জীবন ধন্য করুন,—কৃতকৃতার্থ করুন।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন কলকাতায় বক্তৃতা দিয়ে তোলপাড় করছিলেন, তখন কলকাতার লোক বিবেকানন্দের প্রশংসা করছিল। বিবেকানন্দ সেই প্রশংসা শুনে বলেছিলেন,—আপনারা আমার প্রশংসা করছেন! কই?—আমার গুরুদেবের নামতো একবারও উচ্চারণ করেন না! আপনারা জানেন না যে, আমার গুরুদেব আমার মত কোটি কোটি বিবেকানন্দ তৈয়ার করতে পারেন একমুষ্টি ধূলিকণাকে ফুঁ দিয়ে! বিবেকানন্দ তখন বলতে লাগলেন,—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমেঽহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

—ঠাকুরের ইচ্ছা হলে আপনাদের মধ্যেই কোটি কোটি সারদানন্দ হতে পারে, কোটি কোটি বিবেকানন্দ হতে পারে। কি আপনারা এক সারদানন্দের জন্য শোক করছেন!

আপনাদের একটা কথা বলছি, স্মরণ রাখবেন। —মূলে এক ঠাকুর রামকৃষ্ণ। মূলে জল দিলে সমস্ত বৃক্ষে যায়, ডগায় জল দিলে কিছুই হয় না। যত দিন যাবে, ততই ঠাকুরের বিষয় প্রচার হতে থাকবে, এ আর থামবে না। পাশ্চাত্য দেশে ঠাকুরের অমৃতময় জীবন ও উপদেশাবলী সকলেই সাদরে গ্রহণ করেছে। ঠাকুরের বিষয় স্ক্যাণ্ডানেভিয়া ভাষায়, পর্তুগীজ ভাষায়, স্প্যানীশ ভাষায় ও ড্যানিশ ভাষায় প্রচার হয়েছে,—বই হয়েছে। তারা আমার কাছে বইও পাঠিয়ে দিয়েছে। একচল্লিশ বৎসরে অনেক প্রচার হয়েছে, জগৎ ছেয়ে গিয়েছে। এমন প্রচার কোন অবতারে হয় নি। সমস্ত জগতের নরনারী ভগবান্ রামকৃষ্ণের আদর্শ গ্রহণ করছে।

বিবেকানন্দকে কে এদেশে চিনেছিল? ঐ চিকাগোতেই তিনি বিশ্বজয়ী হয়েছিলেন। প্রথমে ঐ দেশের লোকই চিনেছিল। যেমন ঠাকুর বলতেন,—

লণ্ঠনের আলো দূরে প্রকাশ হয়, তলায় হয় না। এই আলো দক্ষিণেশ্বর থেকে উঠে চিকাগোতে প্রকাশ হয়। পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় কয়জন তাঁকে মেনেছিল? ঐ কেশব সেন কলকাতার টাউন হলে বক্তৃতার সময় পরমহংসদেবের নামোল্লেখ করেছিলেন। তাইতে জনকতক ঠাকুরের নাম জেনেছিল। আপনারা সেই মূলকে ধরুন। মূল ধরলেই সব হবে। মূল ছেড়ে দিয়ে ডগা ধরলে কি হবে? কিছুই হবে না। সে মূল কি? সে মূল এক রামকৃষ্ণ। সেই যুগাবতার ভগবান্ রামকৃষ্ণের শরণ নিন্। তাঁর ভাবে ভাবিত হয়ে বিভোর হয়ে যান। দেশের-দশের কল্যাণ কামনা করুন। আপনাদের জীবনকে ধন্য করুন,—কৃতকৃতার্থ করুন।

আজকের বক্তৃতা এই পর্যন্ত ক্ষান্ত থাকুক। যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ আশীর্বাদ এবং তাঁর লীলাসহচরদের আশীর্বাদ আপনাদের মস্তকে বর্ষিত হোক, দেশের-দশের ও জগতের মহাকল্যাণ হোক।*

সঙ্কলক : স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

* ১৩৩৪ সনের ১৩ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজজীর স্মৃতি উৎসব বেলুড় মঠে সম্পন্ন হয়। ঐ দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, আরত্রিক, সঙ্গীতাদি ও শরৎ মহারাজের জীবনী আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহার একটি সুন্দর প্রতিকৃতি নানাবিধ পুষ্প, মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় চারি হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। তৎপরে অপরাহ্নে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর সভাপতিত্বে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় স্বামী বিজয়ানন্দ ও স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দেন। তৎপরে সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে শ্রদ্ধেয় সভাপতি উক্ত বক্তৃতা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা

অতীতে যে সকল অবতার-পুরুষ বিশ্বের কল্যাণে আগমন করিয়াছিলেন, গৌতম বুদ্ধ তাঁহাদের অন্যতম। প্রায় পঞ্চবিংশ শতাব্দী পূর্বে যে কঠোর তপস্যা তিনি করিয়াছিলেন, আজিও তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত জগতের বুকে বর্তমান রহিয়াছে। তিনি যে সময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ বাস্তবিকই তদুপযোগী হইয়াছিল। আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে মহান্ সত্য তিনি বিতরণ করিয়া গিয়াছিলেন,—সুখ, শান্তি ও সর্ববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার পথে মানবকে তাহা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। তৎপরে ভগবান্ যিশু খ্রীস্ট ও শ্রীচৈতন্যদেবও অবতীর্ণ হইয়া মানবের অধ্যাত্মজীবনের অভাব ও প্রয়োজন-সমূহ পূর্ণ করিতে দেশ ও কালোপযোগী সত্যরাশি বিতরণ করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে স্মরণীয় এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে অবতার পুরুষের পুণ্য সাধক-জীবনী আমরা আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি, তিনিও ঠিক অন্যান্য অবতার পুরুষগণের ন্যায় মানবের অধ্যাত্মজীবনে সাহায্য করিতে ও ধর্মগ্লানি দূর করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তবে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা অন্যান্য অবতারচরিত্রে পরিদৃষ্ট হয় নাই। এ জগতে স্ত্রী, পুত্র ও ঐশ্বর্য ত্যাগের যথার্থানুষ্ঠান জীবনে ঠিক ঠিক প্রতিভাত করা বড়ই দুরূহ। এমন কি ভগবান তথাগতের জীবনীতেও আমরা দেখিতে পাই যে, দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল কঠোর তপস্যা করিয়াও তাঁহার মন হইতে স্ত্রীপুত্রের চিন্তা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই। অলৌকিক শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে কিন্তু আমরা অদ্ভুত সংযম ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হই। তিনি কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তি জয় করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া বা তাহাদের নিকট হইতে দূরে পলাইয়া নহে, পরন্তু তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই।

তাঁহার ত্যাগের সাধনা বাস্তবিকই ছিল অলৌকিক! এক হাতে টাকা ও অপর হাতে মাটি লইয়া "টাকা মাটি, মাটি টাকা" বলিতে বলিতে উভয়কে সমজ্ঞান করিয়া তিনি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই অবধি জগতের কোন বস্তুই তাঁহার নিকটে মূল্যবান্ বলিয়া প্রতিভাত হইত না। আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা জড়ের উপর আধিপত্য লাভের ইহা এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই

সময় হইতে টাকা বা কোন ধাতুদ্রব্যই তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেন না। অজ্ঞাতেসারেও স্পর্শ করিলে তাঁহার আঙ্গুল বাঁকিয়া ও শরীর নিস্পন্দ হইয়া যাইত। বাস্তবিক ইহা আশ্চর্য নহে, কারণ তিনি অর্থকে ত্যাগ করিয়াছিলেন পরমার্থ লাভের পথে সম্পূর্ণ অন্তরায় জ্ঞান করিয়াই ; কিন্তু বর্তমান দেহাত্মবাদের যুগে মানুষের মন কিন্তু অর্থের প্রতি এমনই আসক্ত যে, তাঁহাদের অর্থোপার্জনের যন্ত্রস্বরূপ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অর্থোপার্জনকেই তাঁহারা পারিবারিক জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাই অনর্থ অর্থের জন্য তাহারা অনেক সময় যে কোন প্রকার পাপকার্য করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভোগের মাঝে তাই ত্যাগের পূর্ণ আদর্শস্বরূপে অলৌকিক সাধনা দ্বারা দেখাইলেন "টাকা মাটি" বা তুচ্ছ পদার্থ, অর্থে শান্তি নাই, পরমার্থ ই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং ভোগের মাঝে থাকিয়াও যথার্থ ত্যাগকে বরণ করিয়া ঐ জ্ঞানস্বরূপ ভাগবানকে লাভ করা যায়।

শুধু তাহাই নহে। সকল রমণীই ছিল তাঁহার চক্ষে শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রতিমূর্তি। পত্নীকে তিনি সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানেই পূজা করিতেন ; এজন্য দৈহিক সম্বন্ধ তাঁহার পত্নীর সহিত কখনও ছিল না। এই কাম-কাঞ্চনের যুগে নরনারী ইন্দ্রিয় লালসার অবাধ প্রবাহে যখন চির-ভাসমান এবং কঠোর ব্রহ্মচর্যের আদর্শ একরূপ বিস্মৃত, তখনই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার জীবনে দেখাইলেন, কেমন করিয়া দাম্পত্য জীবনেও বিবাহের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ মানবসমাজে পবিত্রভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে। নারী যে ভোগ্যা নয়, পূজ্যাই ; নারীর সম্মান ও পূজায় মহামায়ার প্রসন্নতা লাভ করিয়া যে অজ্ঞানাবরণ দূর করিতে হইবে, ইহাই তিনি জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীঠাকুর নারীজাতিকে পরম শ্রদ্ধার স্থান প্রদান করিয়াছিলেন আপনার সাধনক্ষেত্রে রমণীকে প্রথম আচার্যপদে বরণ করিয়া। ঐ রমণী ব্রহ্মচারিণী, অসামান্য গুণবতী, পরমা বিদুষী ও হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে সর্বপ্রকার সাধনায় সর্বতোভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধা ও শ্রীগৌরাঙ্গের যে মহাভাবসকল ভগবদ্দর্শনের পথে উপস্থিত হইত, শ্রীশ্রীঠাকুরেও সে সকল চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া সর্বসমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন,—"এবার নিত্যানন্দের

খোলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।" ব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব ও শৈবতন্ত্রোক্ত সকল সাধন প্রণালীই একটির পর একটি সাধন করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। "লীলাপ্রসঙ্গে" লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীঠাকুরের তান্ত্রিক সাধনের সময়ে তাঁহাকে পূর্ণাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। কারণ নামকরণ হইতেছে পূর্ণাভিষেকের একটি বিশেষ অঙ্গ। "রামকৃষ্ণ" এই নামটি আবার "নিত্যানন্দের খোলে কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব" এই অর্থেই বোধহয় ব্রাহ্মণী ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পূর্বেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন প্রকার সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সাধনার প্রথমাবস্থায় তিনি জগন্মাতার দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কখন কখন গঙ্গাতীরে বসিয়া মার দর্শন লাভের জন্য চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেন ও শিশুর ন্যায় সর্বদা প্রার্থনা করিতেন। একদিন প্রাণের ব্যাকুলতায় অস্থির হইয়া তিনি মার দর্শনলাভের জন্য মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পাগলের ন্যায় খড়্গ লইয়া আপনার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু খড়্গ তাঁহার হস্ত হইতে পতিত হইল এবং তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় জগজ্জননীর জ্যোতির্ময়ী বরাভয় মূর্তি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইল, মা সাহাস্যে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া আবার শ্রীশ্রীভবতারিণীর পাষাণ মূর্তিতে মিলাইয়া গেল। এখন হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মার দর্শনলাভ করিতে লাগিলেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন।

সাধনাবস্থায় একবার তাঁহার মনে হইল, ব্রাহ্মণ-জাত্যভিমানই হইতেছে ভগবদনুগ্রহ লাভের পথে বিষম অন্তরায়; তাই তিনি অলক্ষ্যে অস্পৃশ্য মেথরের বাটীতে যাইয়া নিজ হস্তদ্বারা, কখন বা মস্তকের দীর্ঘ কেশ দ্বারা তাহাদের স্থান পরিষ্কার করিয়া দিতেন। এইরূপে সমস্ত ভেদবুদ্ধি ও আত্মাভিমানকে তিনি চির বিসর্জন দিয়াছিলেন।

পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরম জ্ঞানযোগী ন্যাংটা তোতাপুরীর নিকট অদ্বৈত বেদান্ত বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মাত্র তিন দিনের মধ্যেই তিনি পুনরায় গভীর নির্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি ক্রিয়ানুষ্ঠান রহিত "বিদ্বৎ-সন্ন্যাস" গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খ্রীস্টান মতেও তিনি সাধনা করিয়াছিলেন। ৺শম্ভু মল্লিকের বাগান বাটীতে বহুদিন তিনি বাইবেল পাঠ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে একদিন

যিশু খ্রীস্টকে দর্শন করেন ও আপনার শরীরাভ্যন্তরে তাঁহাকে মিলাইয়া যাইতে দেখিয়া সমাধিমগ্ন হন।

তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইসলাম ধর্মমতে সাধনা করিতে অগ্রসর হন এবং ঈশ্বরানুগ্রহ লাভের জন্য মুসলমান সাধকের সর্বপ্রকার সাধনাই তিনি করিয়াছিলেন। ফকির গোবিন্দের সহায়তায় তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ইসলাম ধর্মের রহস্য ভেদে সক্ষম হন ও ভাবাবেশে হজরত মহম্মদের দর্শন লাভ করেন।

এইরূপে সর্বমতে সাধনা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল সম্প্রদায়গত ধর্মের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, প্রত্যেকেরই লক্ষ্য বা গন্তব্য এক, নাম বা অভিধা মাত্র পৃথক এবং বিভিন্ন ধর্মমতসমূহ ঈশ্বর লাভের নানা উপায় মাত্র। হিমগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া নদীসকল যেইরূপ সরল ও বক্রপথ দিয়া প্রবাহিত হইয়া এক সাগরে পতিত হয়, বিভিন্ন জাতির সম্প্রদায়গত মতবাদসমূহও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপায় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সেই এক অনন্ত সচ্চিদানন্দ-সাগররূপ লক্ষ্যে মিলিত হয়। তাই "যত মত তত পথ" এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়া তিনি সকল সঙ্কীর্ণতার বুকে উদারতার জাহ্নবীধারা প্রবাহিত করিয়া গেলেন, ভালবাসা ও একতার স্রোতে সারা বিশ্ব তাই প্লাবিত হইতে চলিল। নিরক্ষর পূজারীরূপে আসিয়াছিলেন তিনি জগতের এক গুরুভার বহন করিয়া। নবীন প্রবাহ ও সত্যালোকে তাহা পূর্ণ হইয়াছে! সাধারণ বেশে আসিয়া যে পবিত্র আদর্শ আমাদের সম্মুখে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণে বিশ্ববাসী অবশ্যই ধন্য হইবে। *

* "আনন্দবাজার পত্রিকা"—শ্রীরামকৃষ্ণ শত-বার্ষিকী সংখ্যায় (২৪. ২. ৩৬) শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ।

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিপূজা

আজ বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব তিথি। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী জগৎকে শুনাইয়া যৌবনের পূর্ণ মহিমার মধ্যস্থল হইতে হঠাৎ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। স্বামীজীর স্বল্প জীবিতকাল অগণিত ঘটনায় পূর্ণ। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পূর্বে তিনি এই বর্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন,—তাঁহার কার্য শেষ হইয়াছে। তিনি জগৎকে কি মহৎ সত্য দিয়া গেলেন, তাহা সাধারণের বুঝিতে এখনও অনেক বিলম্ব হইবে। তিনি আরও বলেন যে—নশ্বর শরীর আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ লেখক স্বামীজীর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"এই আশ্চর্য মানুষটির মত মহান্ পবিত্র আত্মা আর কখনও দেখা যায় নাই। মানব জীবনের এক বৃহৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির উপর দিয়া ঝলসিয়া গেল।"

বাস্তবিক সংসারের এই গহন অন্ধকারের ভিতর দিয়া আলোক নির্দেশ করিয়া সত্য-পিপাসু ব্যক্তিগণকে মোক্ষ ও অনন্ত আনন্দ প্রাপ্তির পথে চালিত করিবার জন্য আধ্যাত্মিক গগনে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মহিমময় নক্ষত্র কদাচিৎ উদিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা স্বামীজীকে দেখিয়াছেন এবং বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ আছে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের কি মোহিনী শক্তি ছিল! শিশুর মত সরল হাস্য-বিলেপিত স্বর্গীয় প্রভায় বিমণ্ডিত প্রতিভাব্যঞ্জক তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডলে কি অপূর্ব দীপ্তি! গভীর গম্ভীর রাগিনী-ঝঙ্কৃত কণ্ঠস্বর। বক্তৃতার কি অসাধারণ আশ্চর্য শক্তি! শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া তাঁহার অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিত! বলিত, ঈশ্বরই তাঁহাকে বক্তা, উপদেষ্টা করিয়া এ সংসারে পাঠাইয়াছিলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোর ধর্ম মহাসভায় "হিন্দুধর্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান কালে স্বামীজী বেদান্তের দর্শন ও ধর্মকে জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে প্রতিপাদন করিয়া আমেরিকাবাসীর হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করেন।

চিকাগো মহাসম্মিলনীর বিজ্ঞান শাখার সভাপতি মিঃ মারউইন মেরি স্নেল

লিখিয়াছিলেন, "মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের তুল্য প্রিয় ও প্রভাবশালী কেহই ছিলেন না, স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতীকবিশেষ,······রীতিমত গোঁড়া খ্রীস্টানগণও বলেন যে, তিনি মানবের মধ্যে যুবরাজ। ভারতবর্ষ যে তাঁহাকে আমেরিকায় প্রেরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমেরিকাবাসীগণ ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন।"

আমেরিকায় তাঁহার অদ্বিতীয় বিজয় ভারতে হিন্দুর মনের উপর অদ্ভুত ক্রিয়া করিল ;—বেশ প্রমাণ হইয়া গেল যে, স্বামী বিবেকানন্দই আধুনিক হিন্দুর চিন্তাজগতের নিয়ন্তা।

স্বামীজী মাতৃভূমি ভারতে ফিরিয়া আসিলে সর্বশ্রেণীর হিন্দু তাঁহাকে স্বদেশ-হিতৈষী, বীর, ঋষি ও নবীন ভারতের ভ্রাতা বলিয়া বরণ করিয়া লইল।

সমাজ সংস্কার ও দলিত অশিক্ষিত জনসাধারণের উন্নতি বিধান বিষয়ে তাঁহার আদর্শ অনুকরণ করিয়া তাঁহার ভক্ত কর্মীগণ অক্লান্ত চেষ্টায় ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ একজন কর্মযোগী ছিলেন। মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি নিঃস্বার্থ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সকলের মঙ্গলের জন্য তিনি বুদ্ধের সেবাধর্ম পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বিশদরূপে এই উপদেশ দিতেন যে, ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করিলে ঈশ্বরেরই উপাসনা করা হয়।

তিনি শুধু একজন কর্মযোগী ছিলেন না,—ভক্তিযোগী, রাজযোগী, জ্ঞানযোগীও ছিলেন। তাঁহার ভিতরে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল।

অজ্ঞান, স্বার্থপরতা ও জড়জগতের বিলাস-ব্যসনের প্রতি একান্ত আশঙ্কাময় বর্তমান জগতের পক্ষে এই আদর্শ বিশেষ আবশ্যক।

স্বামী বিবেকানন্দ একজন খাঁটি সন্ন্যাসী ছিলেন ; মানবের সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন বহন করিয়া তিনি পরিব্রাজকরূপে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কল্য কি খাইব,—এই চিন্তা স্বামীজীর কখনও ছিল না। যৌবনে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি পবিত্র, দরিদ্র, সাধুর জীবন যাপন করিবেন। ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি তাহা স্বীয় জীবনে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

শুকদেব, বুদ্ধ, যীশুখ্রীস্ট, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে সত্য দিয়া গিয়াছেন, তিনি আপনার জীবনে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দীন দরিদ্রকে দেখিবামাত্রই তাঁহার হৃদয় করুণায় বিচলিত হইয়া পড়িত। সে প্রশান্ত বক্ষে সকলের জন্য অগাধ ভালাবাসা সঞ্চিত ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন যে, হিন্দু জাতির আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণে এমন একটি নবীন জাতি গড়িয়া উঠিবে, যাহারা পাশ্চাত্যে জাতিগুলিকে চালিত করিয়া পার্থিব জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রকৃতরূপে বুঝাইয়া দিবে। তখন এই সভ্য জগৎ বুঝিবে যে, তরবারির বল অপেক্ষা আত্মার শক্তি বড়।

অক্লান্ত সেবক, অকপট কর্মিগণের উপর স্বামী বিবেকানন্দের মহামঙ্গল আশীর্বাদ বর্ষিত হউক, ইহাই আজ তাঁহার এক গুরুভাইয়ের প্রার্থনা। *

* *

ভবানীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীসারদাদেবীর উৎসবে স্বামীজী মহারাজ বাণী প্রেরণ করেন।

"মা জননীরা না জাগ্‌লে এদেশ উঠ্‌বে না, জাগ্‌বে না। এবার তাদেরকে জাগ্‌তে হবে—উঠ্‌তে হবে—লাগ্‌তে হবে কাজে। ওগো জননি! তোমরা জেগেছ সত্য, কিন্তু তোমাদিগকে আরো জাগ্‌তে হবে, আরো উঠ্‌তে হবে এবং অপর সকলকে জাগাতে হবে, উঠাতে হবে। ঐ দেখ, তোমাদের পুত্র-কন্যাগণ বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন, চরিত্রহীন ও স্বাস্থ্যহীন হয়ে অকালে কেমন বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হতে আরম্ভ করেছে! তাদেরকে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, নির্ভীক ও সাহসী হতে শিক্ষা দাও! তা' হলেই আমাদের দুঃখ ঘুচ্‌বে, আমরা আবার মানুষ হব!

—অভেদানন্দ

* (৬৫তম জন্মতিথি উপলক্ষে লিখিত)। ২২।১।১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত।

১

১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৭ সন।

মধ্যাহ্নে, আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ কদবেল খাইতেছেন আর বলিতেছেন,—"সংস্কৃতে কদবেলকে 'কপিত্থ' বলে। হাতীতে কদবেল খেলে আবার মলের সঙ্গে আস্ত কদবেলই বের হয়; কিন্তু ভিতরে কিছু শাঁস থাকে না। এর কারণ কেউ-ই এখনও আবিষ্কার করতে পারে নি।

আগচ্ছতি যদা লক্ষ্মী নারিকেলাম্বুবৎ।
নিগচ্ছতি তদা লক্ষ্মী গজভুক্তকপিত্থবৎ॥

নারকেলে যে জল কিরূপে আসে, তা' কেউ ধারণা করতে বা বুঝতে পারে না; তেমনি লক্ষ্মী যখন আসেন তখন কেউ বুঝে উঠতে পারে না। যখন লোকের লক্ষ্মীশ্রী হয়, হঠাৎ ফেঁপে উঠে, ধনী হয়, তখন লোকে বুঝতে পারে না। আর যখন লক্ষ্মী চলে যান,—কিরূপ? না, হাতীর যেমন কদবেল খাওয়ার পরও যেমন আস্ত কদবেল থাকে, ভিতরে শাঁস থাকে না, সেইরূপ! অর্থাৎ, লোকে যখন লক্ষ্মীছাড়া হয়, তখন তার বাইরের ঠাঁট্ বজায় থাকে; কিন্তু ভিতরে ফাঁকা!

—ত্যাখ্, এইসব ছেলেবেলায় পড়েছি, এখনও স্মরণ আছে।"

সন্ধ্যার পর স্বামীজী মহারাজ Self-knowledge-এর class লইতেছেন। প্রজ্ঞাচৈতন্যজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "Know thyself,—নিজেকে জান, ব্রহ্ম সত্য;—এই এক কথা বললেই ত' হয়! তবে আর দীক্ষা, পূজা, জপ করা, এই সবের প্রয়োজন কি?"

স্বামীজী—Primary School-এর ছেলেদের Higher Mathematics-এর উপদেশ দিবি কি? M. Sc. পড়লে ত' Higher Mathematics

বুঝবে! —এই এদের সন্ন্যাস হয়েছে!—এদের সন্ন্যাসের সময় "অহং ব্রহ্মাস্মি" —এই মহাবাক্য প্রদান করলাম! তাই বলে কি ওদের অনুভূতি হয়েছে? ধ্যান ও ধারণা করতে করতে তবে অনুভূতি হবে। —একবারেই চট্ করে কি হয়?

২৩শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী—মেয়ে-ঘেঁসা হওয়া ভাল নয়। 'মেয়ে,— সব দিলে খেয়ে', শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন। মেয়েদের মোহিনী শক্তি আছে। কামরূপিনী কামিনী। ওরাই ত' জগৎকে ধরে রেখেছে। মেয়ে-ঘেঁসা হলে মেয়েদের সঙ্গেই মিশ্‌তে ইচ্ছা হয়। মনের অবস্থা এমন হয় যে, তাদের সঙ্গ না করলে প্রাণে কিছুই ভাল লাগে না, ছট্‌ফট্ করে। মেয়েদের সঙ্গ করলে অজ্ঞাতভাবে মনেতে কামভাব আসবে,—তা' ধরতেই পারবে না। শ্রীশঙ্করাচার্য বলেছেন,—দ্বারং কিমেকন্নরস্য নারী। কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি নারী।

তিনি যা বলেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরও তাই বলেছেন,—কামিনী ও কাঞ্চন। শ্রীশ্রীঠাকুর তো শ্রীশঙ্করাচার্যের শিষ্য···শিষ্য···প্রশিষ্য।

২৬শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী—ক্ষমাই হচ্ছে মহাপুরুষের মহৎ গুণ। মহাপুরুষদের কেউ অনিষ্ট করলেও তাঁরা কারও প্রতি ক্রুদ্ধ হন না,— ক্ষমাই করেন! তার জন্য শুভ কামনা করেন। এই, আমার নিকট যারা অন্যায় করে, আমি তাদের ক্ষমা করি, কারো দোষ গ্রহণ করি না। To err is human, to forgive is divine. মানুষ স্বভাবতঃই ভুল করে, দেবতাই ক্ষমা করে।

১লা চৈত্র, রবিবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী—অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।—এই উদরের জন্য সকল জীবকেই চিন্তা করতে হয়! কূর্মদেবতা সকলকেই ভাবিত করে তোলে। মানুষের যদি ক্ষুধারূপ ব্যাধি না থাকত, তা'হলে এত কর্মের প্রচেষ্টা থাকৃত না।······উদর আর লিঙ্গ,—এই দুই নিয়েই জগৎ। বংশ বৃদ্ধি করতেই হবে! এই দুইবাদ দিলে জগৎ থাকে না।

২রা চৈত্র, সোমবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজের সহিত দেশের সম্বন্ধে কথাবার্তা হইবার পর সেবক-শিষ্যকে তিনি বলিলেন,—"ইংরেজরা Non-Co-operation চায়। মহাত্মা গান্ধীর সরল প্রাণ,—diplomat নয়! ওদের diplomacy কি বুঝবে! মতিলাল নেহেরু diplomacy বুঝত। ইংরেজরা স্বরাজ দিতে রাজী নয়; বাস্তবিক ওরা ত' এদেশের কল্যাণ চায় না! ওদের উদ্দেশ্য, যাতে এ আন্দোলনটা চাপা পড়ে। এ আন্দোলন নিভে গেলে, পুনরায় দেশকে জাগাতে হলে ভারী কষ্ট লাগ্‌বে, বহু সময়সাপেক্ষ! তখন হয়ত আবার ওদের খুঁটি শক্ত হবে, রাজত্ব আরও দৃঢ় হবে। পুনরায় civil disobedience (আইন অমান্য) করা উচিত।

৩রা চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী—শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে এ শরীর অর্পণ করেছি। তাঁর এ শরীর দিয়ে যা করবার তাই করিয়ে নেবেন। কর্মের ফলাফল সব তাঁর, আমি কেবল উপলক্ষ। লড়াইয়ে হার-জিৎ আছে। এবার হেরেই গেলাম, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। জয়-পরাজয়কে যে সমান জ্ঞান করতে পারে, সে-ই সাধু! আবার না হয় এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করব!

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া বলিলেন,—আমার হার-ই জিৎ।

১০ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী—মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশের যা-ই উপকার হোক্ না কেন, এমন অপর কেউ কিছু করতে পেরেছে কি? এক কথায় civil disobedience চালালেন। আবার, এক কথায় বন্ধ করলেন। তাঁর স্থান গ্রহণ করতে আর কেউ কি উপযুক্ত লোক—leader আছে? তিনি এ আন্দোলনের নেতা (leader) হয়েছেন। তাঁর আন্দোলন সকলেরই পালন করা উচিত, মাথা পেতে। তাঁকে chance দেও না কেন? তিনি কি করেন, দ্যাখো। Government ভয়ানক politician—চালবাজ! দাবা-বড়ে খেল্‌ছে। গান্ধীকে মাৎ করতে চায়! দেশের লোকের যাতে তাঁর উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা না থাকে, তারই চেষ্টা করছে। দেশের লোকের মনে এই ভাব আনিয়ে, জগতের সামনে ইংরেজরা দেখাতে চায় যে, ভারতবাসীরা তাঁকে মান্য করে না,—চায়

না। ঐ জন্যই ত' ভগৎ সিং ওদের (ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু) ফাঁসি দিলে। এ সময়ে Congress-এর মধ্যে একটা গোলযোগ বাঁধিয়ে দিলে, যাতে গান্ধীর বিরুদ্ধবাদী দলের সৃষ্টি হয়, আর যাতে তাঁকে অবমাননা করে।

দেশের লোক যদি তাঁর উপর আস্থা না হারায়, তাঁর নির্দেশমত কাজ করে, বয়কট সমর্থন করে, বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে, তাহলে দেশের মঙ্গল হবে। আর উদ্ধত মেজাজ দেখালে, রক্ত গরম করলে,—এভাবে চললে দু' একজন ভগৎ সিংকে বাঁচালে কিছুই হবে না। ধীর এবং শান্তভাবে চিন্তা করে কাজ করতে হবে। লক্ষ লক্ষ ভগৎ সিং-এর মত প্রাণ নষ্ট হবে।

ইংরেজরা এসেছে এ দেশকে ধ্বংস করতে, লুট করতে। তারা কি এদেশের মঙ্গল চায়? ভারত ধ্বংস হয়ে যাক্, ছারখার হয়ে যাক্, না হয় চিরদিন তাদের গোলাম হয়ে থাকুক,—এই-ই তাদের বাসনা। তারা কি এদেশের মানুষকে, কালো চামড়াকে মানুষ বলে গণ্য করে?—পশুর চেয়েও অধম মনে করে। কুকুরকে তারা ভালবাসে,—কিন্তু মানুষকে নয়! এদেশের জীবন কি জীবন! জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

আমরা নিরস্ত্র, অস্ত্রহীন! আমাদের অহিংসা পথই (non-violence) পথ। এই non-violence-ই হচ্ছে আমাদের একমাত্র অস্ত্র ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে। ইংরেজরা যেমন নিরীহ ভারতবাসীদের উপর অত্যাচার করেছে, তেমন দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আর কেউ-ই দেখায় নি।

ভগবানে বিশ্বাস কর, সত্যকে আশ্রয় কর, নীরবে অত্যাচার সহ্য কর, তা'হলে তাঁর আসন টলবে,—তিনি আমাদের মুখপানে তাকাবেন। তিনি যখন এদের মারবেন, তখন এদের অস্তিত্বই একেবারে লুপ্ত করে দেবেন।

ইংরেজদের হাতেই আমাদের প্রাণ! তারা একটা aeroplane হতে যদি একটা বোমা মারে, তাহলে এ কলকাতা সহরকে ভস্মীভূত করে দিতে পারে। হিংসা (violence) করে কি তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে? দুটো একটা বোমা ভুস্ ভাস্ করে দিয়ে ইংরেজদের রাজত্বের কিছুই করতে পারবে না। এতে তারা ভয় খায় না। এতে আরও কাজ খারাপ হয়। এ তো আমাদের দেশের উদ্ধত, রক্ত-গরম ছোকরারা বুঝতে পারে না। যদি এ দেশের অস্ত্র থাকত, aeroplane থাকত, গুলি-বোমা-কামান-soldier থাকত, তাহলে না হয় তাদের সঙ্গে যুঝতে পারত,—method of violence চলত। যারা মহাত্মা গান্ধীকে অবমাননা করে, তাদের ভগবানকেই অবমাননা করা হয়।

যতদিন এদেশ হতে Police, C. I. D., Judge, Magistrate, Pleader, Barrister, কেরানী পাবে, ততদিন ইংরেজদের রাজত্ব অটুট থাকবে। কেরানীগুলো কাজ ছেড়ে দিক, সকলেই একযোগে কাজ ছেড়ে দিক ! তাহলে সাধ্য কি ওদের, যে রাজত্ব চালাতে পারে ? আমাদের দেশের লোকই তো ওদের রাজত্ব চালাচ্ছে !—তা' না ! রোজ রোজ দশটার সময় পান চিবাতে চিবাতে, পানের ডিবে হাতে করে অফিসে দৌড়াচ্ছে ! হাওড়ার পুলে দাঁড়িয়ে থাক দশটার সময়, দেখ্‌তে পাবে'খন, পিঁপড়ের সারির মত যেন fort-এ দৌড়াচ্ছে ! এরাইত ইংরেজদের রাজত্ব রেখেছে ! কি না, কাজ ছেড়ে দিলে খাবে কি ?—এই ভাবনা ! মাগ-ছেলেদের ভরণপোষণ কি করে করবে ? —এই ভাবনা !

উকিলগুলো বলে,—গান্ধী এই বলছে, ওই বলছে ! আরে, Court-এ যাওয়া বন্ধ করুক না ! তা পারবে না। রোজ ধড়া-চূড়ো পড়ে Court-এ যাওয়া চাই !

আরে, না খেয়ে মরে যা না ! দেশের জন্য প্রাণ যাবে। বেঁচে থেকে লাভ কি গোলাম হয়ে !

মুষ্টিমেয় ইংরেজ এদেশ শাসন করছে ! হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে যদি বলে, আমরা ইংরেজদের চাইনে, তাহলে কালই ওরা চলে যাবে,—পালাতে পথ পাবে না। একজন বলেছিল,—তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী যদি একত্রে, একযোগে প্রস্রাব করে, তাহলেই ইংরেজরা ভেসে যাবে।

১১ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী—ইংরেজরা কি brute ! Napoleon peace (শান্তি) স্থাপন করবার জন্য England-এ যাচ্ছে, তাঁকে land করতেও দেয় নি,—জাহাজেই capture করল। St. Helena-তে পাঠিয়ে দিলে। ইংরেজরা French-দের চিরশত্রু। French-রা কাবু ছিল বলেই বিগত মহাযুদ্ধে ওদের সঙ্গে যোগদান করেছিল। Waterloo-তেই Napoleon পরাজিত হয়। আমি Waterloo-তে গিয়েছিলাম। Waterloo-র মাঠে French আর ইংরেজদের যত সৈন্য মারা গিয়েছিল, তাদের রক্ত মাটিতে শুকিয়ে গিয়েছিল। সেই রক্তমাখা মাটি জড় করে তিন তালা-চার তালা সমান উঁচু একটা স্তূপ করেছে। তার উপরে একটা lion (সিংহ) রেখেছে। French-দের কামান গালিয়ে ঐ সিংহ তৈরী

করেছে। আর চারদিকে কামান সাজিয়ে রেখেছে,—Victory (জয়)। Napoleon কত বড় রাজা আর বীর ছিল! তাকে এরা ভুগিয়ে ভুগিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে তার জীবন বিনষ্ট করল। Paris-এর museum-এ Napoleon-এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র আমি দেখেছিলাম। Alexander, Julius Ceasor আর Napoleon,—এই তিনজনের চেহারা প্রায় একরকম দেখতে,—সাদৃশ্য ছিল। কেউ কেউ বলে, Alexander-ই Julius Ceasor, Napoleon ছিল। তিনজনেরই ambition এক রকম ছিল।

C. V. Raman, যিনি Noble Prize পেয়েছেন, Sweeden-এ গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বুদ্ধদেবের জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন। Sweeden-বাসীরা আগ্রহ সহকারে শ্রদ্ধার সঙ্গে বুদ্ধদেবের জীবনী, তাঁর উপদেশ শুনেছে! তারা এ বিষয়ে আরও শুনতে চায়;—বলে,—"এমন সুন্দর জীবনও আছে!" তাদের ভাষা হচ্ছে Scandinavian; ঐ ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী অনুবাদ হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী Non-Co-operation, Non-Violence (অহিংসা) যা দেখালেন,—এ নূতন। জগতের ইতিহাসে এমন আর কেউ দেখায়নি। অহিংসা পথ অবলম্বন করে সংগ্রাম করা! হিংসার পথে অস্ত্রের দ্বারা সকলেই দেশ জয় করেছে। তারাই আবার অপর কর্তৃক হিংসার দ্বারা পরাজিত হয়েছে। যারা অহিংস পথে জয়লাভ করবে, তারা জগতে সকলেরই নিকট পূজ্য। বুদ্ধদেবই এই অহিংসা ধর্ম প্রথম প্রচার করেছিলেন। ইংরেজরা মহাত্মা গান্ধীর প্রভুত্ব খর্ব করতে চায়, আর যাতে কংগ্রেস দু ভাগে ভাগ হয়, তার চেষ্টা করছে।

মহাত্মা গান্ধী যখন Africa-তে ছিলেন, সে সময় আমি New York-এ ছিলাম। আমায় তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন যে, 'আপনি যদি একবার এদেশে আসেন বেদান্ত প্রচার করবার জন্যে, তাহলে ভাল হয়।' আমার তখন সময় ছিল না, লিখে জানিয়েছিলাম।

১২ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামিজী—আমাদের দেশের লোক যদি বলে, 'আমরা তোমাদের কাজ করব না,' কাজ ত্যাগ করে, তাহলে Government কি এ দেশ শাসন করতে পারে? আমাদের দেশের লোকের সে দেশপ্রীতি কই,—যে আমার দেশ স্বাধীন হবে, জগতের শ্রেষ্ঠ হবে। এ ভাব জাপানীদের আছে; আর প্রত্যেকেই

যুদ্ধ জানে। আমেরিকাতেও প্রত্যেককেই Military School-এ পড়তে হয়,—তিন বৎসর compulsory, জার্মান, ফ্রেঞ্চদেরও তাই, ইংরেজরাও তাই করছে। যখন যুদ্ধ করবার প্রয়োজন হয়, সকলেই তখন দেশের জন্য fight (যুদ্ধ) করে। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করতে দ্বিধা বোধ করে না। Government চেষ্টা করছে, যাতে আমাদের ঐক্য (unity) না থাকে। করাচীতে J. M. Sen Gupta বলেছেন,—'আমাদের নিজেদের মধ্যে এখন ঐক্য বিরাজ করছে। সেই ঐক্যের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে শত্রুরা মতলব করে যে ফাঁদ পেতেছে, আমরা যেন তাতে না পড়ি! মহাত্মা গান্ধীর অবিসংবাদিত নেতৃত্বের অপূর্ব শক্তিকে ভঙ্গ করবার জন্য শত্রুদের অভিলাষ যেন পূর্ণ না হয়।"

১৭ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—নিরস্ত্র ভারতবাসীদের অহিংসা পন্থা ছাড়া অন্য পথ আর কি আছে? আমরা ছেলেবেলায় শুনেছি, 'বটাইয়া দেও পাষণ্ড ইংরাজে।' এখন এরা বোমা ধরেছে। দু-একটা বোমা-পিস্তল দিয়ে ইংরেজদের রাজত্ব ধ্বংস করতে পারা যায় কি? বোমা মারতে গিয়ে নিজেরাই মারা পড়ে! অহিংসা নীতির মাহাত্ম্য মহাত্মা গান্ধীই দেখাল। হিংসার পথ অবলম্বন করে জর্মানরাই ইংরেজদের সঙ্গে পারল না। Congress খুব লড়ছে! অস্ত্রহীন, নিরস্ত্র! অর্থহীন, পরাজিত ভারতবাসীগণ অহিংসা পথ অবলম্বন করে ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই করছে। এ দেখে জগতের লোক সব অবাক হয়েছে।

১৪ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৩৭ সন।

জনৈক ভদ্রলোক নন্দের নিকট স্বামীজী মহারাজের নিন্দা করিয়াছে। নন্দ তাহা স্বামীজী মহারাজকে বলিল। তাহাতে তিনি নন্দকে হাসিয়া কহিলেন,—"অলোকসামান্যচিন্ত্যহেতুকং দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মানাম্॥" যারা অত্যন্ত অজ্ঞ, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য, তারাই আলোকসামান্য মহাত্মাদিগের চরিত্রে কলঙ্কারোপ করে থাকে। অসাধারণ ব্যক্তিগণের কার্যকলাপের হেতু, তাঁরা কি জন্য কি করেন, কি বলেন, তা অজ্ঞানীরা কি করে বুঝবে?

৩রা চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী—জার্মানি আর রাশিয়ার মধ্যে একটা দেশ আছে,—'Kuru Land, Artic Ocean-এর ধারে। সে দেশের একটি লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। সে বলল,—"আমি কৌরব আর আমার স্ত্রী হচ্ছে পাণ্ডব। তাদের ভাষা সংস্কৃতের মতই,—বেশী তফাৎ নেই সংস্কৃতের সঙ্গে। Europe-এর বড় বড় scholar-রাও বলতে পারে নি যে তারা কোথা হতে এসেছিল। তবে Max Mullar বলেছিলেন,—'আমার ধারণা হয়, যখন কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়, সে সময় কেউ কেউ পালিয়ে এদেশে এসে উপস্থিত হয়।'

৭ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৩৭ সন।

আমি এদেশে এসে আগাগোড়াই বলছি, যদি এ দেশ উদ্ধার হয় তবে মেয়েদের দ্বারাই হবে। দেখলে তো এ আন্দোলনে মেয়েরা যোগ দিয়ে কি অদ্ভুত কাজ দেখালে। পুরুষরা যে কাজে কৃতকার্য হতে পারে না, মেয়েরা সেই কাজে সফলতা লাভ করতে পারে; কারণ মেয়েদের বুদ্ধি আর ধৈর্য পুরুষের চেয়ে বেশী। তাদের মাথায় যে-ভাব ঢুকিয়ে দিবে, সেই ভাব নিয়েই আপ্রাণ চেষ্টা করবে, প্রাণ বিসর্জন করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

এই দেখ না, একটি মেয়ে আট বৎসর বয়সে বিধবা হলে সে আর বিবাহ করে না! তার পিতামাতা ঐ যে শিখিয়ে দিয়েছে, তুই চিরদিন ব্রহ্মচর্য পালন করবি,—সে তাই করে। কিন্তু একটি পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে সে কি অবিবাহিত থাকে? ব্রহ্মচর্য পালন করে? তিন তিনটে বিবাহ করবে'খন। কেউ কেউ আবার নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পরস্ত্রী গমন করে, বেশ্যাবাড়ী যায়। একটি বিবাহিতা স্ত্রীলোক,—সে কি পর-পুরুষের কাছে যায়? যদি সে যায়, তাকে সমাজচ্যুত করে দেয়। কিন্তু পুরুষগুলো যে কত কি অন্যায় কাজ করে, তাদের কি সমাজ শাসন করছে? সমাজ কি তাদের চ্যুত করে? শাস্ত্রে আছে, পুরুষের চেয়ে মেয়েদের আটগুণ কাম বেশী। আমি বলছি,—মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের আটগুণ কাম বেশী। পুরুষগুলো মহাকামুক, কাপুরুষ! পুরুষগুলো মেয়েদের পুত্রোৎপাদনের machine করে তুলেছে।

স্ত্রী হচ্ছে সহধর্মিনী। এখন পুরুষেরা স্ত্রীকে সহশায়িনী করেছে। মেয়েদের জীবন কি জীবন নয়? তারা কেবল কি রান্না আর সন্তান প্রসব করবে? পৃথিবীর কোন দেশেই রান্নার জন্য এত মাথা ঘামায় না আমাদের মত। সময়

নষ্ট করে না। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কাজ করে। কেবল পুরুষের উপার্জনে দেশের আর্থিক উন্নতি হয় না। জাপানে পুরুষেরা যেমন খাটে, মেয়েরাও তেমনি খাটে। দশ ঘণ্টা কাজই করছে,—কে কার আগে কত বেশী কাজ করতে পারে, তারই চেষ্টা! কুঁড়েমি করে সময় নষ্ট করে না। কাজ করতে তাদের ভারী আনন্দ! কখনও বাজে গল্প করে সময় নষ্ট করে না,—কোন-না-কোন কাজ নিয়ে আছে। সর্বদাই কাজে ব্যস্ত, মুখে কোন বিষাদের ভাব নেই, সর্বদাই হাসিমাখা মুখ! ছেলেমেয়েরা এত স্বাধীনভাবে মেশে যে, আমাদের দেশে নিজের ভাই-বোনও এমনভাবে মেশে না। মেয়েদের চরিত্রও ভাল, অন্তঃকরণও সরল। মেয়েদের সকলকেই স্কুলে পড়তে হয়, তার সঙ্গে নানা রকমের শিল্পও শিক্ষা করে। বিবাহের পর বাড়ীতে বসেই শিল্পাদি কার্য করে। অনেক মেয়েরা factory-তেও কাজ করে।

জাপানে কুলি-মজুর, চাকর-চাকরাণী সকলেই লিখতে-পড়তে পারে।

জাপানী মেয়েরা চুলের খুব যত্ন করে, নানা রকমের খোপা বাঁধে। চুলবাঁধা যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য ছোট পিঁড়ির মত কাঠের তুলো-দেওয়া বালিশ ঘাড়ের নীচে ব্যবহার করে,—মাথাটা প্রায় শূন্যেতেই থাকে। তারা ফুল বড় ভালবাসে। মেয়েরা ফুল পেলেই মাথায় গুঁজে দেয়।

আমেরিকায় San Francisco-তে আমার একজন বন্ধু আছে। সে ডাক্তার,—M. D.; তার স্ত্রীও ডাক্তার, M. D.; তার স্ত্রী laboratory-তে কাজ করে। মল-মূত্র-রক্ত পরীক্ষা করে, আবার অফিসের কাজও করে। আর সে বাইরে call-এ যায়। সময় সময় তার স্ত্রীও মোটর হাঁকায়,—driver-এর কাজ করে। স্বামীর পরিবর্তে সে-ই কাজ করে,—call-এ যায়। স্ত্রী হচ্ছে companion, বন্ধু। আমেরিকাতে অনেক মেয়ে স্কুল-কলেজের Mistress, Principal; অনেকে অবিবাহিতা অবস্থায় জীবন কাটায়। তাদের মনে কোন sex-এর idea-ই আসে না,—সবাই কাজে ব্যস্ত। সর্বদা মনকে কোন-না-কোন কাজে নিযুক্ত করে রাখলে কুভাব আসতে পারে না। অলস মনেই কুভাব আসে। সেই জন্যেই সর্বদা সৎ চিন্তা করতে হয়। কেউ artist, কেউ ডাক্তার, কেউ শিক্ষয়িত্রী, কেউ philosopher, আবার কেউ Judge হচ্ছে।

আমার একজন ছাত্রী ছিল। তার সঙ্গে তার একটি ছোট মেয়ে আমার ক্লাসে আসত। তার এখন ষোল বৎসর বয়স, এবার Ph. D. পরীক্ষা দিবে,

thesis লিখবে। সে আমায় চিঠি লিখেছিল, গীতার কতকগুলি প্রশ্ন লিখে পাঠিয়েছিল। তার প্রশ্নের উত্তর আমি লিখে পাঠিয়েছি।

পাশ্চত্য দেশে Birth control করে। সেরূপ প্রণালী অনুসরণ করা আমাদের উচিত নয়। আমাদের দেশে স্ত্রী-পুরুষ, উভয়েই সংযমী হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করবে, আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হয়ে চরিত্র গঠন করবে।

সব দেশেরই মেয়েদের শক্তি এক। শিক্ষা দিলে সব মেয়েরাই শিক্ষিতা হতে পারে। দেশকে স্বাধীন করতে হলে মেয়েদেরও শিক্ষা দিতে হবে। পুরুষ যেমন শিক্ষিত হবে, নারীও তেমন শিক্ষিতা হবে। পুরুষ কর্ম করবে, সেই কর্মে অনুপ্রেরণা করবে নারী। পূর্বে ক্ষত্রিয় বীরেরা যখন যুদ্ধে যেত, তখন ক্ষত্রিয় রমণীরা বীরদের গলায় মালা দিত, কপালে বিজয় তিলক পরিয়ে দিত; আর বলত,—"যাও, যুদ্ধে জয়লাভ করে মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করে ফিরে এসো। পরাজিত হয়ে দেশে এসো না,—রণস্থলেই প্রাণ বিসর্জন করো।"

২রা পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সন।

নন্দ—আচ্ছা, দীক্ষাগুরুতো এক হয়! তা' আপনি এখানে যাকে দীক্ষা দিয়েছেন, তারাতো সবই উদ্ধার হবে না। কর্মফলতো থাকবে! তাহলে আপনার দেহত্যাগের পর পুনরায় আপনাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে তো?

স্বামীজী—না, তা' কেন! ভগবান্ ভিন্নতো আর কেউ দীক্ষাগুরু হতে পারে না। তা' পরজন্মে যখনই তার গুরুর আবশ্যক হবে, তখন ভগবানই আসবেন গুরুরূপে।

২২শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ বলিলেন,—আমি ঠাকুরের সব জিনিস এমন সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতুম যে তিনি তাই দেখে খুব আনন্দ করতেন। আমি তাঁর ওষুধের বোতল-শিশি সব ঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখতুম বলে তিনি আমায় বলেছিলেন যে,—'যে জিনিসটি যেখানকারের, সেখানেই তা' যত্ন করে রাখতে হয়; তা'হলে সময়মত সে-জিনিসটি পাওয়া যায়।' এখনও আমার প্রত্যেক জিনিস সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো আছে। একটি নড়লে আমি বুঝতে পারি।

১৯৩০ সাল। স্বামীজী মহারাজ তখন দার্জিলিং বেদান্ত আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। এই সময় স্বামীজী মহারাজের প্রিয় পোষা কুকুর Tramp একদিন আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। পরে কুকুরটি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে স্বামীজী মহারাজ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং নিম্নলিখিত কবিতাটি মুখে মুখে রচনা করেন। কবিতাটি তাঁহার পশুপ্রীতির সুন্দর নিদর্শন।

Swamijee's joy at the return of Tramp.

What does hear Robin say.
Tramp has our come away.
O Tramp ! my Tramp ! come to me,
I do here weep for thee.
Bring for Tramp, O, food to eat,
Give him just a piece of meat.
Perhaps, O Tramp, that can'st thou guess,
I do never love thee less.
O dear Tramp ! do tell me now,
Why, O Tramp, then gone hast thou ?
Made we search all but in vain.
Howe'er thou hast come again.
Thank, O God, auspicious day,
Ne'er leave me in this way.
Be with me in day and night,
Dance and play and make delight."

১৯৩৭ সন। কলিকাতা বেদান্ত সমিতি।

স্বামীজী মহারাজ একদিন তাঁহার ঘরে বসিয়া সমাগত ভক্তদিগের সহিত কথা বলিতেছেন। তন্মধ্যে একজন ভক্ত স্বামীজী মহারাজকে জানাইলেন যে, তার ছেলেটি উচ্ছন্নে যাইতেছে। তিনি স্বামীজী মহারাজকে অনুরোধ করিলেন, —"আশীর্বাদ করুন, আমার ছেলের যেন সুমতি হয়; সে যেন সৎপথে ফিরে আসে।"

সমস্ত শুনিয়া স্বামীজী মহারাজ ঈষৎ ভৎ´সনার স্বরে ভক্তটিকে বলিলেন,—"এমন তো হবেই! কামজ সন্তান কি না!"

ভক্তটি লজ্জায় অধোবদন করিলেন।

স্বামীজী মহারাজ পুনঃ অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে যখন ভক্তগণ একে একে বিদায় লইতেছেন, তখন স্বামীজী মহারাজ ভক্তটির দিকে ফিরিয়া করুণামাখা কণ্ঠে বলিলেন,—"যাও! ভালই হবে।"

ভক্তটি তখন সহাস্যবদনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে ভক্তটি পুনরায় একদিন সমিতিতে আসিয়া স্বামীজী মহারাজকে জ্যনাইলেন যে তাহার ছেলের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে;—সে এখন ভাল হইয়াছে।

২

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের কয়েকখানি পত্র

(১)

স্বামীজী মহারাজ নন্দকে পত্রে লিখিলেন:

Darjeeling
28-7-31.

স্নেহের নন্দ,

তোর পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। তুই যে সকল দুর্লভ জিনিষ পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিস্ তাহা হঠাৎ একদিনে পাওয়া যায় না। তাহা পাইবার জন্য পুরাকালে ঋষি, মুনিরা কত তপস্যা করিয়াছিলেন তাহা পুরাণাদি শাস্ত্রে কথিত আছে। তুই যদি ভগবানে অচলা ভক্তি, বিশ্বাস পাইবার ইচ্ছা করিস্ তা'হলে

তোকেও তপস্যা করিতে হইবে। তপস্যা মানে উধাও হয়ে ঘুরে বেড়ান নহে। নিষ্ঠাপূর্বক জপ, ধ্যান, আত্মসংযম করিবার নাম তপস্যা। নিয়মিত আহারাদি দ্বারা স্বাস্থ্য নীরোগ রাখিতে হইবে। তীর্থস্থানে গিয়া ভিক্ষান্নজীবী হইলে উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া যায় না, সুতরাং ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। সেইজন্য আমরা সমিতি ও আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। তথায় সাধুদিগের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের সেবা, শুশ্রূষা করিলে মনের মলিনতা দূর হইবে এবং চিত্ত শুদ্ধ হইবে। চিত্তশুদ্ধি যতদিন না হইতেছে ততদিন মনের চঞ্চলতা যাইবে না। মনের চঞ্চলতা থাকিলে জপধ্যান ভাল লাগে না। সে সময়ে পূজা, সাধুসেবা, গীতাদি পাঠে মন লাগাইতে হইবে এবং ভগবানের নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে হইবে। আমাদের ঠাকুর কত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কত কাঁদিয়াছিলেন এবং কত ব্যাকুলতার পর জগদম্বা তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে জানিতে পারবি। ভক্তি, বিশ্বাসের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি দিয়া থাকেন। তুই সর্বদা প্রার্থনা করবি এইরূপে,—হে দয়াময়, কৃপা করিয়া আমাকে অচলা ভক্তি ও অটল বিশ্বাস দিন। আমার মন প্রাণ যেন অচলভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মে লিপ্ত থাকে এবং অন্য কোন দিকে যেন না যায়, ইত্যাদি। ভগবান্ অন্তর্যামী, তিনি তোর প্রার্থনা নিশ্চয়ই শুনিয়া তোর প্রতি দয়া করিবেন। প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় ঠাকুর ঘরে বসিয়া ২।৩ হাজার বার ইষ্টমন্ত্র জপ করবি এবং প্রার্থনা করবি। জপ করিতে করিতে মন স্থির হইলে ধ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি চিন্তা করবি। তৎপর সমিতির কর্মকর্তার আজ্ঞা পালন করিয়া তিনি তোকে যে কার্য করিতে বলিবেন তাহা মনোযোগের সহিত করবি এবং নিজের মত চালাবি না। সর্বদা প্রীতির সহিত কার্য করবি। ইহা করার নাম তপস্যা। এইরূপ তপস্যা তিন বৎসর নিষ্ঠার সহিত করিলে তোর মন স্থির হইবে এবং চিত্তশুদ্ধি হইবে। তারপর যাহা তোর প্রাণ চাহিতেছে অর্থাৎ যাঁহাকে দর্শন করিলে আর কিছুই দেখিবার দরকার হয় না,—যাঁহাকে দেখিলে কাম, ক্রোধ থাকে না, তাঁহাকে দর্শন করিবার অধিকারী হইবি। দীক্ষার সময় যেরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ইষ্টমন্ত্র দশবার জপ করিতে বলিয়াছিলাম সেইরূপ দশবার মাত্র দুইবেলা করবি এবং হাতে তালি দিয়া "হরিবোল", "হরিবোল" একশত বার বল্‌বি। এইরূপ করিলে মনের পাপ দূর হইয়া যাইবে। তখন শান্তি ও আনন্দ পাবি। এইগুলি নিয়মমত এক মাস সাধন করিয়া কেমন থাকিস্ তাহা আমাকে লিখ্‌বি।

এখন এই পর্যন্ত। আমার শুভাশীর্বাদ ও সকলের ভালবাসা জানবি। আশ্রমের সকলে ভাল আছে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

অভেদানন্দ

(২)

১।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি
কলিকাতা
January, 6th. 1925.

স্নেহের চারুপ্রভা,*

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। তোমরা ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। তুমি লিখিয়াছ যে, দিন দিন সাংসারে জড়াইয়া পড়িতেছ এবং জপ-ধ্যানাদি করিবার সময় পাও না। তুমি হাতে কাজ করিবে এবং মনে মনে ভগবানের স্মরণ করিবে এবং জানিবে যে এই সংসার তোমার নহে, ভগবানেরই সংসার। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তোমার ছেলের সেবা করিবার সময় নারায়ণ বুদ্ধি করিয়া সেবা করিবে। রাত্রে শুইবার আগে সমস্ত দিনের কর্মফল ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। এবং সর্বদাই তাঁহার নিকট ভক্তি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিবে। এইরূপে সংসারে থাকিলে শান্তি ও আনন্দ পাইবে। নচেৎ সংসার দুঃখকষ্ট শোকে পরিপূর্ণ। ইহাতে যে সুখ মানুষ পায় তাহা অত্যন্ত অল্পক্ষণ স্থায়ী। মানুষ যাহা চায় তাহাই পায়। তুমি যাহা চাহিয়াছিলে তাহাই পাইয়াছ, আবার যখন ঠিক ঠিক ভাবে ভগবানকে চাহিবে তখন তিনি সংসারের সকল জিনিষ উল্টে পাল্টে দিয়া তোমাকে দেখা দিবেন। কিন্তু তোমার মায়া মমতা যতদিন প্রবল আছে ততদিন তুমি ভাগবানকে প্রাণের সহিত ঠিক ঠিক ভাবে চাহিতে পারিবে কি? ভগবান সকলের বাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি যে যাহা চায় তাহাকে তাহাই দেন। তুমি খোকা চাহিয়াছিলে, খোকা পাইয়াছ। এক্ষণে তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট থাক।

তোমরা সকলে আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে এবং অন্নপূর্ণাকে বলিবে যে তাহাদের পত্র পাইয়াছি, শীঘ্রই উত্তর দিব। ইতি—

আঃ অভেদানন্দ

* জামসেদপুরের ৺সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পত্নী চারুপ্রভা ঘোষ।

(৩)

বলেন ভিলা
২২শে জুন, ১৯২৩

স্নেহের চারুপ্রভা,

তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। এখানে আসিয়া অবধি আমার শরীর ভাল আছে। এ স্থানটি অতি রমণীয়। এখান হইতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ বরফের পর্বত দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্ভুত দৃশ্য ! একবার দেখিলে আর ভুলা যায় না।

তুমি কি লিখিয়াছিলে যাহার জবাব দিই নাই এবং যাহার জন্য তুমি দুঃখিত আছ, তাহা আমার স্মরণ নাই। আবার যদি সে কথা লিখে পাঠাও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব। তুমি বেশ আছ এবং বেশ উন্নতি করিতেছ। এইরূপই করিতে থাক। তাহা হইলেই ৺ঠাকুরের কৃপা পাইবে এবং আরও শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি করিতে পারিবে। ঠাকুরের কথামৃত পাঠ কর এবং তাঁহার নাম জপ করিতে থাক। বেশীক্ষণ মন স্থির করে ধ্যান করা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়, তজ্জন্য চিন্তা করিও না। সুবিধা পাইলেই তাঁহার নাম জপ করিলেই ধ্যানের ফল পাইবে। প্রাণ খুলে ঠাকুরের কাছে ভক্তি-বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিও। আমি আশীর্বাদ করিতেছি যে তোমার খুব ভক্তি ও বিশ্বাস হউক। আমি ১লা জুলাই পর্যন্ত এইখানে থাকিব, এইরূপ ইচ্ছা। পরে কলিকাতায় যাইব। ওখানকার সকলকে আমার আশীর্বাদ দিও এবং তুমিও গ্রহণ করিও। ইতি—

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী
অভেদানন্দ

(৪)

দার্জিলিং
১০ই জুন, ১৯২৩

স্নেহের চারুপ্রভা,

তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানি এখানে পাইয়াছি। আমি এখনও কলিকাতায় নামিয়া যাই নাই।

আমি আমেরিকা যাইবার পূর্বে সংস্কৃতে ঠাকুরের অনেক স্তোত্র লিখিয়াছিলাম। সেগুলি সব ছাপা হয় নাই। তাহারই মধ্যে একটা

"বসুমতী"তে বাহির হইয়াছে। তবে উহাদের বাঙ্গলাগুলি ইদানীং আমেরিকা হইতে ফিরিয়া পত্তে করিয়াছি। আমি নিজেই আশ্চর্য হইয়াছি যে এতদিন পরে আমার হাত দিয়া বাঙ্গলায় পত্ত বাহির হইল। সকলই ঠাকুরের মহিমা। তাঁহার কৃপায় বোবার বোল ফোটে এবং অতি মূর্খও পণ্ডিত হয়। তোমার কোন ভাবনা নাই। ঠাকুরকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে থাক। তিনিই সব করিয়া দিবেন। আমরা একটা উপলক্ষমাত্র। ঠাকুরই সব করিতেছেন। তাঁহাকে ডাকাই সার পদার্থ। সংসারটি এবং দেহ-মনটি তোমার নয়; কিন্তু ঠাকুরের। এই বুদ্ধি রাখিয়া চিঁড়ে কুটুনীর ন্যায় ঠাকুরে মন রাখিয়া সংসারে সমস্ত কার্য করিতে থাক। এবং সমস্ত কার্যের ফল ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্পণ কর। ইহা করিতে করিতে ঠাকুর দেখা দিবেন। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিও এবং অন্নপূর্ণা প্রভৃতিকেও দিও। ইতি—

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী
অভেদানন্দ

(৫)

দার্জিলিং
১০ই জুন

স্নেহের চারুপ্রভা,

তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তোমার অসুখের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমি তোমার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে তুমি শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে পার। তুমিও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে এবং তাঁহার নাম জপ করিবে। দুঃখকষ্টে একমাত্র তিনি সহায়সম্বল। কুন্তী ভগবানের নিকট দুখঃকষ্ট প্রার্থনা করিয়াছিল,—"হে ভগবন্, সুখের সময় তোমাকে ভুলিয়া যাই, সেইজন্য আমি সুখ চাই না। দুঃখকষ্টে তোমাকে স্মরণ করিতে পারি, সেই কারণে আমাকে দুঃখকষ্ট দিও।"

এক ভগবানই শান্তি-সুখ দাতা। তাঁহার নাম জপ ও চিন্তা করিলে তিনি তোমার কষ্ট দূর করিয়া দিবেন। দেহযন্ত্র দ্বারা এখন যাহা করিবার সামর্থ্য নাই, তাহা করিবার চেষ্টা ত্যাগ করিবে। বেশী কথা বলিবার আবশ্যক নাই। চলাফেরা অথবা সংসারের কাজকর্ম যতটুকু করিতে পার ততটুকুই এখন করিবে। বিছানায় শুইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা করিবে। তিনি তোমার আত্মার

আত্মা, প্রাণের প্রাণ। তাঁহার জরা-ব্যাধি, দুঃখকষ্ট কিছুই নাই। দেহের ব্যাধি-কষ্ট হয়। আত্মার ব্যাধি হয় না। এইরূপ চিন্তা করিলে শান্তি পাইবে।

এখন পূর্বাপেক্ষা একটু সুস্থ বোধ করিতেছি। নগেন প্রভৃতি আশ্রমের সকলে ভাল আছে। তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে এবং তোমার স্বামী ও সন্তানদিগকে জানাইবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

অভেদানন্দ

(৬)

11, Eden Hospital Road

Cal. 26. 4. 1924

স্নেহের চারুপ্রভা,

তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। সতীশ কাল এখানে আসিয়াছিল। জামসেদপুরে গিয়াছে। আমিও জামসেদপুরে তিন রাত্রি ছিলাম। দুইটি বক্তৃতা—একটি বাঙ্গলায় ও অপরটি ইংরাজীতে দিয়াছিলাম। ওখানকার অন্নপূর্ণা প্রভৃতি সকলে ভাল আছে।

তুমি শোক করিও না। শোক করিলে তোমার গর্ভে যে আছে তাহার ক্ষতি হইবে। এইটি মনে রাখিবে। একটি গেল আর একটি আসিতেছে। সংসারের এই নিয়ম। তুমি ত একা নয়, সকলেরই এই দশা। ভগবানের সংসার জানিয়া মায়ামোহ ত্যাগ কর। তিনি যাহা ভাল তাহাই করেন। এ বিষয়ে আর কাহারও হাত নাই। যখন জপধ্যান করিতে ইচ্ছা হইবে তখন যথাসাধ্য করিবে। তাহাতে কোন দোষ হইবে না। আমার শরীর অনেকটা ভাল আছে। আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আঃ অভেদানন্দ

(৭)

11, Eden Hospital Road,

Cal. 28. 3. 24.

স্নেহের সতীশ ও চারুপ্রভা,

তোমাদের দারুণ শোকসংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইয়াছি। খোকা তোমাদের ছাড়িয়া গিয়াছে, এ সংবাদ হৃদয়বিদারক। এই দারুণ শোকের

সময় আমার প্রাণের সহানুভূতি এবং শুভাশীর্বাদ গ্রহণ কর। আমি ঠাকুরের নিকট তোমাদের জন্য প্রার্থনা করিতেছি যেন তিনি তোমাদের হৃদয়ে শান্তি দেন এবং যেন তিনি তোমাদের খোকার আত্মাকে নিজ ক্রোড়ে স্থান দেন। খোকার আত্মা অতি পবিত্র। এই দুঃখপূর্ণ সংসারে তাহার স্থান ছিল না। সেইজন্যই সে এত অল্প বয়সে চলিয়া গেল। এরূপ ঘটনাতে মানুষের কোন হাত নাই। ভগবান্ যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করেন। এ সময়ে তোমাদের ধৈর্য ধারণ করা বিশেষ আবশ্যক। শোকে কাতর হইয়া অধীর হইলে কিছুই লাভ হইবে না। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে। উহা ফিরিবার নহে। সংসারে এমন কেহই নাই যে তোমাদের ন্যায় পুত্রশোক পায় নাই। জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, তবে কাহার আগে এবং কাহারও দেরিতে। এই সময়ে ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিও এবং ঠাকুরের নিকট শান্তির জন্য প্রার্থনা করিও। আমি আবার আশীর্বাদ করিতেছি, যেন তোমাদের মনে শান্তি আইসে। ইতি—

আঃ অভেদানন্দ

(৮)

11, Eden Hospital Road,
Cal. 6. 5.1923

স্নেহের চারুপ্রভা,

তোমার দুইখানি পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আমরা বাটী পরিবর্তন করিয়াছি। সেইজন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। এ বাটীতে খুব হাওয়া এবং চারিদিক খোলা। সেইজন্য বিশেষ কষ্ট নাই। এখন অনেক ভাল আছি। ভক্তির পূজায় বিশেষ মন্ত্রের আবশ্যক নাই। যে মন্ত্র দিয়াছি সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুষ্পাদি অর্পণ করিও। তাহা হইলেই পূজা করা হইবে। তৎপরে নাম জপ করিতে করিতে ঠাকুরের মূর্তি চিন্তা করিবে। এই ধ্যানের সহজ উপায়। "সৎকথা" বইখানি বেশ হয়েছে। উহা পাঠ করিও।

আমি কাঁথিতে এক সপ্তাহ মাত্র ছিলাম। গৌরী মা কি এখনও তোমাদের নিকট আছেন?

তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে এবং আর সকলকে দিবে। ইতি—

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী
স্বামী অভেদানন্দ

৩

১৩ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৩৫ সন।

স্বামীজী মহারাজ রাত্রিতে আহার করিতেছেন আর গান গাহিতেছেন,—

"কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়ায়েছ মা পদ দিয়ে,
সাধ ক'রে জিভ বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে!
বল দেখি মা, সুধাই তারা, তারা কি তোর এমনি ধারা!
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল এমনি করে!"

২৮শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৪১ সন।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীমতী রাধিকা যে গানটি গাহিয়াছিলেন, সেই গানটি রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ গাহিতেছিলেন,—

"হরি গেও মধুপুর সই, হাম কুলবালা,
বিপথ যেয়সে পড়ল সই, মালতীমালা।
নয়নকা নিন্দ গেও, বয়ানক হাস্
সুখ গেও প্রিয় সঙ্গ, দুঃখ হামা পাশ।"

গান শেষে বলিলেন, "বরানগরের মঠে তারকদা এই গানটি খুব গাইতেন।"

১২ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৪৩ সন।

গভীর রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ আপন মনে গান গাহিতেছেন,—

"এ মায়া প্রপঞ্চময় ভব-রঙ্গমঞ্চ মাঝে,
রঙ্গময়ী মহামায়া যারে যা সাজান, সে তাই সাজে।
কর্মক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াসূত্রে সব গাঁথা,
কেহ পুত্র, কেহ মিত্র, কেহ ভার্যা, কেহ ভ্রাতা।

কেউ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা,
কত রঙ্গের অভিনেতা আসছেন কত সাজ সেজে।
যার যখন হতেছে সাঙ্গ রঙ্গভূমির অভিনয়,
কোথা পুত্রের কাতর বিনয়, কোথা প্রিয়তমার প্রণয়,
মানে না কারো অনুনয়, চলে যায় সাজসজ্জা ত্যজে।"

৩০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজের আদেশে অধ্যাপক শিশির আচার্য রচিত সঙ্গীতটি অধ্যাপক যশোদা বাবু গাহিতে লাগিলেন,—

"দয়ানিধে রামকৃষ্ণ চরণরজ পাই
অলখ নিরঞ্জন আউর ন কোই ॥
অরূপ নাম দেশ কাল নাচত ব্যোমকেশ ভাল
বাজই অনাহত তাল মোহন মন মোহই ॥
খেয়াল-সিন্ধু করত রোল লহরসে পুঁহমী খেল
মোতিনক কণ্ঠমাল তারাগণ শোহই ॥
হজার তেঁরী আঁখমুখ হাতপৈঁরী নাসা বাক
লুঠত চিত দেহি সুখ ভুবনরূপ রাজই ॥
দিব্যজনম সাধনখান ধরম ক্ষীর করত দান
তপ জপ ধ্যান ভক্তি জ্ঞান সকল ধরম রূপই ॥
বিহরত অবতার ধীর শিষ্য সহিত মায়াতীর
জ্ঞানগিরি শিখর ফোরি অমিয় গঙ্গা বহই ॥"

এই সঙ্গীতটি স্বামীজী মহারাজ শুনিয়া বলিলেন, "বাঃ, বেশ সুন্দর গান! এ গানটি আমায় লিখে দাও।"

অধ্যাপক শিশির আচার্য মহাশয়ের সহিত স্বামীজী মহারাজের ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইতে লাগিল। স্বামীজী মহারাজ তাহাকে বলিলেন, "বিদ্যা ও অবিদ্যার পারে—ব্রহ্ম।"

১০ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ সাল।

বৈকালবেলা স্বামীজী মহারাজ "বাংলার কথা" পড়িয়া বলিলেন, "শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এখন মায়ের ভক্ত হয়েছেন। বলছেন, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী! জগন্মাতার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

অতঃপর তিনি গাহিতে লাগিলেন,—

"সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ কারে কর অধোগামী।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী আমি ঘর তুমি ঘরণী
আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি।"

৯ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৩৫ সন।

মধ্যাহ্নে স্বামীজী মহারাজ স্নান করিয়া আসিয়া গুর্বষ্টক আবৃত্তি করিতেছেন,—

"ভব সাগর তারণ কারণ হে
রবি-নন্দন-বন্ধন খণ্ডন হে।
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥"

অতঃপর বলিলেন,—"সরল না হলে ধর্ম হয় না। আমি সরল বলে ঠাকুর আমাকে ভালবাসতেন। আমার মনে যা উঠত তাই তাঁর নিকট সব বলতাম।"

তিনি আবার গাহিতে লাগিলেন,—

"প্রেম অমূল্য রতন
মিলে হৃদি জলনিধি করিলে মন্থন।
স্বভাব সরল করে, গরিমা গরল হরে,
সকলই সুখের তরে বিধির সৃজন।
সবে কহে প্রেমকথা, প্রেম কি মুখেরই কথা,
প্রেম কথা নাহি তথা, সুজন কুজন।"

৩রা শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৩৫ সন।

রাত্রিতে আহারের পর স্বামীজী মহারাজ চেয়ারে বসিয়া আপন মনে গান গাহিতেছেন,—

"এমনি কি যাবে দিন দীনবন্ধু হে,
দিনে দিনে দিন ফুরাল হয়ে চির-পরাধীন।

বাল্যে ছিলাম খেলার অধীন,
যৌবনে বিষয়ের অধীন,
সংসার বাসনার অধীন
রহিলাম হে চিরদিন।"

৭ই মাঘ, রবিবার, ১৩৪০ সাল।
ভবনাথ সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ গান গাহিতেছেন,—

"কালী ঘুচালি সব লেটা।
আগম নিগম শিবের বচন মানবি কিনা মানবি সেটা॥
শ্মশান পেলে ভালবাস মা তুচ্ছ করি মণিকোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন ঘুচল না আর সিদ্ধি ঘোঁটা॥
তুমি যারে কৃপা কর মা অপূর্ব তার রূপের ছটা।
(তার) কটিতে কৌপীন জোটেনা, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
ভূতলে আনিয়ে মাগো করলি আমায় লোহা-পেটা।
তবু কালী বলে ডাকি মা, সাবাস আমার বুকের পাটা।
চাক্‌লা জুড়ে নাম রটেছে প্রসাদ ব্রহ্মময়ীর বেটা।
মায়ে-পোয়ে এমন ব্যভার মর্ম ইহার বুঝবে কেটা॥"

২৮ শে ভাদ্র, রবিবার, ১৩৩৭ সন।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ বলিলেন, "কর্তৃত্ব করা সোজা কথা নয়!—সব বিষয়ে যাঁর জ্ঞান আছে, সে-ই কর্তা হতে পারে। শুধু হুকুম চালালে হয় না। নেতা হওয়াও শক্ত। যে সকলের সেবা করতে পারে, সে-ই নেতা হতে পারে,—servant of all. আমেরিকাতে যে President হয়, সে নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করে। সে মনে করে যে, সে ভগবানের কৃপায় সকলের সেবা করবার সুযোগ পেয়েছে,—I am the servant of all.

নেতার গুণ কি জানিস্? বিনয়ী, নম্র আর অভিমানশূন্য হবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হয়েও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদের পা ধোয়াবার কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। যীশুখ্রীস্টও নিজের শিষ্যদের পদ ধৌত করে দিয়েছিলেন। স্বামীজীরও কোন অভিমান ছিল না; কোনদিন তিনি মনে

করেন নি যে, "বিবেকানন্দায় নমঃ" বলে একটা ফুল দিয়ে তাঁকে কেউ পূজো করুক। তাঁর অনেক গুণ ছিল,—আর আমাদের একটু আধটু গুণ আছে,—এই যা তফাৎ। কথায় বলে, বড় হবি ত' ছোট হ'।"

অতঃপর স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে স্বামীজী মহারাজ বলিলেন, "স্বামীজীর আমেরিকা যাবার পূর্বেও তাঁর সঙ্গ করেছি, আর আমেরিকাতেও একত্রে বাস করেছি। তিনি কি ছিলেন, না-ছিলেন তা' আমরা জানি। তিনি আমাদেরই মত ছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালীর মত। তাঁর মধ্যে যে স্বদেশপ্রেম ছিল, তা' তখন কিছুই প্রকাশ পায় নি। আমেরিকায় যেয়েই তাঁর চোখ ফুট্‌ল,—স্বাধীন দেশের হাওয়া খেয়ে। আমেরিকায় না গেলে কি তাঁর অত স্বদেশপ্রেম জেগে উঠ্‌ত? তাই এদেশে এসে তিনি অত দেশোদ্ধারের কথা বলেছিলেন। বাস্তবিকই দেশের জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল। আমেরিকা স্বামীজীকে তৈরী করেছিল। সেখানে যেয়েই 'বিবেকানন্দ' নাম পেলেন, আর ঐ নামেই জগতে পরিচিত হলেন। স্বামীজীর সন্ন্যাস গ্রহণ করবার সময় নাম নিয়েছিলেন "বিবিদিষানন্দ", পরিব্রাজক অবস্থায় "সচ্চিদানন্দ" নামে পরিচয় দিতেন।"

৩০ শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

আগামীকল্য স্বামীজী মহারাজের শুভ জন্মতিথি। সেই সম্পর্কে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমার আবার জন্মোৎসব কি? আমার জন্মই নাই! আত্মার কি জন্ম হয়? দেহের জন্ম আছে বটে। তবে তোদের জন্মোৎসব করার ইচ্ছে, তা' তোরা করতে পারিস্। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করবি। জন্মোৎসব করা মানে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণ করা। এই দিনে তাঁর বিশেষ পূজা করতে হয়, তাঁর ভাবময় জীবনের যে-কোন একটি ভাব নিয়ে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে হয়। মহাপুরুষেরা জগতের উপকারার্থে শরীর ধারণ করেন। তাঁদের শরীর ধারণে জগতের কল্যাণ হয়। এই জন্য তাঁদের শুভ জন্মতিথিতে ভক্তেরা উৎসব করে, আনন্দ করে। ব্রহ্মের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, তাঁর রূপও নাই,—নিরাকার। এই মানুষের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ,—সেই অনন্ত পুরুষের চিন্তা কিরূপে করবে? মানুষের নিকট ভগবান্‌কে মানুষরূপেই অবতীর্ণ হতে হবে। কিন্তু ব্রহ্ম যখন মায়াশক্তিকে আশ্রয় করে জীবদেহ ধারণ করে মানুষরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়ে জগৎকে শিক্ষা দেন, তখন তাঁর খেলাকে লীলা বলে।

তাঁরা যেদিন প্রকটরূপে, মূর্তিরূপে জগতে আবির্ভূত হন, সেই শুভ জন্মদিন তাঁর ভক্তদের কাছে কত আনন্দের, বল! সাধারণ মানুষ কি এসব বুঝতে পারে? শ্রীরামচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন কেবল সাতজন ঋষি তাঁকে ভগবান্ বলে জেনেছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে তাদেরই মত একজন মনে করত। শঙ্করাচার্য ত' সদাশিব, কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের দিন কি ভক্তদের আনন্দের নয়? এতে তাঁর পক্ষে হর্ষও নেই, আনন্দও নেই, দুঃখও নেই! মহাপুরুষদের কয়জনে চেনে? যারা চেনে, তাদের কাছে সেই শুভদিন কত আনন্দের, কত মধুর! যিনি মানবের হিতের জন্য শরীর ধারণ করেন, তিনি জীবের হৃদয়ে শান্তি প্রদান করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কয়জনে চিনেছে? লোকে সাধারণ মানুষই জ্ঞান করে।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ বলিলেন,—"ভালবাসা, ভালবাসা, ভালবাসাই ভগবান্। যেখানে ভালবাসা নেই, সেখানে ভগবান্ নেই, জানবি!"

৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"আমি ছেলেবেলায়ও মেয়েদের মুখের পানে কখনও দৃষ্টিপাত করতাম না, মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকৃতাম! তাদের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছাই হ'ত না! এখনও আমার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে প্রবৃত্তিই হয় না! সাধু-সন্ন্যাসীদের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা ঠিক নয়। বলা ত যায় না, কখন কি হয়! আমেরিকাতেও মেয়েদের সঙ্গে মিশতাম না! মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষত সবই সমান।"

স্বামীজী মহারাজ অতঃপর কয়েকজন ভক্তের বিষয়ে বলিয়া বলিলেন,—"বাস্তবিকই ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস না থাকলে কিছুই হয় না! জ্ঞানের অধিকারী ত সকলে হতে পারে না! অত জ্ঞান-চচ্চড়ি করলে নাস্তিক হয়ে যাবে, গুরুই মানবে না; বলবে, গুরু আবার কে? শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধা ভক্তি এক।' তিনি একটি গান গাইতেন,—

"আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো!
আমার ভক্তি যেবা পায়, তাঁরে কেবা পায়,
সে-যে সেবা পায়, হয়ে ত্রিলোকজয়ী।"

১লা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সাল।

স্বামীজী মহারাজ—"ইংরেজদের রাজত্ব ধ্বংস হওয়াই ভাল, ধ্বংস হবেই। কি অত্যাচারই না কচ্ছে! ভগবান্ কি আর দেখছেন না? তিনি যখন মারবেন তখন এদের অস্তিত্বই জগৎ হতে উঠিয়ে দেবেন। কর্মের ত একটা ফলাফল আছে। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন কর্মের ফল পাবে। জগতের ইতিহাসে দেখা যায় না যে, কেউ এমন অত্যাচার করেছে! Spain ধ্বংস হয়ে গেল, Rome-ও ধ্বংস হয়ে গেল! আজ তারা কোন্ পঙ্কিলে পড়ে রয়েছে! এদেরও ধ্বংস হবে। এদের রাজত্ব কি আর চিরকাল থাক্‌বে? History repeats itself.

ইংরেজদের আসবার পূর্বেও-তো এদেশ পরাধীন ছিল, আজ প্রায় সাত শ বছর! ভগবান এদের পাঠিয়েছেন, চোখে আঙ্গুল দিয়ে ভারতবাসীদের শিক্ষা দেবার জন্যে! আবার সময় হলে তিনিই এদের সরিয়ে দেবেন। এই সঙ্গে ভারতের পূতিগন্ধময় আবর্জনা স্তূপ কুসংস্কারগুলি ধ্বংস হয়ে নূতন ভারতের সৃষ্টি হোক্, United States of India. যীশুখ্রীস্ট বলেছিলেন, "New wine cannot be put in the old bottle.' অবশ্য যেগুলো ভাল, যাতে মানুষের হৃদয়ে উদার ভাব এনে মানুষকে মহত্ত্বের পথে লয়ে যায়, ঘৃণার ভাব না আসে,—সেগুলো থাকবে।"

৮ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সন। দার্জ্জিলিং।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ প্রহ্লাদবাবুকে বলিলেন,—"দিন ত ফুরিয়ে গেল, আর কত দিন অন্ধকারে থাকবে? একটু আলোতে এসো। আলোর সন্ধান কর। আঁখি মুদলে তোমার ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী কোথায় থাকবে? তোমার শরীরও থাকবে না! এখন তোমার মনে যে ভাবটি আছে, সেই ভাবটিই শুধু মৃত্যুর পরে থাকবে,—আর কিছু থাকবে না। মৃত্যুর পূর্বে যে ভাবটি প্রবল থাকবে মৃত্যুর পরেও সেই ভাবটিই থাকবে, তাই এখন হতেই চেষ্টা কর। জীবনে করলে কি? জীবনের অর্ধেক সময় ত ঘুমিয়েই কাটালে, বাল্যে খেলা-ধূলায়, কৈশোরে পড়াশুনায়, এখন স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে সংসার করছ। মায়ামোহে ডুবে আছ! তাই একবার এখন ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য কি! জগতে আমি কেন এসেছি! এই সব প্রশ্ন মনে উত্থাপন করে ভাব। তাহলেই জগতের সব রহস্য বুঝতে পারবে।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—

যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

—এই শ্লোকটি তুমি চিন্তা করবে, সর্বদা ধ্যান করবে। আজীবন যে অন্যায় করে এসেছে সে কখন মৃত্যুর সময় ভগবানের চিন্তা করতে পারে না; তার মনে সেই পূর্বাভ্যাসানুরূপ চিরাভ্যস্ত বিষয়গুলোই আপনা-আপনি স্মৃতিতে জেগে ওঠে। সেইজন্যই ছেলেবেলা হতেই অভ্যাস করতে হবে, সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করবে। সর্বদা ভগবানের স্মরণ করা অভ্যাস হলে মৃত্যুর সময়ও তাঁর স্মরণ করতে পারবে, সদ্গতি হবে।

কথায় বলে, মরণ কালে কি হরিনাম হয়? তুমি এখানে যেমন আছ, মৃত্যুর পরেও ঠিক তেমনি থাকবে, কিছু পরিবর্তন হবে না; অবশ্য, তোমার এ-দেহ থাকবে না, এই মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার সবই থাকবে সূক্ষ্ম শরীরে। তাই সদ্ভাব গ্রহণ কর। এখন হতে জীবাত্মাকে spiritual food দাও। এইটিই তোমার আসল সম্বল। জীবনের এসব ত দু'দিনের জন্যে।"

প্রহ্লাদবাবু স্বামীজী মহারাজের অমৃতময় উপদেশ শুনিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, উপদেশ ত কতই শুনেছি, কিন্তু প্রাণে আঘাত করে না। আমরা ঘোর বিষয়াসক্ত জীব কিনা! আপনি আশীর্বাদ করুন, মহারাজ। আপনার আশীর্বাদে কিছু যদি হয়!"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া কহিলেন, "তোমাদের হৃদয় হচ্ছে পাথরের দেয়াল। পাথরে যেমন পেরেক মারলে ভোঁতা হয়ে ফিরে আসে, আঘাত করে না, সেরূপ আমাদের উপদেশ তোমাদের হৃদয়ে আঘাত করে না। এখানে মাঝে মাঝে আসবে। আমার কাছে আসা-যাওয়া করলেই হয়ে যাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায়।"

৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ লক্ষ্মণদাদাকে কহিলেন,—সকলকে ভালবাস! ভালবাসা দ্বারাই সকলের হৃদয় জয় করা যায়। মিষ্ট বাক্যে যে কাজ করতে পারবে, কটূক্তি প্রয়োগ করে তা করতে পারবে না। You cannot catch flies by vinegar. মধু দ্বারাই মাছিকে ধরা যায়, vinegar দিয়ে ধরা যায় না।"

অতঃপর তিনি লক্ষ্মণদাদাকে অনেক কথা কহিয়া কহিলেন,—"দেখ, Roman Catholic-দের কাছে কেউ monk হ'তে আসলে তাদের এই vow (ব্রত) গ্রহণ করতে হয় যে, chastity, poverty আর obedience. কোন কথা বলতে পারবে না, নীরবে আজ্ঞা পালন করবে। আজ্ঞাবহতা না থাকলে স্বেচ্ছাচারী হতে হয়, হাম্বরা-ভাব আসে।"

১০ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ ধীরেনদাদাকে কহিলেন, "অহঙ্কার ত্যাগ কর, তবে সাধু হতে পারবে। অত অভিমান কেন? দীনের দীন হও। নিজেকে অতিদীন মনে কর।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানীনা মান দেয় কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন, তৃণের চেয়ে নিজেকে হীন মনে করবে, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হবে, নিজে মান না চেয়ে অপরকে মান দিবে, আর সর্বদা হরিনাম কীর্তন করবে। —এইটি সাধন কর। গেরুয়া হচ্ছে অতি দীনাতিদীন ভাবের লক্ষণ, দীনভাব জানান। দীনভাব না আসলে দীনবন্ধুর কৃপা হয় না, জান্‌বে। নিজের আমিত্বকে নষ্ট কর, 'আমি'কে মেরে ফেল। 'আমি'র স্থানে 'তুমি'কে বসাও। 'তুমি' হচ্ছে শ্রীশ্রীঠাকুর, ভগবান্। তোমার যা ইচ্ছে, তা-ই হোক্। Thy will be done, আমার কোন নিজের ইচ্ছা নেই। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'মুক্ত হব কবে?—আমি যাবে যাবে।' এই ভাবটি নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারলে মহাপুরুষ হয়ে যাবে।

১২ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজ এক ধনবান্ গৃহস্থ ভক্ত পরিবারের কথা এবং জনৈক দরিদ্রা মহিলা ভক্তের বিষয়ে কহিয়া কহিলেন, "এই জন্যই ভগবান্‌কে দীনবন্ধু বলে। তিনি দীনের বন্ধু—দীনবন্ধু। তিনি সুদামার খুদ গ্রহণ করেন। তার শ্রদ্ধাভক্তি আছে বলেই সে মনে শান্তি পাচ্ছে। যদিও তার সাংসারিক অবস্থা তত সুবিধার নয়! কি জানিস্? ভগবান্ বাহ্যিক জিনিস চান্ না। তিনি চান্ শ্রদ্ধা, ভক্তি! হৃদয় দেখেন। তিনি ভাবগ্রাহী।"

১৭ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৩৭ সন।

রাত্রিতে আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ সেবক শিষ্যের বিষণ্ণ বদন দেখিয়া তাহাকে বলিলেন,—"কি রে! তোর মুখে হাসি নেই কেন? কি ভাবছিস্? হাসবি! হাসবি! তোদের হাসিমুখ না দেখলে আমার দুঃখ হয়। বাঙ্গালীর ছেলেরা হাসতে জানে না। মুখে সর্বদাই melancholy, বিষাদ-ভাব। আরে, দুদিনের তরে জগতে এসেছিস্। জীবনে হেসে আনন্দ করে নে।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ জনৈক মার্কিনবাসী মহিলার বিষয়ে কহিলেন,—"সকালবেলা যে মেমটা এসেছিল, দেখলি ত! সত্তুর বছরের বুড়ি হয়েও কি হাসিখুশি! সে art school-এর teacher, বেশ পণ্ডিত।*

ওদের দেশে এক একজন এক এক বিষয় নিয়ে বড় হয়। যে যে-বিষয়টি নিয়েছে, সে সেইটিই নিয়ে জীবন ভরে সাধনা করে; সে তাতেই খ্যাতি অর্জন করে, জগদ্বরেণ্য হয়। আর আমরা সব বিষয়েরই একটু একটু জানতে চাই বলেই আমাদের কোন বিষয়েই ঠিক ঠিক জ্ঞান হয় না।"

২৪শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩৩৭ সন।

জনৈক ভদ্রোলোকের পাঁচ-ছয়টি সন্তান এবং তাহার স্ত্রীর শরীরও অত্যন্ত দুর্বল। ইহা শুনিয়া স্বামীজী মহারাজ কহিলেন, "বাঙ্গালী কি কামুক জাত! কামই তাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা। কাম চরিতার্থ করাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে সুখ চায় কি না! জানে না, ইন্দ্রিয় সুখের সঙ্গে দুঃখও আসে, শেষে কষ্টভোগ করতে হয়। তখন কর্মফল ভোগ করে। ভগবান্ কি আর তার কর্মফল ভোগ করবে? তাকে নিজেকেই কর্মফল ভোগ করে শিক্ষা করতে হবে। সেজন্য ভগবান্ দায়ী নন্। সেজন্যই বাঙ্গালীদের শিক্ষা দিতে শ্রীশ্রীঠাকুর বাংলাদেশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ দেখিয়ে গেলেন। বেদান্তের চরম উদ্দেশ্য সাধন করে দেখালেন। সাধারণ লোক কি এই আদর্শ গ্রহণ করবে? বলবে, তিনি পেরেছিলেন বলেই কি আমরা পারব? আমাদের দ্বারা ও হবে না। তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ, দেবতা ছিলেন,—তাই পেরেছিলেন। আমরা নরকের কীট, গোলাম। তাঁর সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়? ……আরে, তুই নরকের কীট হবি কেন? তুই-ও দেবতা হ। বেদান্ত কাউকে উপদেশ দেয় না নরকের কীট হতে! তুমি

* নাম Ratherine M. Ball

ব্রহ্মস্বরূপ! ব্রহ্মই আছ। মায়ামোহে পরে নিজেকে ভুলে গিয়েছ কামক্রোধের দাস হয়েছে। তুমি কামক্রোধের প্রভু হও। তোমার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে দেবতা হও।"

তারপর স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"এই মাতৃজাতিই সংসারকে ধরে আছে। সংসারে বিদ্যারূপিনী মা প্রায় দেখা যায় না। অধিকাংশই অবিদ্যারূপিনী। তারা সকলকে মায়ামোহে আবদ্ধ করে রেখেছে। শঙ্করাচার্যের মা থেকে সব মা-ই এক। ঐ জন্যেই তো আমি স্তবে লিখেছি,—

স্নেহো হি মাতুরিহ কারণসন্নিবদ্ধো।
ভ্রাতুস্তথা পিতুরয়ং ন চ হেতুশূন্যঃ॥
যৎ প্রেমহেতুরহিতং ন হি কেন তুল্যম্।
তং প্রেম সিন্ধুসদৃশং ভজ রামকৃষ্ণম্॥

—পিতামাতা, স্ত্রী, ভাই, বন্ধুর ভালবাসায় কারণ আছে। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের ভালবাসায় কোন হেতু নেই, অহৈতুক প্রেম। তিনি আমাদের ভালবাসায় বশ করেছিলেন! তাইতে তো আমরা পিতামাতা ভুলে গিয়েছিলাম। বুদ্ধদেবের স্ত্রী,—রাহুলের মা, অশোকের স্ত্রী,—মহেন্দ্র-সঙ্ঘমিত্রার মা, তাঁরা সবাই বিদ্যারূপিনী মা ছিলেন। তাঁরা ত্যাগের ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলেই তাঁরা তাঁদের পুত্রকন্যাকে ত্যাগের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন। এমন দৃষ্টান্ত বিরল। তা' না হলে সকল মা-ই নিজের পুত্র-কন্যাকে সংসারে জড়িয়ে রাখে, নিজেও তাতে জড়িয়ে আছে। এরূপ অবিদ্যা-রূপিনী মায়ের কথা না শুনলে কোন অন্যায় হয় না। জ্ঞানী ছেলে কি অবিদ্যারূপিনী মায়ের কথা শোনে? আবার সংসারে বিদ্যারূপিনী-অবিদ্যারূপিনী স্ত্রী, দুই-ই আছে। বিদ্যারূপিনী স্ত্রী বড় দেখা যায় না। অবিদ্যারূপিনী স্ত্রী-ই সকল পুরুষকে কুহকে রেখেছে,—ভুলিয়ে রেখেছে। সাধ্য কি, তাদের হাত হতে এড়িয়ে যেতে! সেই মহামায়ার কৃপা না হলে কেউ পারে না! তাঁর কৃপা লাভ করতে হলে সকল স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞান করতে হবে। আর বিদ্যারূপিনী স্ত্রী পুরুষকে অবিদ্যার হাত হতে মুক্ত করে, জ্ঞানের পথে এগিয়ে দেয়, দেবতা বানিয়ে দেয়।

এই শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে আদেশ করলেন, আপনি দেবতা হউন। দেবতার চেয়েও যদি কিছু বড় থাকে জগতে, আপনি তা-ই হউন। এরূপ কয়জন স্ত্রী তাদের স্বামীকে আদেশ করতে পারে? জগতের ইতিহাসে এরূপ

দৃষ্টান্ত বিরল! তাইতে প্রবাসীতে বেশ লিখেছে,—"শ্রীশ্রীঠাকুরের যাহাই মহত্ত্ব থাকুক না কেন, কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের মহত্ত্বই বেশী। তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, অবিদ্যায় ভুলাইয়া রাখেন নাই, ঈশ্বরের পথে বা ধর্মকার্যে সহায়তা করিয়াছেন।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ আপন মনে গাহিতে লাগিলেন,—

"মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক্ হয়েছি,
হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাব্‌তেছি।
বিচিত্র ভবের খেলা ভাঙ্গ গড় দুই বেলা,
ঠিক যেন ছেলেখেলা বুঝতে পেরেছি।"

২৫শে আশ্বিন, রবিবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজের নিকট যাহারা সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই উকিল, ব্যারিস্টার, সলিসিটার কিংবা কেরাণী। সেইজন্য রাত্রিতে আহার করিবার সময় স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"খালি উকিল, সলিসিটার হয়ে বাঙ্গালী জাতটা গেল। উকিলগুলোকে আমি দেখতে পারি নে। সকালবেলা ঐ উকিলটা বলছিল, 'ওকালতি ছাড়া আমরা আর কি করব?' তার উত্তরে আমি বলেছিলাম,—'চাষ কর না বাবা! লাঙ্গল ধর!' ঐ উকিল, ব্যারিস্টার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, C. I. D., পুলিশ—এরাই ত ইংরেজদের রাজত্ব রেখেছে। High Court! ও কি আর বিচারের যায়গা! একটা মস্ত বড় gambling place. High Court, Law Court উঠে গেলে দেশের কল্যাণ হবে। High Court ত নয়,—মিথ্যার রাজত্ব। যে যত বড় উকিল সে তত পাকা জোচ্চোর। আমাদের দেশের ছেলেদের কি mentality! দলে দলে উকিল হচ্ছে। তাইতে আমি ঢাকায় বেশ বলেছিলাম,—'যত বেটা উকিলগুলো, এদের গলায় পাথর চাপিয়ে পদ্মার জলে ডুবিয়ে দাও! এতে দেশের কল্যাণ হবে। Sir P. C. Roy-ও এ কথা বলেন। তা' কি আমাদের দেশের লোক শুনবে? এই মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, হিন্দুস্থানী! তারা এদেশে এসে ব্যবসা করে ধনকুবের হয়ে যাচ্ছে! আর বাঙ্গালীরা কেবল কেরাণী হচ্ছে,—ইংরেজদের গোলাম হচ্ছে! গোলামীগিরি করতে মজবুত। রাজপুতনায় সব মরুভূমি, মাড়োয়ারে কি ছাই জন্মায়! ওদের দেশে জল চুরি হয়, পাতকুয়ায় তালাচাবি

দেয়। এই দার্জিলিং-এ একটা বাঙ্গালীর কাপড়ের দোকান আছে? যে কয়েকটি বাঙ্গালী আছে, তারা সকলেই আপিসের কেরাণীবাবু। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী।—Trade is the mother of wealth. চাকরি করে কেউ কখনো বড়লোক হতে পারে না! জাপান, চীন, মার্কিণ, জার্মানী, সব জাতিই ব্যবসা করে তাদের নিজ নিজ মাতৃভূমিকে শ্রীসম্পন্ন করেছে ধনবৃদ্ধি করে। আর আমরা কি করছি? ইংরেজের গোলাম হচ্ছি, তাদের পাত চাট্‌ছি। মহাত্মা গান্ধীরা কেউ Round Table Conference-এ যোগদান করলেন না, আবার আমাদের দেশ হতে কেউ কেউ Round Table Conference-এ যোগ দিতে বিলেত যাচ্ছে India-র Representative হয়ে! এদের কি একটু মনুষ্যত্ব নেই? দেশের বড় বড় নেতারা দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছে! এদের উপর কি অত্যাচারটা না কচ্ছে, তা একবার চিন্তাও করে না। আমার দেশের মা-ভাই-বোনের উপর যারা অত্যাচার করছে, তাদের উপর আমি sympathy দেখাব! এরা জাতির শত্রু, জাতীয়তার শত্রু!

এদেশ হতে একজন বিলেত গিয়েছিল। সে সেখানে একজন cutter-এর কাছে silk-এর কাপড়ের থান নিয়ে যায় স্যুট্‌ তৈরী করবার জন্যে! সেই cutter কাপড় দেখে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এ কাপড় কোথায় পেলেন?' সে বলল, 'India থেকে এনেছি।' Cutter বলল, 'কাপড় অবশ্য খুব ভাল, কিন্তু আমি এ কাপড়ের স্যুট্‌ তৈরী করতে পারব না। আপনি এ দেশের কাপড় কিনে আনুন, আমি স্যুট্‌ তৈরী করে দেব।'—দেখ্‌লি, কি দেশপ্রেম! তারপর সে যত tailor-এর কাছে গিয়েছে, কেউই ঐ কাপড় কেটে স্যুট্‌ তৈরী করে দিতে রাজী হয় নি।

এই জাপানীরা কোন বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করে না। নিজের মাতৃভূমির উপর কত ভক্তি, বল দেখি! তারা জুতা ব্যবহার করে না, ঐ নিজের দেশের খড়ম মেয়ে-মদ্দ সকলে ব্যবহার করে। খড়ম পায়ে দিয়ে তারা দৌড়াতে পারে, কোন অসুবিধা হয় না। তাদের খড়ম আমাদের মত নয়, অন্য রকমের। খুব পরিশ্রমী জাতি, মেয়ে-মদ্দ সকলেই কাজ করে।

চীনেরাও খুব কর্মঠ জাতি। কাজ করবে, কোন ফাঁকি দিবে না! আর, বাঙ্গালীরা ফাঁকি দিতে পারলেই বাঁচল। একটা চীনে মিস্ত্রির আর একটা বাঙ্গালী মিস্ত্রির কাজ ছ্যাখ। কত প্রভেদ! চীনে মিস্ত্রিরা যখন কাজ করবে তখন একাগ্রমনে কাজই করবে। মুখে একটি কথা নেই। আর বাঙ্গালী

মিস্ত্রিরা একাগ্রমনে কাজ করতে পারে না। একটু কাজ করছে, একটু গল্প করছে, আবার তার মধ্যে একটু একটু হাসিতামাসাও করে নিচ্ছে। কোন জাতিই একাগ্রভাবে কাজ না করতে পারলে উন্নতি করতে পারে না,— তা' যে-কোন কাজই হোক্। সকল কাজের সফলতার মূল হচ্ছে এই একাগ্রতা।

Barrade সাহেবের মত কর্মঠ লোক আমাদের দেশে না হ'লে মঙ্গল হবে না। সে একজন practical man. সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন কাজই করছে ক্ষেতে,—অবশ্য খাওয়া-দাওয়ার সময় এসে খেয়ে যায়। সে একজন শক্তিমান পুরুষ। একজন খ্রীস্টান হয়েও হিন্দুধর্মের প্রতি কি শ্রদ্ধা! সকালে-সন্ধ্যায় নিত্য বেদ পাঠ করে। তার বেদের ওপর যেমন বিশ্বাস, তেমন একজন বাঙ্গালীরও নেই।

এই যে এবার পাটের দর সস্তা,—আড়াই টাকা, তিন টাকা মণ, এতে চাষীদের দুরবস্থার একশেষ! এ সময় জমিদারগুলো কি তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছে! তারা দার্জিলিং, সিমলা, শিলং, মুসৌরী, নানা যায়গায় হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে, মোটর কিন্‌ছে, ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে! বিলাসিতা করে পয়সা নষ্ট করছে। তারা কি প্রজাদের সুখদুঃখ বুঝ্‌ছে? এ জন্যেই Zamindary system উঠে গেলে ভাল হয়,—আমেরিকার মত। দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না। ইংরেজদের পায়ে টাকা ঢালছে। রায়বাহাদুর, Sir হচ্ছে, রাজা উপাধি গ্রহণ কচ্ছে। এই Zamindary system উঠে গিয়ে যখন চাষীদের নিজেদের জমি হবে, তখন এই দেশের চাষীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। —নইলে ঐ জমিদারদের লাথি-জুতো খেয়েই জীবন যাবে।

২১ আশ্বিন, বুধবার, ১৩৩৭ সন।

রাত্রিতে আহারের পর স্বামীজী মহারাজ শঙ্করাচার্য রচিত অনেক স্তব আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "আমি যখন Entrance Class-এ পড়ি, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যাবার আগে, তখন History of India-তে শঙ্করাচার্যের বিষয় একটু পড়ি যে তিনি একজন বড় philosopher. এর আগে তাঁর বিষয়ে আমি কিছু জানতাম না। তখন হতেই আমার তাঁর মত philosopher হবার ইচ্ছা হল। এদিকে আমি ভাল drawing করতে পারতাম। আমার হাত খুব ভাল ছিল, first prize পেতাম। আমাদের

Drawing master আমাকে খুব যত্ন করতেন। তিনি আমাকে বলতেন,—'তুমি একজন বড় artist হবে!' তখন আমার মনে সংশয় উঠল, আমি artist হব, না philosopher হব! তারপর নিজের মনে অনেক চিন্তা করে স্থির সিদ্ধান্ত করলাম যে আমি philosopher-ই হব। One man cannot serve two masters. তখন হতে আমি দর্শনশাস্ত্রের বই পড়তে আরম্ভ করলাম। আমি philosopher হব,—এটা জানতে পেরে আমাদের Drawing-master আমাকে নিষেধ করতে লাগলেন,—'তুমি philosopher হোয়ো না।' তিনি আমাকে বোঝাতে লাগলেন যে philosopher-এর চেয়ে artist-ই বড়। তারপর আমাদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হল। শেষে আমি তাঁকে তর্কে হারিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠব না। আমি drawing ছেড়ে দেওয়াতে আমাদের Drawing master খুব দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমি ভেবেছিলাম, তুমি একজন বড় artist হবে।' ছেলেবেলা থেকেই আমার তর্ক করবার শক্তি ছিল। কেউ আমাকে পরাস্ত করতে পারত না। এখনও যখন যে বিষয়টি পাই, তাতেই মেতে যাই। সেই বিষয়টিরই ভাব ব্যক্ত করি। তাতে আমার মতকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না। ঐ জন্যেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, 'নরেনের নীচেই কালীর বুদ্ধি! নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, তার ব্যক্তিত্ব আছে, কালীও সেরকম মত চালাতে পারবে।'

Artist philosopher-এর চেয়ে বড় নয়; কারণ সে প্রকৃতির কার্য নিয়ে থাকে, বহির্ভাগের রূপ paint করে, কিন্তু তার মূল অনুসন্ধান করে না; প্রকৃতি কি তা-ও জানতে পারে না। Philosopher জ্ঞানী পুরুষ। সে প্রকৃতির স্বরূপ কি, তা' জানতে পারে, সকল জিনিষের মূল ধরতে পারে। Artist যা paint করে, সে তার মূল ধরতে পারে না।

৪

২২শে কার্তিক, শনিবার, ১৩৩৭ সন। দার্জিলিং।

দিবাভাগে এবং রাত্রিকালে উভয় সময়েই কাঞ্চনজঙ্ঘা উজ্জ্বলভাবে দেখা যাইতেছে। ইহাতে স্বামীজী মহারাজ মধ্যাহ্নে আহারের সময় বলিলেন,—"দ্যাখ, কাঞ্চনজঙ্ঘা কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে! Miss Blackwelder এই Darjeeling-এর দৃশ্য দেখে খুব আনন্দিত হয়েছে। বলেছিল, 'আমি এমন দৃশ্য কখনো দেখিনি!" November মাসে এমন পরিষ্কার আকাশ প্রত্যেক দিনই হবে। আমি ত' পৃথিবী ঘুরে এলাম, এমন দৃশ্য কোথাও দেখিনি।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত এই হিমালয়। Mount Everest কাঞ্চনজঙ্ঘার চেয়ে উঁচু, ২৯০০২ ফিট্। তবে এখান হতে ত' Mount Everest দেখা যায় না। কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যই সর্বদা দেখা যায়। এই সূর্যোদয় আর Mount Everest দেখতে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে লোক আসে এই Darjeeling-এ। তোদের ভাগ্য ভাল যে আজ সূর্যোদয় আর গৌরীশঙ্কর দর্শন করতে পেরেছিস। গণেশ বলে, 'গৌরীশঙ্কর দর্শন সকলের ভাগ্যে হয় না,—অদৃষ্ট!' তা ঠিক!"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন, 'তোর দার্জিলিং আসা সার্থক হয়ে গেল।'

৪ঠা কার্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

আজ আশ্রমে শ্যামাপূজা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভোগ, আরত্রিক, চণ্ডীপাঠ, কুমারী দেবীর পূজা ও সন্ন্যাস হইবে। প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠ হইল। লক্ষ্মণ মহারাজ কুমারী দেবীকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া এবং নানাবিধ দ্রব্য দিয়া তাহাকে সজ্জিত করিয়া জগন্মাতাজ্ঞানে পূজা করিলেন। পূজা সমাপনান্তে আমরা সকলে জগন্মাতারূপিনী কুমারী

দেবীর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিলাম। অতঃপর লক্ষ্মণ মহারাজ কুমারী দেবীসহ স্বামীজী মহারাজের নিকট আসিলেন এবং তাহারা স্বামীজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন।

স্বামীজী মহারাজ কুমারী দেবীকে কহিলেন, "তুমি কি বুঝতে পেরেছ যে তোমার মধ্যে মা কালী আছেন ?

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ ॥

তুমি ভাববে যে তোমার মধ্যে অনন্তরূপিনী মহাশক্তি বিরাজ করছেন আর তুমিই সকলের মধ্যে মাতৃরূপে বিরাজ করছ আর জগতের সকল জীবের মা,—জগন্মাতা। জগতের জীব সব তোমার সন্তান।"

পুনরায় স্বামীজী মহারাজ কুমারী দেবীর মাতাকে কহিলেন, "তোমরা মহামায়ার জাত ! মায়াতে সকলকে ভুলিয়ে রেখেছ ! তোমরা ইচ্ছা করলে একদিনে জগৎকে উদ্ধার করে দিতে পার।"

৪ঠা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আশ্রমে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পাহাড়ীরা স্ফূর্তির সহিত কাজ করিতেছে। তাহাতে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে প্রাতঃকালে কহিলেন,—"দ্যাখ্, কেমন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাজ কচ্ছে। দেখে শেখ্। চোদ্দ বছরের ছেলে দেড় মণ বোঝা নিয়ে যাচ্ছে ! এদের কাজ করতে কি আনন্দ। কুঁড়েমি করবে না। বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েরা কি এদের মত পরিশ্রম করতে পারবে ? বাঙ্গালীর মেয়েরা কেবল বছর বছর ছেলে বের করতে পারে। কোলে একটি ছেলে কি মেয়ে থাকা চাই। যেখানে যাবে, কোলে একটি ছেলে কি মেয়ে নিয়ে যাওয়া চাই ! কোলের ছেলে আর ঘুচবে না। পুরুষগুলো বংশবৃদ্ধি করতেই মজবুত। মহাকামুক ! জাপানী, চীনা, ইংরেজ, মার্কিন, জার্মানী প্রভৃতি জাতিরা সকলেই কাজ কচ্ছে, আর বাঙ্গালীরা চৌদ্দ পুরুষ ধরে কেরানীগিরিই করছে। আর জমিদারগুলো মোটরে হাওয়া খেয়ে ভুড়ি বাগাচ্ছে ! আরে

বাবা, গ্রামে গিয়ে লাঙ্গল ধর না। তুই কলকাতায় যেয়ে সকলকে এইসব বলবি।

এই দার্জিলিং-এর হস্তলাল গিরি একজন সামান্য চাপরাসি ছিল—sanitorium-এর। এখন সে একজন contractor হয়েছে। কত পয়সা উপার্জন করছে! এদেশ থেকে একজন আমেরিকায় New York সহরে গিয়েছিল। সে সেখানে যেয়ে খেতে পায় না। কাজের চেষ্টা কচ্ছে, কোথায় কাজ পায়। এক সাহেবের বাড়ীতে যেয়ে তাঁকে বলছে,—'আমি এখানে এসে ভারী কষ্টে পড়েছি। খেতে পাচ্ছি না! আপনি দয়া করে যদি আমার একটি কাজ জুটিয়ে দিন, তাহলে বড় ভাল হয়।'

ঐ সাহেবটি তখন বললেন, 'কাজ? কাজের অভাব কি? পরিশ্রম করতে পারলে কাজের কি অভাব আছে? আপনার সামনেই ত' কাজ পড়ে রয়েছে। এই বরফটা কেটে দিন। এখনই আপনি ten cents (সাড়ে পাঁচ আনা) উপার্জন করতে পারবেন। আমিই দেব আপনাকে।'

বাঙ্গালী জাতটা কুঁড়েমি করেই গোল্লায় গেল। সাধে কি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ সমুদ্রগর্ভে ডুবে যাক্! বাঙ্গালীর অস্তিত্ব জগৎ থেকে উঠে যাক্।'

কুলিগিরি কর্। মোট বইতে শেখ্। তাতে দু' পয়সা উপার্জন করতে পারবি, শরীরেও বল হবে। বই পড়ে পড়ে আর নোট (note) মুখস্থ করে পরীক্ষা দিয়ে তাতে লাভ কি? জীবনের কি তাতে কিছু উন্নতি হয়? এই University Education দ্বারা practical life-এর কোন উপকার হয় না। এতে মানুষের energyকে নষ্ট করে তাকে একটা 'পাশ করা মূর্খ' তৈরী করে। কুলীর কাজ করেই মানুষ বড় লোক হয়।"

৬ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন। কলিকাতা।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ লক্ষ্মণ দাদাকে তাঁহার ঘরে দেখিয়া বলিলেন, "কি লক্ষ্মণ, এসো,—এসো!'

লক্ষ্মণ দাদা কহিলেন, "আপনার পা'-তো ভাল হচ্ছে! এইবার একটু একটু বেড়ান না কেন!—এই Square-এ।"

স্বামীজী মহারাজ কহিলেন, "তুমি আমার হয়ে বেড়াও না কেন? তুমি খুব বেড়াও দিনরাত। তোমার পায়ে আমি বেড়াচ্ছি। তুমি ঘুমিও না।

তোমার যখন ঘুম পাবে তখন মনে করবে যে স্বামীজীইতো আমার হয়ে ঘুমুচ্ছেন। ভেদ বুদ্ধি করছ কেন? তুমি আর আমি তো অভেদ, এক আত্মা! আর এই পা' দুটি না-ই বা চললে। এই অনন্ত পা চল্‌ছে।

পশ্য মে পার্থ রূপানি শত-শোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন। তুমি মনে কচ্ছ, আমি কি শরীরটা! আমি অণু, পরমাণু, বিশ্বের যাবতীয় সকল পদার্থেই আত্মারূপে বিরাজ কচ্ছি, বিশ্বের প্রাণ! শ্রীশ্রীঠাকুর যা' করেন, তাই ভাল! তাঁর ইচ্ছা নয় যে আমি এখন Darjeeling যাই। আমি Darjeeling যাব, তিনি আমার যাওয়া বন্ধ করলেন। 'রোসো, তোমায় যাওয়াচ্ছি!' এই একটা অসুখ করে দিলেন। এই অসুখ হওয়াতে বেশ বিশ্রাম করতে পাচ্ছি!—আর এত লোকের টান তো। যারা আমায় দেখ্‌তে চায় তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। অসুখ না হলে কি কলকাতায় থাকতাম? দাঁত তুলতে এখানে আসলাম, দাঁত তুলে চলে যাব! চক্রীর চক্রে পড়ে এই কাণ্ড হল! এই পা' দিয়ে পৃথিবী ঘুরে এলাম, এখন পা দু'খানি বিশ্রাম করুক। ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখেন তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ। এ অবস্থা আমার কেন হল! ও অবস্থা আমার হল না কেন?—এরূপ মনে হওয়া উচিত নয়। এতে মনে অশান্তি আসে। সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকাকেই contentment বলে। তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর কর। 'তাঁর যা ইচ্ছা, তাই হবে! আমার নিজের কোন ইচ্ছা নেই।'—এরূপ জ্ঞান যার হয়েছে, সেই-ই মুক্ত-পুরুষ! সে-ই জীবনে আনন্দ পায়।"

২৭শে পৌষ, সোমবার, ১৩৩৭ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ নন্দকে কহিলেন,—"তুই যেমন আমায় সেবা করিস্ তেমনি সকলকে নারায়ণ-বুদ্ধি করে সেবা করবি। এইটি আমার কাছে শেখ্। কাউকে বিপদে পড়েছে দেখলে সেখানে যেয়ে তাঁর সেবা করবি নিঃস্বার্থভাবে। দীন-দুঃখী, আর্ত-গরীব, তাদের সেবা করবি। পরের জন্যে যে নিজের প্রাণ দিতে পারে, তার-ই তো ঈশ্বর লাভ হয়। ঈশ্বর লাভ,—এ ছাড়া আর কিছু কি!"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ খ্রীস্টান পাদরীরা কিরূপে সেবা করে, সেই

সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, "ভারতে তাদের সেবাকার্য দেখে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা ভারতের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়েছে।" এইরূপ সুখ্যাতি করিয়া স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"এরূপ বৌদ্ধ যুগে ভিক্ষুরা দেশের-দশের সেবা করত। বহুজনের সুখের জন্য, বহুজনের হিতের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করত।"

২৮শে পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

সন্ধ্যার পর সালিখা হইতে স্ত্রীভক্ত শ্রীযুক্তা চারু দেবী এবং তাহার ভাই, আর তাহার সঙ্গে তাহার পাঁচটি ছেলে স্বামীজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। স্বামীজী মহারাজ তাহাদিগকে ঘরে আসিতে আদেশ দিলেন। চারু দেবী তাহার পুত্রগণসহ স্বামীজী মহারাজের পদতলের চারিদিকে সারি সারি করিয়া মেঝেতে বসিল। স্বামীজী মহারাজ চারু দেবীর প্রত্যেকটি ছেলের নাম একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি তাহাদের সহিত হাস্যকৌতুক করিলেন।

চারু দেবী ও তাহার দাদার সহিত স্বামীজী মহারাজের অনেকক্ষণ কথোপকথন হইল। সন্ধ্যার পর স্বামীজী মহারাজকে ফল-মিষ্টি খাইতে দেওয়া হইয়াছে। তিনি ফল ও মিষ্টি, চারু দেবী, তাহার দাদা এবং তাহার ছেলেদের সকলকে একটু একটু করিয়া খাইতে দিলেন। শেষে নিজে একটু গ্রহণ করিলেন। আমাদের জন্যও একটু প্রসাদ রাখিলেন।

তিনি চারু দেবীর প্রত্যেকটি ছেলের একে একে নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাদের সহিত হাস্যকৌতুক করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "বালকরা হচ্ছে সাক্ষাৎ নারায়ণ! এদের সঙ্গে খেলা করব না তো কার সঙ্গে খেলা করব? বালকদের সরল প্রাণ, তাদের সঙ্গে আমি খেলতে ভালবাসি। দু'দিনের জন্যে জগতে এসেছি,—হেসে খেলে চলে যাব।—এর চেয়ে আনন্দ আর কি আছে!"

১লা মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সন।

জনৈক স্কুলের ছাত্রকে স্বামীজী মহারাজ উপদেশদান প্রসঙ্গে বলিলেন,— "কাম ও কাঞ্চনত্যাগী শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ গ্রহণ কর। তিনি বিবাহ করলেন, স্ত্রীকে ভোগ করলেন না। জগন্মাতা জ্ঞানে তাঁকে পূজা করলেন। এই

কামজিৎ মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠ কর, তাঁর মূর্তি ধ্যান কর। সকল স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞান করতে চেষ্টা কর।

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ।

—তা' হলে কাম রিপুকে দমন করতে পারবে। জীবনের উদ্দেশ্য কি? একটা মেয়েকে বে' করে সম্ভোগ করা! মনে খুব জোর আন্, বিচার কর্। তা' হলেই কাম রিপুকে দমন করতে পারবি।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ বুদ্ধদেবের একটি গল্প বলিলেন,—বুদ্ধের কোন একজন শিষ্যের কাম রিপু প্রবল ছিল। সে কামকে দমন করতে না পারায় মনে তার গভীর দুঃখ হত এবং একদিন বুদ্ধদেবের কাছে তার মনের অবস্থা জ্ঞাপন করলেন। বুদ্ধদেব তাকে বললেন, 'দেখ, আমারও অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। এক জন্মে আমি হিমালয়বাসী তপস্বী ছিলাম। বহুকাল তপস্যার পর একবার লোকালয়ে এসে কাশীধামে উপস্থিত হলাম। কাশীর রাজা আমাকে দেখে, তাঁর খুব ভক্তি হয়। আমাকে তিনি তাঁর রাজ্যে কিছুকাল বাস করতে বললেন। আমি সম্মত হলাম। আমার থাকবার জন্য তিনি তাঁর বাটীর নিকটেই এক উদ্যানবাটী নির্মাণ করে দেন। নিত্য রাজবাড়ীতে যেয়ে ভিক্ষা করে আসতাম। রাজাই আমায় ভিক্ষা দিতেন। কোন কার্যবশতঃ একবার রাজা অন্যস্থানে গিয়েছিলেন। সে সময় রাণীর উপর আমার পরিচর্যার ভার পড়ে। রাণী খুব পরমা সুন্দরী ছিলেন। তাঁকে দেখে আমার কামভাব হয়। কামচিন্তা আমাকে অস্থির করে তুলল। আহার-নিদ্রাহীন অবস্থায় আমি তিন দিন পড়ে রইলাম। আমার মন খুব দুর্বল হল। আমার যোগশক্তি অন্তর্হিত হল।

রাজা প্রত্যাগমন করেই, তাঁর বাড়ীতে আমার তিন দিন অনুপস্থিতির সংবাদ শুনে তিনি ছুটে এলেন আমায় দর্শন করতে। আমার এই দুর্দশা দেখে তিনি দুঃখিত হলেন। আমি তাঁর কাছে আমার মনের অবস্থা সব খুলে বললাম। অবিলম্বে আমি লোকালয় পরিত্যাগ করে পুনরায় হিমালয়ে যেয়ে তপস্যা করতে লাগলাম—বহু আয়াসে মনকে পাপচিন্তা হতে নির্মুক্ত করলাম।'

—এরূপ মনের জোর আনা সোজা কথা নয়,—বড় কঠিন। সকলেরই মনে পাপচিন্তা জাগতে পারে, আবার সকলেই চেষ্টা দ্বারা মনের পাপচিন্তাকে বিনষ্ট করতে পারে।"

২রা মাঘ, শুক্রবার, ১৩৩৭ সন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সাধু স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বামীজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন বৈকালে। স্বামীজী মহারাজ তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসধর্ম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন এবং তাঁহাদের সহিত বেদান্তের আলোচনা করিলেন। পরিশেষে স্বামীজী মহারাজ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"আজকাল যে লোকে একটু বেদান্ত চর্চা করছে, এ অতি সুলক্ষণ। বেদান্তই ভবিষ্যৎ জগতের ধর্ম হবে। একমাত্র বেদান্তই science-এর সঙ্গে harmony দেখাতে পারে, অন্য কোন ধর্ম পারে না। এইটি আমি আমার Religion of the Twentieth Century বইতে দেখিয়েছি। Original philosopher যে হবে, তার নিজের অনুভূতি হওয়া চাই। বই-পড়া philosopher-এর অনুভূতি না থাকাতে সে নিজের কোন ব্যক্তিত্ব দেখাতে পারে না। সে তার প্রাণের জোরে বলতে পারে না। তার মন সন্দেহে দোলায়মান অবস্থায় থাকে।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ শিক্ষা সম্বন্ধে বলিলেন,—"দেশ শিক্ষিত না হলে দেশ কখনও স্বাধীন হতে পারে না। কুলি, মেথর হতে সাধু—সকলকেই বিদ্যা শিক্ষা দিতে হবে। প্রত্যেককেই Reading, writing and arithmetic জানা চাই। আমেরিকাতে যে কুলি, সে-ও খবরের কাগজ পড়ে দুনিয়ার খবর জানে। আর আমরা সকলকে মূর্খ করে রেখেছি! আরে, মূর্খামি দ্বারা কি দেশোদ্ধার হয়? যারা আমাদের জন্যে দিনরাত গতর খাটিয়ে শরীরের রক্ত জল করছে, আমরা তাদের জন্যে কি কচ্ছি! এ দোষ কাদের? আমাদের না তাদের? মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক দেশোদ্ধারের জন্যে চীৎকার করলে কি দেশোদ্ধার হয়? জনসাধারণকে নিয়েই দেশ! Mass-কে শিক্ষা না দিলে দেশ কখনো উঠবে না। ও একটা বিবেকানন্দ, একটা গান্ধী, একটা দেশবন্ধুর দ্বারা কিছুই হবে না। হাজারো হাজারো বিবেকানন্দ, গান্ধী, দেশবন্ধু চাই।

Primary education সকলকেই দিতে হবে,—compulsory. Burmaতে primary education-এর চল বেশী। প্রত্যেক গ্রামেই বৌদ্ধ মঠ আছে। সেখানেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে পড়ে school-এ ফুঙ্গিদের কাছে। ফুঙ্গিরাই শিক্ষা দেয়।

আর B.A., M.A. পাশ করবার কোন প্রয়োজন নেই। ইংরেজী

রাজভাষা Matric পর্যন্ত পড়লেই যথেষ্ট। তারপর সংস্কৃত, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি যার যেমন taste সে তেমন শিক্ষা করুক। যদি ইচ্ছা হয় Tailoring, Carpentary, Mechanical, Chemical Works শিক্ষা করুক।

এরূপ শিক্ষা প্রণালী হলে দেশের উন্নতি হবে। Russia-তে যে কৃষক, সে-ও লেখাপড়া জানে। Russia-র খুব উন্নতি হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Russia গিয়েছিলেন। তিনি Russia-র দেশোন্নতি দেখে অবাক্ হয়েছেন। তিনি লিখেছিলেন যে, "আমার মনে হয় আমাদের দেশের ছেলেরা একবার Russia বেড়িয়ে যাক্, তাহলে তারা বুঝতে পারবে কি করে দেশকে শিক্ষিত করতে হয়।"

৭ই মাঘ, বুধবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজের সহিত দীক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তার পর সেবক-শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কাছে যে যে দীক্ষা গ্রহণ করে তাদের ভার আপনি গ্রহণ করেন তো?

স্বামীজী মহারাজ—"তাদের ভার আমি কেন গ্রহণ করব? শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরই তাদের আত্মসমর্পণ করিয়ে দিই। তিনিই তাদের পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা। এইটি জানিয়ে দিই। আমি কে? আমি কারো গুরু নই। উপলক্ষ। গুরু তিনিই। তবে এ শরীরকে যে চালাচ্ছে, তিনি রামকৃষ্ণ। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, "মা কালী! তিনিই দীক্ষা দেন! আমি ত মরে গিয়েছি। আমার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছায় মিশিয়ে দিয়েছি। আমার নিজের কোন নিজত্ব নেই। আমার অহংকে পুড়িয়ে দিয়েছি। তবে আমি কি করে দীক্ষা দিই? যাদের অহং আছে, তারাই নিজেকে গুরু মনে করে। নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু! আমি নয়, আমি নয়,—তুমিই সব।"

সেবক-শিষ্য—"যারা দীক্ষা গ্রহণ করে, তাদের জন্য তো আপনাকে কল্যাণ কামনা করতে হয়!"

স্বামীজী মহারাজ—"আমি কেন কল্যাণ কামনা করব? শ্রীশ্রীঠাকুরই তাদের মঙ্গল করবেন; তিনি মঙ্গলময়। আমি কি লোকের রোগ আরোগ্য করার জন্যে, ছেলে হওয়ার জন্যে, দুঃখকষ্ট দূর করবার জন্যে ভগবানের কাছে কামনা করব? তা' কেন? মুক্ত আত্মার কি কোন কামনা থাকে? আমার

কোন কামনা নেই। সকলের জন্যই আমি মঙ্গল চিন্তা করি। সকলের মঙ্গল হোক্।

Good will, এ কামনাকে কামনা বলে না। তবে আমার কাছে যদি কেউ এসে আমার আশীর্বাদ চায়, একান্তই নাছোড়বান্দা হয়, তাকে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় আশীর্বাদ করি। তার যদি ভাল হয় ত' ভালই! না হল ত, না-ই হল। এই আর কি! যে তাঁর শরণাগত হবে, তাকেই তিনি শান্তি দেন, আর তিনি ত সকলকেই শান্তি দিচ্ছেন!

৮ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সন। কলিকাতা।

স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে হাসিয়া কহিলেন, "তুই বুঝি সকলকে প্রসাদ দিয়ে বশ করিস্?"

শিষ্য হাসিতে লাগিল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল, "Barrad সাহেব আমাকে বলেছিলেন, 'মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাকে কিছুই দেওয়া যায় না; কিন্তু মানুষ যখন জীবিত থাকে, তখন তার সঙ্গে কেউ সাক্ষাৎ করতে গেলে তাকে কি দেওয়া যায়? এক, মিষ্ট বাক্যদান, আর বাহ্যিক সাধ্যমত কিছু খাইয়ে দিতে হয়।' এই উপদেশটি আমি তার কাছ থেকে শিক্ষা করেছি।"

স্বামীজী মহারাজ পুনরায় কহিলেন,—"শ্রীশ্রীঠাকুরও সকলকে মিষ্টমুখ করিয়ে দিতেন। তাঁর কাছে কেউ আস্‌লে তিনি মিষ্টমুখ না করিয়ে ছাড়তেন না। আমরাও তাই করি।"

৯ই মাঘ, শুক্রবার, ১৩৩৭ সন। কলিকাতা।

মঠ ও মিশন সম্বন্ধে কথাবার্তা হইবার পর স্বামীজী মহারাজ লক্ষ্মণদাদাকে কহিলেন,—"শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীকে একভাবে গড়েছিলেন। আমাকে তিনি আরেক ভাবে গড়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ কখনও স্বামী অভেদানন্দ হতে পারে না, আবার আমিও বিবেকানন্দ হতে পারি না। বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ অভেদানন্দ। এতে বড়-ছোটর কি আছে!"

১৪ই কার্তিক, শুক্রবার, ১৩৩৭ সন।

সুরেন দাদা তীর্থ-পর্যটনে বাহির হইবেন, উহাতে স্বামীজী মহারাজ তাহাকে বলিলেন,—"গুরুর পাদপদ্মেই সকল তীর্থ বিরাজ করছে।—আবার

তীর্থে যাবে কি? গুরুর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করবি! এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে? তোর এখানে কোন কাজ করতে হবে না! তোর কাজ আমরা করব। তুই দিনরাত ধ্যান কর। সন্ন্যাসী হয়েছিস্, কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবি? এখানেই বসে তপস্যা কর, আমি দেখি। নাম তো নিয়েছিস চিদ্রূপানন্দ! নামের সার্থকতা দেখা। চিদানন্দরূপের আর চিদ্রূপানন্দের অর্থ একই, কোন প্রভেদ নেই। খাওয়া-ঘুমানো বাদ দিয়ে তিন দিন ঐ ঘরে বসে দিনরাত "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্ শিবোঽহম" এই আওড়া আর ধ্যান কর। তাহলে তিনদিনের মধ্যেই তুই সিদ্ধপুরুষ হয়ে যাবি। আমাদের মধ্যে যদি একজন সিদ্ধ হতে পারে, তা' আমাদের ভাবনা কি? মহাসৌভাগ্য!"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ একটি গল্প বলিলেন, "হৃষিকেশে একজন সাধু, সে জঙ্গলে গিয়েছিল, বাহ্যি করতে বসেছে, এমন সময় এক বাঘ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। বাঘ মুখে করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তখনও সে আনন্দ সহকারে নির্ভিক চিত্তে বল্‌ছে,—"চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।" এইত সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা। তোর এরকম মনের জোর আছে?

৩১শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৩৭ সন। দার্জিলিং।

আজ স্বামীজী মহারাজের শুভ জন্মতিথি। তিনি প্রাতঃকালে ভুবন দাদাকে বলিলেন,—"আজ রবিকে পেট ভরে খাওয়াবি। ও যা খেতে চায়, তাই খাওয়াবি। আজ আমি কল্পতরু।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—"কি খাবি, বল।"

সেবক-শিষ্য কোন উত্তর দিল না, কেবল হাসিতে লাগিল।

প্রাতঃকালে সাড়ে আট ঘটিকায় স্বামীজী মহারাজকে বাল্যভোগ দেওয়া হইল। তাঁহার ভোজন করিবার টেবিলের উপর পাঁচ পাউণ্ড ওজনের একটা বড় cake এবং নানাবিধ ফল ও মিষ্টি দেওয়া হইয়াছে। আশ্রমে তখন যে যে ছিলেন, সকলেই স্বামীজী মহারাজের টেবিলের সম্মুখে সারি সারি করিয়া বসিলেন। তিনি একটুখানি cake ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইলেন, তারপর সকলকে এক এক piece করিয়া কাটিয়া দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "ওদের দেশে মহাপুরুষের জন্মোৎসবের দিন একটা মস্ত বড় cake-এ মহাপুরুষের যত বয়স ততগুলো মোমবাতি বসিয়ে দেয়।"

স্বামীজী মহারাজের ফল ও মিষ্টি প্রসাদ সেবক-শিষ্য সকলকে দিলেন। নগেন দাদা আসিয়া স্বামীজী মহারাজকে কোকো দিলেন এবং পরে অন্যান্য সকলকেও পরিবেশন করিলেন।

তারপর স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া কহিলেন,—"আজ আমি কল্পতরু। আমার কাছে যে যা খেতে চাইবে, আমি তাকে তাই খেতে দেব,—শূয়োর, গরু, ঘোড়া, মোষ, মুরগী—যে মাংসই হোক্ তাই খাওয়াবো ;—অবশ্য দার্জিলিং সহরে যা পাওয়া যাবে।"

অমূল্যবাবুর ছেলে রবি কহিল,—"আমি চিংড়ি মাছের কাটলেট খাব।"

স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—"ওকে চিংড়ি মাছের কাটলেট দিস্ তো!"

সতু কহিল,—"আমি cake খাব।"

দ্বিজু কহিল,—"আমি cake খাব।"

স্বামীজী মহারাজ বার বার তাহাদিগকে cake দিতে লাগিলেন। অমূল্যবাবু তাহার পুত্রদের ব্যাপার দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, ভোগ ও আরত্রিক হইবার পর মহিলা ভক্তগণ এবং পুরুষ ভক্তগণ সকলেই স্বামীজী মহারাজের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। তিনি সকলকে আশীর্বাদ করিলেন,—"তোমাদের ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান হোক,—শান্তিতে থাক।"

১লা ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৩৭ সন।

রাত্রিতে আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"ভাল-মন্দ, good and evil হচ্ছে টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। ভাল মন্দের সহিত জড়িত আবার মন্দও ভালর সঙ্গে জড়িত। একটাকে গ্রহণ করলে অপরটাকেও গ্রহণ করতে হয়। ঈশ্বরের কাছে ভাল-মন্দ কিছুই নেই।"

তারপর তিনি আরও অনেক কথাবার্তার পর পুনরায় কহিলেন, "জগতে সবই ভাল।—এ ভাল আপেক্ষিক ভালমন্দের পারে,—absolute good,—ব্রহ্ম! তাতে সুখ নেই, দুঃখ নেই, পুণ্যও নেই, পাপও নেই।

ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন পুণ্যং ন পাপং,—কেবল চৈতন্য আর আনন্দ,—সচ্চিদানন্দ।

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবের একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন,—

"জগদ্‌যোনিরযোনিস্ত্বং জগদন্তো নিরন্তকঃ।
জগদাদিরনাদিস্ত্বং জগদীশো নিরীশ্বরঃ॥

—তুমি জগতের যোনি (উৎপত্তি স্থান) হয়েও অযোনি, তুমিই জগতের অন্ত, তোমার অন্ত নেই। তুমিই জগতের আদি, তোমার আদি নেই। তুমিই জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তোমার কেউ ঈশ্বর নেই,—অর্থাৎ তোমার প্রভু তুমিই।"

তারপর স্বামীজী মহারাজ পুনরায় কহিলেন,—"এর চেয়ে ভগবানের সুন্দর স্তব আর কি থাকতে পারে!"

২৭শে মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন। কলিকাতা।

শিশির দাদার অসুখ। তিনি Medical College Hospital-এ ছিলেন। সেখানকার ডাক্তাররা তাহার রোগ নির্ণয় করিতে পারে নাই। তিনি সেখান হইতে ছুটি লইয়াছেন,—বায়ু পরিবর্তনে যাইবেন। স্বামীজী মহারাজের প্রসাদ গ্রহণ করা অবধি তাহার শরীর একটু ভাল বোধ হইতেছে এবং বহু দিন যাবৎ তিনি স্বামীজী মহারাজকে দর্শন করেন নাই বলিয়া তাহার মনও উতলা হইয়াছে। সেইজন্য স্বামীজী মহারাজকে তিনি দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

স্বামীজী মহারাজ তাহার শরীরের বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "Be your own doctor, তুমিই তোমার নিজের চিকিৎসক হও।"

কিছুদিন বাদে শিশির দাদা বারাণসীধামে যাইয়া স্বামীজী মহারাজকে পত্র লিখিয়াছেন,—"আশ্চর্য এই, লোকে বিদ্যার বড়াই করে, কিন্তু শরীরের বিষয় fundamental principles কিছুই জানে না। আমার ডাক্তারদের উপর বিশ্বাস ছিল,—এখন নাই। তাই "Be your own doctor",—আপনার একথা আমার খুব ভাল লাগিয়াছে। এখন হইতে আপনার মত muscles of iron and frames of steel তৈরী করিব। গুরুর মত শরীর যদি অন্ততঃ কতকটাও না হয়, তবে তাঁর সামান্য ভাব কেমন করিয়া হজম করিব? এবার হইতে স্বাস্থ্য যেন অটুট থাকে, তাহার চেষ্টা করিব। আপনার সেই

দিনকার কথায় আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। "Be your own doctor," —শরীরকে Temple of God করিবার আর কোন উপায় নাই।"

২৯শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজ সরোজকে অনেক উপদেশ দিয়া কহিলেন,—"স্বামীজী ওকালতি পড়ছিলেন, উকিল হবেন! শ্রীশ্রীঠাকুর তা শুনে তাকে বললেন,— "তুই যদি উকিল হোস্, তাহলে তোর হাতে জল খেতে পারব না।" —এই কথা তিনি এমন ভাবে বললেন যে স্বামীজীর হৃদয়ে আঘাত করল। স্বামীজী ভাবলেন,—তাইতো! আর তিনি ওকালতি পরীক্ষা দিলেন না, উকিল হলেন না। ছাখ্, স্বামীজী কেমন শিষ্য ছিলেন। এক কথায় গুরুর আজ্ঞা পালন করলেন।"

৪ঠা ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৩৭ সন। কলিকাতা।

সেবক-শিষ্য শিবরাত্রির উপবাস করিয়াছেন। রাত্রির চারি প্রহরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালেও শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিয়াছেন। তারপর স্বামীজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে তিনি পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। স্বামীজী মহারাজ শিষ্যকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে দেখিয়া তাঁহাকে হাসিয়া কহিলেন,—"বেশ, বেশ! মনের আনন্দ হোক্। আমি আশীর্বাদ করছি! ঈশ্বর-দর্শন হোক্, জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য হোক্। পাকা বৈরাগ্য হোক্!"

সেবক-শিষ্য এইরূপ আশীর্বাদ শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমার শিবরাত্রির উপবাস করা সার্থক হইল।"

৮ই ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে কমলবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী স্বামীজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কমলবাবুর রাজযোগ ও হঠযোগ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন ছিল, তাহা তিনি স্বামীজী মহারাজের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। স্বামীজী মহারাজ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহার সন্দেহ দূর করিলেন।

অতঃপর কমলবাবুর স্ত্রী স্বামীজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়?"

স্বামীজী মহারাজ,—"ইষ্ট ধরতে হয়। ইষ্টের ধ্যান করতে হয়। ইষ্ট আর আত্মা এক। আর মনের বাসনা নষ্ট করতে হয়। মনই জগৎ সৃষ্টি করেছে কিনা! এই জগৎ কোনদিন ছিলও না, কোনদিন থাকবেও না। আপনি কে,—চিনেছেন কি? নিজের স্বরূপ জানতে পেরেছেন কি? এই পঞ্চভূতের শরীর আছে বলেই এই পঞ্চভৌতিক জগৎ দেখতে পাচ্ছেন।"

কমলবাবুর স্ত্রী—"আচ্ছা, যাঁরা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁরা 'ব্রহ্ম কি' বলতে পারেন?"

স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া কহিলেন,—"বোবার রসগোল্লা খাওয়া! ব্রহ্ম কি তা' বলতে গেলেই দ্বৈতভাব আসল;—ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে।

উচ্ছিষ্টং সর্বশাস্ত্রানি সর্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণোজ্ঞানম্ অব্যক্তং চেতনাময়ম্।

—সমস্ত শাস্ত্র উচ্ছিষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা উচ্ছিষ্ট হয় না; কেননা, তা' তো মুখে ব্যক্ত করা যায় না কিনা! আপনি সন্দেশ খেলেন; যদি জিজ্ঞেস করা যায়, 'কেমন সন্দেশ?'—আপনি বলবেন,—'বেশ, মিষ্টি।' —আর বেশী কি কিছু বলতে পারবেন? মিষ্টের স্বাদ কি মুখে বলা যায়?"

কমলবাবুর স্ত্রী—"স্বামী বিবেকানন্দ একজন মস্ত বড় পুরুষ ছিলেন। এত কম বয়সে দেহত্যাগ করলেন কেন? তিনি জীবিত থাকলে দেশের অনেক কল্যাণ হত তো?"

স্বামীজী মহারাজ—"তিনি বলেছিলেন, 'আমি যা' জগতকে দিয়ে গেলাম, তা' বুঝতে ঢের দিন লাগবে।' বাস্তবিকই তাঁর ভাব দিন দিন একটু একটু লোকে বুঝতে পাচ্ছে। যত দিন যাবে ততই লোকে ক্রমশঃ তাঁর ভাব বুঝতে পারবে। তিনি New York-এ আমায় বলেছিলেন,—'আমি এত বড় হয়েছি, এ ক্ষুদ্র শরীর আমায় ধারণ করতে পারছে না। আমি শীগ্‌গীরই দেহত্যাগ করব। —বুদ্ধদেব আশী বৎসর জীবিত ছিলেন, শঙ্করাচার্য বত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। যত দিনের জন্য মহাপুরুষরা শরীর ধারণ করেন তত দিনই জগতে কর্ম করেন; তারপর শরীর ত্যাগ করে স্বধামে চলে যান। তাঁদের নির্দিষ্ট সময় আছে, নির্দিষ্ট সময়ের বেশী দিন জগতে থাকতে পারেন না।

বুদ্ধদেবের যখন আশী বৎসর বয়স হল, তখন মার এসে জিজ্ঞেস করল,

'আপনি আর কতদিন জগতে থাকবেন? আপনার সময় হয়ে গিয়েছে। এবার এ পৃথিবী ত্যাগ করে স্বধামে চলে যান।

শ্রীরামচন্দ্রেরও যখন সময় হল, তিনিও এই পৃথিবী ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। মহাকাল এসে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। একে একে চার ভাই,—প্রথমে লক্ষ্মণ, পরে রাম, ভরত, শত্রুঘ্ন এ মায়ার শরীর ধরাধামে বিসর্জন করে গোলোকে আবার শ্রীনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হলেন।

কমলবাবুর স্ত্রী—"শ্রীরাম, লক্ষ্মণ,—তাঁরা কি ছিলেন?"

স্বামীজী মহারাজ—"Perfect soul."

কমলবাবুর স্ত্রী—"রামায়ণের সবই কি সত্য?"

স্বামীজী মহারাজ—"সত্য আছে বই কি? তা' হতে মূল সত্য গ্রহণ করতে হবে।"

কমলবাবুর স্ত্রী—"এই পরমহংসদেব কি ছিলেন?"

স্বামীজী মহারাজ—"মুক্ত পুরুষ।"

কমলবাবুর স্ত্রী—"তা'হলে তিনি ব্রহ্মে লীন হয়েছেন? আর জগতে আসবেন না? তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হবে না?"

স্বামীজী মহারাজ—"ব্রহ্মে লীন হন নি,—এক অবস্থায় আছেন। জগতের কল্যাণের জন্য দেহ ধারণ করেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার মুক্তি নাই। ঐ উত্তর-পশ্চিম দিক দেখিয়ে বলতেন, "আমাকে আবার আসতে হবে।"

তিনি যখন আসবেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরাও আসবে; যেমন সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে, পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্র ঘোরে আর অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ থাকে, সেরূপ। তিনি এখনও আছেন সূক্ষ্মশরীরে। এই সব ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তেরা রামকৃষ্ণলোকে যাবে, বুদ্ধের ভক্তেরা তাঁর কাছে থাকবে বুদ্ধলোকে, যীশুর ভক্তেরা যীশুর কাছে যাবে। গন্ধর্বলোক, দেবলোক—সবই আছে। নরকও আছে,—মহা-অন্ধকারময়। যারা ঘোর বিষয়াসক্ত, পাপী, তারাই মৃত্যুর পরে অন্ধকারে যায়, মহাদুঃখ আর অশান্তি ভোগ করে। যারা পুণ্যাত্মা, তারা মৃত্যুর পরেও মহানন্দে থাকে; তাদের হৃদয় হতে জ্যোতি বের হয়। তারা যেখানে যায় সেখানে আলোয় আলোময় হয়, জ্যোতিস্বরূপ!"

কমলবাবুর স্ত্রী—"এই সব লোক কি সত্য?"

স্বামীজী মহারাজ—"হাঁ, সবই সত্য। ব্যুত্থান অবস্থায় তিনি বলেছিলেন,

'সচ্চিদানন্দ বৃক্ষে দেখলাম থোলো থোলো কৃষ্ণ-বুদ্ধ-যীশু ঝুলছে। তাঁর দুটি একটি জগতে এসেছে।' তিনি নিজ মুখেই বলেছিলেন,—'পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ হয়েছিলেন, তিনিই এ শরীরে রামকৃষ্ণরূপে এসেছেন।' শ্রীশ্রীঠাকুর বাংলাদেশে কেন অবতীর্ণ হয়েছিলেন, জানেন? —বাঙ্গালীই হচ্ছে ভারতের মাথা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নাস্তিক্যের আবরণে তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল। তাদের শিক্ষা দিতেই শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাংলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর ভাব প্রচারের জন্য স্বামীজীর মত উপযুক্ত শিষ্যও পেয়েছিলেন। ভারতে বাঙ্গালীর মত ত্যাগী কোন জাতি নেই, বুদ্ধির হিসেবেও বাঙ্গালীর বুদ্ধির কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। এই বাঙ্গালীরাই এক সময় তিব্বতে, চীনে, জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছে। এই অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। ঢাকায় বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ষাট বৎসর বয়সে তিনি হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে যান। তিনি সেখানে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর অনেক বইও আছে। তের বৎসর জীবিত ছিলেন তিনি তিব্বতে। লাসার কাছে সে-থান মঠে দেহত্যাগ করেন। তিব্বতের লামারা সকলেই তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। বুদ্ধদেবের নীচে বোধিসত্ত্ব বলে তাঁর মূর্তি পূজা করে।

এই পাটনার কাছে Nalanda Universityর Principal শীলভদ্র। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল গৌড়ে। শান্ত রক্ষিত, তাঁর বাড়ী ছিল যশোরে। তিনি রাজপুত্র ছিলেন। খুব তপস্বী সাধু ছিলেন। লামারা 'আচার্য বোধিসত্ত্ব' উপাধি দিয়েছিলেন তাঁকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীশ্রীঠাকুর আবির্ভূত হয়ে সমস্ত ধর্মমত সাধন করে সর্বধর্ম সমন্বয় করে বললেন, 'যত মত তত পথ।' আর তাঁর জীবন হচ্ছে গীতা। তিনি এ যুগের নেতা। অদ্ভুত ত্যাগ আর সত্যে নিষ্ঠা দেখিয়ে গেলেন তিনি। ধর্মেতিহাসে এ নতুন। তিনি যা শিক্ষা দিয়ে গেলেন, তাই এ যুগের আদর্শ। তাঁর শরণাগত হোন, কল্যাণ হবে।"

কমলবাবুর স্ত্রী—"পরমহংসদেব কি যোগ শিক্ষা দিতেন?"

স্বামীজী মহারাজ—"তিনি বলতেন, 'কলিযুগে ভক্তির পথই সহজ-সরল। একে অন্নচিন্তা, তাতে ম্যালেরিয়া রোগে পেট টিন্‌-টিনে, অল্পায়ু; তাতে কি

জ্ঞান চর্চা করা যায় ? উদ্দেশ্য সকল যোগেরই এক। যে পথেই যাক্, এক জায়গায় পৌছাবে।"

কমলবাবুর স্ত্রী—"কালী, দুর্গা,—এসব কি সত্য ?"

স্বামীজী মহারাজ—"হ্যাঁ, সত্য ! শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ পাথরের মূর্তির সঙ্গে কথা কইতেন। কোন কাজ করতে হলেই মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করতেন, 'মা, এ কাজটি করবো ?' এই আদেশ নিতেন। মা যদি আদেশ দিতেন, তা'হলে তিনি করতেন। ঐ পাথরের মূর্তির নাক দিয়ে নিশ্বাস বইতো !"

কমলবাবুর স্ত্রী—"মুক্তি কি ?"

স্বামীজী মহারাজ—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

—শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।" —এই 'আমি'টাকে লোপ পাইয়ে দিতে হবে।"

কমলবাবুর স্ত্রী—"একটা কথা জিজ্ঞেস করি। মাছ-মাংস খাওয়া কি ভাল ?"

স্বামীজী মহারাজ—"না। মাছমাংস খেলে কাম-ক্রোধাদি বৃদ্ধি হয়। তবে সকলের পক্ষে তো এক নিয়ম খাটে না ! কারো গোমাংসই সাত্ত্বিক আহার। এসব নিজের উপর নির্ভর করে। যার যে জিনিষ খেলে শরীর-মন ভাল থাকে,—সে তা'ই খাবে। তার তা'ই সাত্ত্বিক আহার। শ্রীকৃষ্ণতো মোষের মাংস খেতেন। আর বুদ্ধদেবতো নিরামিষ খেতেন। শূয়োরের মাংস খেয়েই রক্ত-আমাশয় রোগে ভুগে দেহত্যাগ করলেন তিনি। সকলেরই কি হজম করবার শক্তি থাকে ? ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি !"

কমলবাবুর স্ত্রী—"স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কি ?"

স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া কহিলেন, "কেউ কারো স্বামী নয়, কেউ কারো স্ত্রী নয়। আপনারা একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে নিয়েছেন। এই ত ? পরজন্মে আপনার স্বামী আপনার স্ত্রীও হতে পারেন, আপনি তাঁর স্বামীও হতে পারেন ! There is no marriage in the Heaven. স্বর্গে বিবাহ হয় না। একমাত্র আত্মাই আত্মার স্বামী।"

৫

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

—স্বামী অভেদানন্দ

আজ ভারতের সর্বত্র এবং য়ুরোপ ও আমেরিকায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ৯২তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। নিম্নে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি বলিয়া দেশের সর্বত্র পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার আদর্শ চরিত্র ও ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বের ফলে তাঁহার প্রবর্তিত আধ্যাত্মিক আন্দোলন আজ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আমেরিকা পর্যন্ত গিয়া পৌছিয়াছে। আজ শ্রীরামকৃষ্ণকে সকল শ্রেণীর হিন্দুরা আদর্শ অবতার ও ভগবানের অংশ বলিয়া পূজা করিতেছেন। তাঁহার জীবন এমন অদ্ভুত ও অদ্বিতীয় ছিল যে, তাঁহার ইহলোক ত্যাগের প্রায় ১০ বৎসরের মধ্যে ভারতের সকল শ্রেণীর লোক এবং ইংরাজ ও জার্মান পণ্ডিতগণ পর্যন্ত তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া মান্য করিতেছেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে "ইম্পিরিয়াল এণ্ড কোয়াটার্লী রিভিউ"-এর জানুয়ারী সংখ্যায় সর্বপ্রথম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ও লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান হাউসের লাইব্রেরীয়ান অধ্যাপক টনী উহা লিখিয়াছিলেন। তাহার পর ঐ খৃষ্টাব্দেই "নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরী" পত্রিকার আগষ্ট সংখ্যায় অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ঠাকুরের অপর একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ঠাকুরের সম্বন্ধে একখানি সুদীর্ঘ জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ সকল পুস্তক লইয়া সে সময় পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়াছিল।

পরলোকগত অধ্যাপক মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের অকৃত্রিমতা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন।

ভগবান রামকৃষ্ণ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই, অথবা কোন ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মপ্রচারকের নিকট হইতেও জ্ঞানার্জন করেন নাই; তাঁহার জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, সমগ্র জ্ঞান ও বুদ্ধির চিরন্তন উৎসের নিকট হইতে। তিনি কোন দেশের কোন ধর্মপ্রচারকের অবলম্বিত পথে অগ্রসর হইয়া সকল ধর্মের আদর্শ লাভ করেন নাই, তাঁহার পথ আদি। ভগবান রামকৃষ্ণের উপদেশাবলীতে যে উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাব নিহিত, তাহা দেখিয়া পরলোকগত অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার বিস্মিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভগবান রামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশাবলী তথাকথিত ধর্ম-জগতের সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতায় কুঠারাঘাত করিয়াছে।

জগতের বিভিন্ন জাতি-ধর্মের রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ দ্বারা প্রতি ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ লাভ করিয়া, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মানবসমাজকে তাঁহার অর্জিত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা প্রদান করেন। তাঁহার প্রদত্ত প্রত্যেক ভাবটি নূতন, মনুষ্যবুদ্ধি-ফল দ্বারা কলুষিত নহে। বাল্যকাল হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার জীবনের প্রত্যেক পর্যায় অলৌকিক। প্রত্যেক পর্যায়ে যেন নূতন ধর্মগ্রন্থের এক একটি অধ্যায় খুলিয়া যায়, সে ধর্মগ্রন্থ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনকে উপযুক্ত এবং বিংশ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করিবার জন্যই যেন অদৃশ্য হস্ত দ্বারা বিশেষভাবে লিখিত।

আদর্শ দেহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা পবিত্র, সরল ও ঐশ্বরিক চরিত্র আমরা কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই। তিনি পবিত্রতা ও ধর্মের মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ। তাঁহার জীবন ত্যাগের জীবন, আর্থিক সুখৈশ্বর্যের প্রতি তিনি কখনও ভ্রূক্ষেপও করেন নাই।

তিনি একমাত্র সুখ অনুভব করিতেন, তাঁহার সমাধি অবস্থায় যখন তাঁহার আত্মা পার্থিব দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ঊর্ধ্বে অনন্তের অসীম স্থানে উত্থানপূর্বক চিরশান্তির আলয়ে প্রবেশ করিত। তিনি তাঁহার পার্থিব দেহপিঞ্জর হইতে আত্মাকে ইচ্ছামত পৃথক করিতে পারিতেন। তিনি কখনও পার্থিব সম্বন্ধ মানিতেন না,—ভগবানই ছিলেন তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী এবং সর্বস্ব।

ভগবান রামকৃষ্ণ শিখাইয়াছেন যে, নারী পৃথিবীতে শক্তির প্রতিনিধি।

তিনি ভগবানকে বিশ্বজননীস্বরূপে পূজা করিতেন এবং তাঁহাকে তাঁহার ঈশ্বরী জননীর প্রতিনিধি বিবেচনা করিতেন। তাঁহার এক পত্নী ছিলেন, তিনি সকল সময়েই তাঁহার প্রতি ভক্তিপূর্ণ আচরণ করিতেন। তিনি তাঁহার পত্নী ভগবতী সারদা দেবীর সহিত বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত কখনও সহবাস করেন নাই।

পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভগবান রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ পবিত্র ও তাঁহার বিশ্বজননীর ক্রটীহীন সন্তান ছিলেন। তিনি তাঁহার গুরুকে নারী আকারে গ্রহণ করিয়া, নারীত্বের আদর্শকে আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নীত করিয়াছিলেন। মানবের আর কোন মুক্তিদাতা বা আধ্যাত্মিক নেতা ধর্মের ইতিহাসে নারীত্বকে এত সম্মান প্রদান করেন নাই।

৬

১১ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজ মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া অবশেষে বলিলেন, "মহাত্মা গান্ধীকে ইংরেজরা বিপ্লববাদী মনে করে, ভাল চোখে দেখে না। বলে, 'গান্ধী নিজে গরীবের চেয়েও গরীব সেজে দেশের সাধারণ লোকের হৃদয় জয় করেছে।"

সেবক-শিষ্য—সমবেদনা না জানালে কি কারো হৃদয় জয় করা যায়? তিনি সমবেদনা দেখিয়েছেন। দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন। নিজেকেও দরিদ্র ভাইদের একজন মনে করেছেন! তাই তিনি আজ সকলের হৃদয় জয় করতে পেরেছেন। ওরা তো ভাল চোখে দেখ্‌বেই না! তিনি ওদের মহাশত্রু। চোর-ডাকাতের চেয়েও মহাদোষী যে রাজদ্রোহী! ওরা না-ই বা মানলে! জগতের অন্যান্য জাতিরা-তো তাঁকে জগতের একজন মহৎ মানুষ বলে সম্মান কচ্ছে। তাঁর সরলতা, সত্যনিষ্ঠা আর অনাড়ম্বর জীবন দেখে জগতের সকল লোকই তাঁকে সাক্ষাৎ দেবতা মনে কচ্ছে। ওরা-তো নিন্দা করবেই! জরাসন্ধ, শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতেন, আবার ঋষিরা তাঁকে পূর্ণাবতার জেনে তাঁর ধ্যান-পূজা করতেন।"

স্বামীজী মহারাজ—"তা ঠিক।"

একদিন স্বামীজী মহারাজ দেশের অবস্থার কথা কহিয়া অবশেষে বলিলেন, "এরা অহিংসা-পথ অবলম্বন করেছে; এদের উপর কি-না অত্যাচার! এই সব নিরীহদের উপর কত অত্যাচার! ভগবান্ দেখেও দেখছেন না! তিনি কি ঘুমিয়ে আছেন? যদি জেগে থাকতেন, তা'হলে নিশ্চয়ই তিনি দেখতেন। ভগবান-টগবান নাই বাবা! কি অত্যাচার! এরা কি মানুষ, না পশু?

যীশুখ্রীস্টের পূজা করছে! তিনি জগতে অশান্তি প্রচার করতে আসেন নি! তিনি এসেছিলেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। শয়তানই হচ্ছে ওদের উপাস্য দেবতা। ওরা শয়তানের উপাসক! এমনি করে রাজ্যশাসন করলে শয়তানের বাচ্চারা কয়দিন রাজ্য চালনা করবে? নিশ্চয়ই ওদের আসন টলেছে! তা' না-হলে কি এমন অত্যাচার করে? ভগবান্ যখন মারবেন তখন একেবারেই মারবেন। তাঁর মার দুনিয়ার বার, বাবা! চালাকি নয়!

১৯শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ জনৈক ভক্তের বিষয়ে কয়েকটি কথা কহিলেন। তাহা শুনিয়া সেবক-শিষ্য বলিলেন, "ধর্মের পথ অতি কঠিন, বরাবর সমানভাবে চলা কঠিন। জোয়ারের মত কখন মনকে ধর্মপথে এগিয়ে নিয়ে চলে, আবার ভাটা পড়ার মত মন ইন্দ্রিয়ের পথে চলতে থাকে। এ সময় যে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারে, সে-ই টিকে থাকতে পারে। আর, এই কাম-ক্রোধ ইন্দ্রিয়াদি সততই মনেতে আস্‌ছে! এদের সব সময় বশীভূত রাখা বড় কঠিন।"

স্বামীজী মহারাজ – তা' ঠিক! বরাবর সমানভাবে চলা কঠিন! তা' কি সহজে হয় রে! সাধু-সন্ন্যাসীদের আরও বেশী প্রলোভনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কাম-ক্রোধ তো আসবেই! তা' না হলে তো তুই দেয়াল হয়ে গেলি! দেয়ালের কি কাম-ভাব হয়? কামক্রোধ নিয়েই-তো এই শরীর। কামক্রোধ মনে উঠবেই। তাদের দমন করে রাখাই তো মনুষ্যত্ব। কিছু ভোগ করবার ইচ্ছে হল, ক্রোধ হল, তাকে দমন করে রাখ্‌বি। খুব বিচার চাই। বিচার করতে করতে তবে ঠিক ঠিক জ্ঞান হবে। বড় শক্ত!

১৪ই আষাঢ়, রবিবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজ চট্টগ্রামের ডাঃ যতীন্দ্রনাথ আইচকে এক পত্রে লিখিলেন, —"সংসারের নিয়মই এই যে, জন্মালেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তবে আগে অথবা পরে! সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা! এ বিষয়ে অপর কাহারও হাত নাই। সকলেই আপন আপন কর্মানুযায়ী জন্মগ্রহণ করিয়া কর্মফল ভোগ করিয়া চলিয়া যায়। তোমার দাদাকে এক্ষণে উপদেশ দিলে কোন পরিবর্তন হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তাহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে বলিতেছি। সকল অবস্থায় তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এইরূপে যেন সে সর্বদা প্রার্থনা করে।"

১৩ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৩৭ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু কহিয়া বলিলেন,—"বোম্বেতে পাঁচ হাজারের চেয়েও বেশী ছাত্রের সম্মুখে মতিলাল নেহরু ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন!—বলেছেন, "Don't learn history, but make it. Solve freedom problem, leave mathematics alone. তোমরা দেশের জন্যে প্রাণ দাও। এই সুযোগ ছেড়ো না। এই সুযোগ ছেড়ে দিলে চিরদিন দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) ইউরোপের ছাত্ররা তাদের University পরিত্যাগ করে। তারা তাদের পড়াশুনা আর পরীক্ষা ত্যাগ করে স্ব স্ব মাতৃভূমির গৌরব রক্ষা করবার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিল। আজ ভারতও এ ছাড়া অন্য কিছু আশা করে না।

ইংরেজরা যখন মেয়েদের সম্মান নষ্ট করেছে, তাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার করেছে,—এতে বোঝা যায়, ভারতে আর ইংরেজের শাসন বেশীদিন নেই,—শেষ হয়ে এসেছে।"

মতিলাল নেহরু সত্যিই খুব তেজস্বী লোক।"

২৪শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ কতিপয় ভক্তের কথা কহিয়া অবশেষে বলিলেন, "ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য সহজে কি হয় রে? অত সোজা নয়! সন্ন্যাসীর হচ্ছে শেষ জন্ম! একটু ভোগবাসনার ইচ্ছা থাকলে সে সন্ন্যাসী হতে পারে না! সকল রকমের ভোগ হলে তবে সে সন্ন্যাসী হতে পারে। তাইতো শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন,—'ঘুঁটি সব ঘর ঘুরলে তবে পাকা হয়।"

"...কর্মফল সকলকেই ভুগতে হবে। ও আশীর্বাদ-টাশীর্বাদে কিছু হয় না।"

মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া স্বামীজী মহারাজ কহিলেন, "মেয়েরা হচ্ছে ধর্মপ্রাণা! সব দেশের মেয়েরাই ধর্মপ্রাণা। আমেরিকায় মেয়েরাইতো রামকৃষ্ণ মিশনকে বাঁচিয়ে রেখেছে!"

শ্রীশ্রীমায়ের একটি ফটো দেখিয়া স্বামীজী মহারাজ কহিলেন, "এ ফটো ভাল হয়নি। মায়ের বৃদ্ধ বয়সের ফটো public-কে দেখানো ঠিক নয়। দেবতার হচ্ছে চিরযৌবন।"

…"যে ব্যাটার গান শুনলে ধ্যানের ব্যাঘাত হয়,—ধ্যান হয় না, সে ব্যাটার কোনকালেই ধ্যান হয় না, জানবি! ঠাকুরেরতো গান শুনলে সমাধি হতো!"

৪ঠা শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৩৭ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ প্রার্থনার বিষয় কহিতে কহিতে বলিলেন, "মানুষ আট-ঘাট বেঁধে প্রার্থনা করতে পারে না। একদিক দেখেই প্রার্থনা করে। হয়ত ভগবানের কাছে একটি পুত্রসন্তান চাইলে! একটি পুত্রসন্তান পেল; কিন্তু সেই পুত্রটি অন্ধ বা খোঁড়া বা চিররোগী বা অসচ্চরিত্রও হতে পারে! ভালই যে হবে, তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই! অসুরেরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বর পেল যে, তাদের কেউ বিনাশ করতে পারবে না। ভগবানও তাদের মনোমত বর প্রদান করলেন। কিন্তু আবার ভগবানই নিজ হস্তে তাদেরকে কৌশলে বিনাশ করলেন। মানুষতো আর সর্বজ্ঞ নয়! তার কতটুকুই বা দৃষ্টিশক্তি! মানুষের মনে যখন যে কামনা ওঠে, তা-ই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। পরিণামে যে কি হবে, তা' তো চিন্তা করতে পারে না। শেষে কর্মফল ভোগ করতে হয়।

"উল্টো সমঝ লিয়ে রাম" একটা গল্প আছে; বল্ছি, শোন্!—একজন বৃদ্ধ। সে ভিক্ষা করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। তার বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্রাদি ছিল। সে তার গ্রামের কাছাকাছি গ্রামগুলোতে ভিক্ষা পেত না বলে দূর দূর গ্রামে ভিক্ষা করতে যেত। এতে তার কষ্টবোধ হত বলে সে রামচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেছিল,—'হে রাম, তুমি যদি আমাকে একটা ঘোড়া জুটিয়ে দাও, তা'হলে ভাল হয়। আমি এখন বুড়ো হয়েছি। হেঁটে হেঁটে ভিক্ষে করতে আমার কষ্ট হয়।"

সে রামের ভক্ত ছিল। কিছুদিন পরে সে এক মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল; এমন সময় সেই রাস্তা দিয়ে অনেক সৈন্য যাচ্ছিল। তাদের একটি ঘোড়ী সেই পথের মধ্যেই একটা বাচ্চা প্রসব করল। তখন সেই বাচ্চাটাকে কাঁধে বহন করে কে নিয়ে যাবে, সৈন্যেরা তা ভাবছিল। এমন সময় তারা বৃদ্ধকে সেই পথে দেখতে পেয়ে বলল, 'তুমি এই বাচ্চাটাকে কাঁধে করে আমাদের সঙ্গে চল। আমরা তোমাকে কিছু বখশিস্ দেবো।' বৃদ্ধ রাজী হয়ে বলল, 'আচ্ছা!'

তখন সেই বাচ্চাটাকে কাঁধে নিয়ে যেতে যেতে বৃদ্ধ মনে মনে বলতে লাগল, 'কোথায় আমি ঘোড়ায় চড়ব, না ঘোড়া-ই আমার কাঁধে চড়ে যাচ্ছে!'

তখন সে বলতে লাগল, "উল্টো সমঝ লিয়ে রাম। হে রাম, তুমি উল্টো বুঝেছ!—হে রাম, তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ করেছ, কিন্তু আমার মনের ভাব বুঝতে পার নি। উল্টো বুঝেছ। উল্টো সমঝ লিয়ে রাম।"

৯ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ মেয়েরা যে দেশের কাজে নামিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বলিলেন, "মেয়েরাই দেশ উদ্ধার করবে। তারাই স্বরাজ আনবে। এ আমি আগাগোড়া বলে আস্‌ছি। তাঁরা জগৎ প্রসবিনী মহামায়ার জাত। পুরুষকে প্রসব করেছে। চণ্ডীতে দেবীসূক্তে আছে,—'আমিই জগৎ-পিতাকে প্রসব করেছি। আমি আদ্যাশক্তি।' মেয়েদের শক্তির কাছে কি পুরুষের শক্তি! তারা মহামায়ার অংশ। মেয়েদের শিক্ষা দিলে পুরুষেরা কোন বিষয়েই তাদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌বে না। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের বুদ্ধি বেশী। মেয়েদের মাথায় যে ভাব ঢুকিয়ে দেবে, সেই ভাব নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করবে তার সফলতার জন্যে। কখনও হটবে না! নিরুৎসাহী, উদ্যমহীনা হবে না। মেয়েরা হচ্ছে রণরঙ্গিণী। এই রাশিয়াতে যুদ্ধের সময় সব যুবতী মেয়েরা পুরুষের সাজে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে গেল। তাদের Regiment-এর নাম Death Regiment. তারা মৃত্যুর জন্যে আগেই প্রস্তুত,—যুদ্ধে প্রাণ দেবে। পুরুষেরাতো পুরুষ নয়,—কাপুরুষ! সব দেশেরই।

৬ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজ ভুবন দাদাকে কহিলেন,—"যত বিষয়-বৈভব হবে, ততই spirituality-র থেকে নেমে যেতে হবে, ধর্মভাব কমে যাবে। তখন মন বিষয় রক্ষা করতে ব্যস্ত থাকে, পাছে কেউ আমার বিষয় ঠকিয়ে গ্রহণ করে। বিষয়ে মন গেলে ভগবানকে ভুলে যেতে হয়। দুঃখকষ্ট মানুষকে ভগবানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এজন্যেই কুন্তী দেবী প্রার্থনা করতেন,—'হে ঠাকুর, আমায় দুঃখ দাও।' তোরা যত বিলাসী আর ভোগী হবি, ততই তোদের ধর্মভাব কমে যাবে।"

৮ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজ রাত্রিতে নানা বিষয়ে কথাবার্তা কহিয়া শেষে স্থরেন দাদাকে কহিলেন,"দুনিয়াতো সব ঘুরে দেখে এলাম। সকল দেশের লোকেরই প্রবৃত্তি এক। তা সাদা চামড়াই হোক, আর কাল চামড়াই হোক। সকল মানুষের মনের প্রবৃত্তি এক। কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী হতে King the George Emperor পর্যন্ত সকলেই এই আহার, নিদ্রা আর বংশবৃদ্ধি নিয়ে ব্যস্ত আছে। এই জগৎটা হচ্ছে প্রলোভনময়। এই প্রলোভনের মধ্যে থেকে যে নিজেকে বাঁচিয়ে উপরে উঠতে পেরেছে, সে-ই জগতে প্রকৃত মানুষ। সেই মানুষকেই আমরা মহাপুরুষ বলে থাকি। এ অতি বিরল।

১০ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ দেশের অবস্থার বিষয় অনেক কিছু কহিয়া কহিলেন, আমাদের দেশে এখন শক্তির পূজো করতে হবে। শক্তির আরাধনা করে, মহাশক্তি লাভ করে ইংরেজকে সেই শক্তির খেলা দেখাতে হবে। এখন চাই শক্তির খেলা। তা' না হলে ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, তারা যেমন তপস্যা করে মহাশক্তি লাভ করেছিল, আমাদেরও তাই করতে হবে। অর্জুন যেমন হিমালয়ে তপস্যা করে কিরাতরূপী মহাদেবের কাছে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছিল।

সেই যুগে তারা পেরেছিল, আর আমরা তাদের মত হয়ে এ যুগে পারব না কেন? তারা যদি পেরে থাকে, আমরাও অবশ্যই পারব। তা' না হলে জানব সব মিথ্যা। সেই যুগে যদি হয়ে থাকে তবে এই যুগেও হওয়া সম্ভব। তা' যদি সম্ভব না হয় মহাভারত, পুরাণ মিথ্যা।

মহাত্মা গান্ধী জেলে রয়েছে, কিন্তু এমন দেখান চাই যে তিনি সব জায়গায় বক্তৃতা করছেন, একই সময়ে বোম্বে, বেনারসে, আমেদাবাদে। লোকে দেখবে যে তিনি procession-এর আগে আগে যাচ্ছেন। আরুইনের ঘরে যেয়ে বলবেন, 'আরুইন, তুমি এই কর, আমি command কচ্ছি।' অমনি আবার অদৃশ্য হয়ে যাবেন, অথচ তার ঘর বন্ধ আছে। তা' হলে স্তম্ভিত হয়ে যাবে। এই শক্তি দেখাতে হবে। এই দেশ উদ্ধার হওয়া,—যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয়, তা' হলে তিনি নিশ্চয় দৈবশক্তিসম্পন্ন লোক পাঠাবেন। Joan of Arc যেমন দেশোদ্ধার করেছিল। ষোল বছরের ছুঁড়ি। সে Church-এ প্রার্থনা

করতে গিয়েছিল। দৈববাণী হল, 'তোমায় দেশোদ্ধার করতে হবে।' সে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখে ভয়ে মূর্ছিত হল। পরে বলল, 'আমি একটি সামান্য মেয়ে! আমার দ্বারা কি এ মহৎ কাজ হতে পারে?—আমার কোন তলোয়ার নেই; অস্ত্র নেই।" সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার দ্বারাই দেশোদ্ধার হবে। যাও ঐ বেদীর নীচে তলোয়ার আছে। সেই তলোয়ার নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে যুদ্ধ কর।' মেয়েটি অবশ্য যুদ্ধ করে জয়লাভ করল। দেশোদ্ধার হল। কিন্তু পাদরীদের ষড়যন্ত্রে দেশের লোকই তাকে মেরে ফেললে। পুড়িয়ে মারলে ডাইনী,—witch মনে করে। বললে, 'এ শয়তানী এ দেশকে ধ্বংস করতে এসেছে,—দেশের মহাশত্রু! সে অম্লানবদনে যীশুখ্রীস্টের মত জীবন দান করলে। বললে, 'আমার কিছু বলবার নেই। আমার যা কাজ, তা' শেষ হয়েছে। তোমরা যা খুসী তাই কর।"

ভগবান কল্কি অবতার হয়ে অবতীর্ণ হবেন,—তা এ সময়ে চলে আসুন। শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে, তলোয়ার হাতে করে ম্লেচ্ছ বধ করুন। ইংরেজরা গুলি-বোমা দিয়ে যেই মারতে যাবে, অমনি শূন্যে মিলিয়ে যাবেন। পাহাড়ের মতো একটা পর্দা পড়ে যাবে। উল্টে সেই গুলি-বোমা তাদের গায়ে যেয়ে লাগবে। এই রকম দৈবশক্তি এখন চাই! যিনি এরকম শক্তি দেখাতে পারবেন, তাঁকেই হিন্দু-মুসলমান সকলেই সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করবে। আমাদের দেশে এখন চাই শিবাজী, নেপোলিয়নের মত লোক!

দেখছিস্, আমার দেশোদ্ধারের কল্পনা! এখন হাসব, কি কাঁদব!...... তবে এরকম করতে করতে ক্রমে ক্রমে দেশের উন্নতি হবে। আমরাই আমাদের শত্রু কিনা! বাইরের শত্রু বিনাশ করা সোজা, কিন্তু ঘরের শত্রু বিনাশ করা কঠিন।·····এখনও অনেক ধাক্কা খেতে হবে। এই ধাক্কা খেতে খেতে যদি পঞ্চাশ বৎসর পরে হয়!

১২ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৩৭ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ আহারের সময় স্বামী বিবেকানন্দের দেশপ্রেম সম্বন্ধে কহিলেন, "স্বামীজীর আগে তত দেশপ্রেম ছিল না। আমেরিকায় যেয়ে তাঁর দেশপ্রেম হল। সেই দেশ দেখে তাঁর চোখ ঝল্‌সে গেল, আক্কেল গুড়ুম হল,—বাবা! তিনি ভাবলেন, আমাদের দেশ কোথায় নরকে পড়ে রয়েছে! আমরা কূপমণ্ডুকের মত দেখ্‌ছি, সারা দুনিয়াটা যেন বাংলা দেশ! ওদের

দেশপ্রীতি দেখে, জাতীয় সঙ্গীত শুনে,—My country is thee, ইত্যাদি। দেশই সর্বস্ব! দেশের জন্য প্রাণ দেবো। আমার দেশ,—আমার দেশের মত দেশ নেই। এই সব দেখে-শুনে তিনি অবাক্ হলেন। তাই থেকেই ওর দেশপ্রেম জেগে উঠল। আমরাতো ওর সঙ্গ করেছি,—সব জানি তো! ওদের দোষটা বাদ দিয়ে গুণটা নিয়ে এদেশে এসে তিনি প্রচার করতে লাগলেন। লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতাম, তিনি গান গাইতেন,—

তোমার সব কলে বলে চলে,
কল দিয়ে সব ঘুচালে!

কল-কারখানা দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন! ভাবলেন, মানুষের বুদ্ধিতে কি না হয়!

দ্বিতীয়বার স্বামী বিবেকানন্দ যখন New York যান, তখন আমায় বলেছিলেন,—"ছাখ্, কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত কি reception দিয়েছে! আমায় কি সম্মান করেছে! দেশটা মেতে গিয়েছিল! আমায় তখন ইংরেজ ব্যাটারা কেন জেলে দিলে না! তা'হলে সমস্ত দেশটা ক্ষেপে যেত! দেশটা উদ্ধার হত! স্বরাজ আসত।"

স্বামীজীর মধ্যে অবশ্য এই সব ভাব ছিল। আমেরিকায় না গেলে তিনি কিছুই বুঝতে পারতেন না!

আমেরিকায় খ্রীস্টান মিশনারীরা স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করত,—"তোমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ, কলেরা, প্লেগ হয়; সেখানে হাজার হাজার লোক অন্নাভাবে কত কষ্ট ভোগ করে প্রাণত্যাগ করে; তাদের জন্যে তোমরা কি কর?" কেবল খ্রীস্টান মিশনারীরাই নানাভাবে তাদের সাহায্য করে থাকে,—তাদের অন্ন-বস্ত্র দেয়, রোগে ঔষুধ দেয়, বিদ্যা শিক্ষা দেয় আবার হাসপাতালও করে দেয়। স্বামীজী কোন যুক্তিযুক্ত জবাব দিতে পারতেন না। প্রাণে খুব দুঃখ বোধ করতেন। ভাবতেন,—'তাইতো! হিন্দুরা এই সব দীন-দুঃখী-আর্তদের জন্যে কোন সহানুভূতি দেখায় না!' তাই এদেশে এসে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন।

নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা!—জীবে দয়া,—'দয়া' শব্দে উঁচু-নীচু ভাব আনয়ন করে আর আশ্রিত, করুণাপ্রার্থী, এরূপ ভাব প্রকাশ পায়। দীনহীনকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা বা সেবা করা!

স্বামীজী এই নূতন ভাব প্রচার করলেন। অবশ্য এই ভাব শ্রীশ্রীঠাকুরের

মধ্যেই ছিল। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরেরই ভাব প্রচার করলেন। দরিদ্রের দুঃখে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণ কাঁদত। মথুরবাবুর সঙ্গে কাশী যাবার সময় দেওঘরে বৈদ্যনাথ দর্শন করবার জন্য কিছুদিন সেখানে ছিলেন। একদিন তিনি নিকটবর্তী গ্রামের দরিদ্র স্ত্রীপুরুষের কষ্ট দেখে কাঁদতে কাঁদতে মথুরবাবুকে বললেন,—"মথুর, এইসব দরিদ্রনারায়ণ! এদের মাথায় তেল নেই, পরিধানে কাপড় নেই, পেটে অন্ন নেই।—এদের দুঃখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! মা তোমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন। তুমি এই দরিদ্রনারায়ণদের সেবা কর। এদের তেল দাও, কাপড় দাও, ভাল করে খাওয়াও; তবে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।" মথুরবাবু ভক্ত ছিলেন; তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের আজ্ঞা শিরোধার্য করে সেই সব দরিদ্র নারায়ণদের সেবা করলেন।

১১ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৩৭ সন।

সন্ধ্যার সময় স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ক্লাসে যোগের বিভূতির কথা বলিতে বলিতে কহিলেন,—"আমাদের দেশে যেমন যোগীরা যোগের বিভূতি দেখাতে পারেন, তা' অন্যান্য দেশেও মহাপুরুষেরা পারেন। এই গ্রীসদেশে, যীশুখ্রীস্টের বহু পূর্বে Apolinses of Tiana নামে একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ফকিরের মত জীবন যাপন করতেন। তিনি মুখ দিয়ে যা' বলতেন, তাই হত। ······একটি লোক মরে গিয়েছে। তাকে খাটে করে অনেকে মিলে নিয়ে যাচ্ছিল গোর দিতে! কেউ কেউ ক্রন্দনও করছিল। তিনিও সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখতে পেয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের কি হয়েছে! তোমরা ঐ লোকটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?' তারা বলল, 'এর মৃত্যু হয়েছে। একে গোর দিতে নিয়ে যাচ্ছি।' তখন তিনি বললেন, 'সে কি! এর তো মৃত্যু হয়নি!' তারা বলল,—'না মশাই, ডাক্তাররা পর্যন্ত বলেছে, 'এর মৃত্যু হয়েছে।' তখন Apolinus তার নাম জিজ্ঞেস করে নিয়ে, তার নাম ধরে তিনবার ডাকলেন; বললেন,— 'ওঠ, তুই ঘুমিয়ে রয়েছিস্ কেন?' তার নাম ধরে তিনবার ডাকতেই সে উঠে বসল। তখন তারা সকলে অবাক্ হয়ে গেল। তারা সকলে তাঁর চরণতলে লুটিয়ে পড়ল আর বলল, 'আপনি কে? আমাদের কাছে আপনার পরিচয় দিন।"

যীশুখ্রীস্টের জীবনেও এমন দেখা যায়। লেজারাস্ নামে এক ইহুদীর

মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবিত করেছিলেন যীশু। এরূপ ঘটনা খ্রীস্টানদের বাইবেলে আছে।

শঙ্করাচার্যও মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করে তাঁকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সন্দীপনী মুনির পুত্রদের, আরও বহু মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করেছিলেন।

সকল জাতির সকলেরই এ শক্তি লাভ হতে পারে। এ-তো কারও একচেটিয়া নয়! মুসলমানদের মধ্যে সুফী সম্প্রদায় আছে। তারা গোঁড়া দ্বৈতবাদী নয়। তাদের বেদান্তের ভাব, অদ্বৈতবাদী। তারা বলে, "অনল্ হক্।"—মানে,—"আমিই সেই, অহং ব্রহ্মোঽস্মি।" এই সুফী সম্প্রদায়ে সমাচতপরেজ নামে একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি ফকিরের মত জীবন অতিবাহিত করতেন, গাছতলায় থাকতেন, লোকে যে যা দিত, তাই আহার করতেন আর সর্বদাই "অনল্ হক্",—"আমিই সেই, আমিই সেই" উচ্চারণ করতেন। গোঁড়া দ্বৈতবাদী মৌলভীরা তাঁকে দেখতে পারত না। তাদের শত্রু ছিলেন তিনি! পরেতো মেরেই ফেলে তাঁকে। দ্বৈতবাদী মৌলভীরা মনে করে, একি আস্পর্ধা! আল্লার সঙ্গে সমান ভাব!

একবার দিল্লীর বাদশার ছেলের অসুখ হয়েছিল। মরণাপন্ন! একমাত্র পুত্র। কোন ডাক্তার কবিরাজ, হেকিম তাঁর পুত্রের অসুখ সারাতে পারল না। মৌলভীরা সমাচতপরেজকে মেরে ফেলবে, এই ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা বাদশাকে বলল,—"এক গাছতলায় সমাচতপরেজ নামে এক ফকির আছে। তাকে যদি আপনি আন্‌তে পারেন, তাহলে সে আপনার পুত্রের অসুখ সারিয়ে দিতে পারে।"

বাদশা বললেন, "আচ্ছা, তা' বেশ। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাঁকে নিয়ে আসুক।" তারপর বাদশার লোক সমাচতপরেজের কাছে এসে সমস্ত বিষয় খুলে বললে। তিনি তো সবই বুঝতে পেরেছেন মৌলভীদের ষড়যন্ত্র! তিনি ঈষৎ একটু হাসলেন। তারপর বাদশার লোককে তিনি বললেন, "আমি যাব, চল।"

দিল্লীতে বাদশার বাড়ীতে আসলেন। সেখানে গোঁড়া মৌলভীরা উপস্থিত ছিলেন। তারা তাঁকে অভিবাদন করলেন। সমাচতপরেজ বাদশার পুত্রের কাছে যেয়ে বললেন,—"নামে বলছি, তুমি সেরে ওঠ।" এরূপ তিনবার বললেন। তাতে কোন ফল হল না। তারপর তিনি বললেন, "আমি বলছি,

তুমি ওঠ, অসুখ সেরে যাক্।" এরূপ তিনবার বলতেই বাদশার ছেলের অসুখ সেরে গেল, রোগ আরোগ্য হল। আল্লার ইচ্ছা আর তাঁর ইচ্ছা এক করা হয়েছে কি-না! অভেদ-বুদ্ধি হয়েছে কি-না! আল্লার সঙ্গে অভেদ ভাবেই এই কথা বলেছেন।

এই রকম যোগীরা মুখ দিয়ে যা বলে থাকেন, তা-ই ফলে যায়!

তারপর মৌলভীরা বাদশাকে বললেন, "সে আল্লাকে মান্য করে না। আল্লার থেকে নিজেকে বড় মনে করে; কাফের! তাকে শাস্তি দিন।" বাদশা আদেশ করলেন তাঁকে মেরে ফেলতে আর তাঁর গায়ের ছাল তুলে ফেলতে।

তারপর সমাচতপরেজ নিজেই নিজের গায়ের ছাল তুলে ফেললেন আর 'অনল্ হক্, অনল্ হক্,—আমিই সেই, আমিই সেই' বলতে বলতে দেহত্যাগ করলেন। এই সমাচতপরেজের ভাল ভাল দোঁহা আছে, তুলসীদাসের মত, ফারসী ভাষায়।"

…"সন্ন্যাসীর কোন পূজার অধিকার নেই,—এক গুরু পূজা আর তাঁর ধ্যান করতে পারে। সর্বদাই আত্মচিন্তা করবে, বিচার করবে,—আমি দেহ নই, মন নই, ইন্দ্রিয় নই, বুদ্ধি নই, চিত্ত নই, অহঙ্কার নই! আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ আত্মা! ব্রহ্মচিন্তা করতে করতে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যাবে।"

…"গৌরপাদের শিষ্য গোবিন্দপাদ, গোবিন্দপাদের শিষ্য শঙ্করাচার্য। তিনি গৌরপাদকে গুরুর মত মান্যভক্তি করতেন। গুরুর গুরু পরমগুরু, তাঁর পূজা করা যায়।"

১৩ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

আলু, কফি, বীট, গাজর, বেগুন, টমেটো, কোয়াস, ভুট্টা প্রভৃতি কিরূপে উৎপাদন করিতে হয়, ধান, পাট ইত্যাদি কোন্ জমিতে চাষ করিলে ভাল হয় এবং কোন্ সার কোন্ জমিতে দেওয়া আবশ্যক, সেই সম্বন্ধে অনেক কিছু স্বামীজী মহারাজ মধ্যাহ্ন আহারের সময় বলিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি আমেরিকায় কৃষিকার্য শিক্ষা করি। ঐ কালিদাসের (স্বামীজী মহারাজের আমেরিকান শিষ্য) বাপ আর অন্যান্য সকলের কাছ থেকে দুই তিন বছরের মধ্যে শিক্ষা করে নিই। পরে আমি বার বছর এ কাজ চালাই। চিরদিনই কি এ কাজ করতে হবে! কৃষিকার্যের

বিষয়ের অনেক বই এখনও পড়ি। এই রকম এক একটা বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে সেটা শিক্ষা করে নিয়ে ছেড়ে দিতাম। এখন আর কিছু জানবার ইচ্ছা নেই। ঠাকুরের কাছে আসার আগে আমার জানবার ইচ্ছাটা খুব ছিল। তা' ঠাকুরের ইচ্ছায় সব জেনে নিয়েছি! তিনি কৃপা করে সব জানিয়ে দিয়েছেন! এখন আর কোন বিষয়ে সংশয় নেই। সংশয় মিটে গ্যাছে। এদেশে এসেছিলাম বড় আশা করে। ইচ্ছে ছিল, আমাদের দেশে agriculture farm করব, দেশের যুবকদের শিক্ষা দেব। তা' successful হল না। কেউ একটু যায়গাই দিলে না! কোন scope-ই পেলাম না। ওদেশে একটু যায়গা চাইতেই লোকে আন্তরিকতার সঙ্গে দিয়ে দিত। ছাখ্, ওদের প্রাণ কত বড়, কত উদার! ওরা গুণের আদর করে। ওদেশে পঁচিশ বছর কাটিয়ে এলাম, এদেশ থেকে এক পয়সাও নিই নি! ওরাই খাইয়েছে, পড়িয়েছে, আবার যত্ন করে খরচ দিয়ে এদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে! রাজার হালে রেখেছিল। আবার এখনও যাবার জন্মে চিঠি লিখ্ছে, ডাকছে। কোন জাতের গুণ না থাকলে কি জগতে শ্রেষ্ঠ হতে পারে? তুলনা করে ছাখ্, আমাদের দেশ এখন কত নীচে পড়ে গিয়েছে! তা' না হ'লে কি তোরা ইংরেজের গোলাম হয়ে রয়েছিস্? আজ প্রায় ১৭৫ বছর তারা তোদের মাথায় লাথি মারছে! তবুও আমাদের দেশের কেরাণী, পুলিশ, C. I. D., ম্যাজিস্ট্রেট, জজ বেটাদের চৈতন্য হচ্ছে না। মাগ-ছেলেদের ভরণপোষণের জন্মে কাজ ছাড়তে পারছে না। আরে, না খেয়ে মরে যা না! গান্ধী, মতিলাল নেহরু, জহরলাল নেহরু, সুভাষ বসু, জে. এম. সেনগুপ্ত, এঁরা কি জীবনে টাকা উপার্জন করতে পারত না! দেখেও শিখ্তে পারছে না! ভগবান দুঃখ দিচ্ছেন। এতেও এদের চৈতন্য হচ্ছে না! তাঁর ইচ্ছে নয়, এদেশ উদ্ধার হয়! মা-বোন আর ভাইদের ওপর অন্যায় অত্যাচার করছে, তবুও এদের শাসননীতি বুঝতে পারছে না, এ সম্পূর্ণ অরাজক। আবার আমাদের দেশের লোকেই তো বিচার করছে, পুলিশগুলোইতো অত্যাচার করছে। এদের কি হৃদয় আছে? এরা মানুষ নামধারী পশু। ওরা কি এদেশের উন্নতি করতে এসেছে? এক তিলও এ দেশের কল্যাণ কামনা করে না। সব শোষণ করে নিয়ে যেতে পারলেই হল! এ দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, তা' কি ওরা চিন্তা,—একবারও চিন্তা করে? সোনার ভারতকে শ্মশানে পরিণত কচ্ছে! যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রক্তকে জল করে, পরিশ্রম করে কাজ করে,

হায়, তাদের পেটে অন্ন নেই, পরনে কাপড় নেই, ম্যালেরিয়া রোগে জরাজীর্ণ হয়েছে! তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে যারা, তাদেরই আমাদের দেশের লোক support করছে। অন্য দেশ হলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এদের তাড়াতো। এইতো দেশের দুরবস্থা! জানিনা, ভগবান কবে এ দেশ উদ্ধার করবেন!"

১৭ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩৭ সন।

মধ্যাহ্নে আহারের পর স্বামীজী মহারাজ গান গাহিতে লাগিলেন,—

"তোর মুখ দেখে কি হয় না লো ভয়,
কোন্ গুণে 'মা' বলে তোরে।
মায়ের কি ধার ধরিস্ বেটী,
মা বলাস্ তুই গায়ের জোরে ॥
তুই কি বেটী মায়ের মতন,
মা'র মত কি জানিস্ যতন?
বল্ আবাগী কাঁদায় কে এমন?
পা চেপে তুই মারছিস্ পতি,
মত্ত মাগী নেশার ঘোরে ॥
তোর আঁধার বরণ, বসন দশদিশি,
কবে কার তুই হলি হিতৈষী,
তোর বরণ ছটায় পালিয়ে যায় নিশি,
ওলো সর্বনাশী!
রাক্ষসী তুই ক্ষিদের চোটে
সৃষ্টি রাখিস্ উদরে ॥"

অতঃপর বলিলেন, "এরকম গান কেউ রচনা করতে পারেনি। কি জোরের সঙ্গে বলছেন! এ হচ্ছে বীরভাবের স্তব, গালাগালি তো দিচ্ছে না! গিরিশবাবু যখন এই গানটি প্রথম রচনা করেছিলেন, তখন আমরা সকলে বরানগর মঠে গাইতাম। এই গানটি শরৎ মহারাজের জীবনীতে আছে। তিনি "ডাকাতে কালীর" সামনে গেয়েছিলেন। আমিও সেই "ডাকাতে কালীর" মূর্তি দেখেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেশ হতে জয়রামবাটীতে যেতে পথে এক গ্রামে এই "ডাকাতে কালীর" মন্দির পড়ে। কি ভীষণ মূর্তি! দেখ্‌লে ভয় হয়।

আমাদের ঐ গ্রামের লোক বললে, 'আগে এখানে নরবলি হত।' এখান থেকেই হেঁটে ভাগলপুর হয়ে কাশী, লক্ষ্মৌ, হরিদ্বার, হৃষীকেশ যাই। সঙ্গে তুলসী মহারাজ ছিলেন। পরে ১৮৮৯ সালে গঙ্গোত্রীতে তিন মাস থেকে যমুনোত্রী দর্শন করে পুনরায় হৃষীকেশে এসেছিলাম।"

২০শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ আহারের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া শেষে বলিলেন,—"যে আত্মার সন্ধান পেয়েছে, ত্রিগুণের পারে চলে গিয়েছে,— নিস্ত্রৈগুণ্যে, তাঁকে কি কোন খাদ্য অপবিত্র করতে পারে? আত্মা কি খায়? নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ আত্মাকে কোন খাদ্য অপবিত্র করতে পারে না। দেহই খায়। আত্মাতো দেহ নয়। তবে সাধকাবস্থায় শুদ্ধ আহার করতে হয়। কেননা, আহারশুদ্ধি হলেই সত্ত্ব-শুদ্ধি জন্মে, সত্ত্ব-শুদ্ধি হলে নিশ্চিত স্মৃতি লাভ হয়। স্মৃতি লাভ হলে মুক্তি খুব সুলভ হয়ে থাকে।"

১৮ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ বলিলেন, "আরবদেশে পূর্বে নবগ্রহের পূজা হত। তারপর মহম্মদ এসে প্রচার করলেন, ও-সব উপদেবতার পূজা করে কি হবে? এক আল্লার ভজনা কর। এক আল্লাই সত্য। মহম্মদের শিষ্যেরা তাঁকে খুব ভক্তি করত, তাঁর কুলকুচো করা জল পর্যন্ত খেত।"

২২শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সন।

জনৈক ভক্ত শেষ বয়সে কাশীধামে বাস করিবে এবং তাহার ধারণা যে তাহার মৃত্যু হইলে সে শিবলোকে যাইবে। তাহাতে স্বামীজী মহারাজ কহিলেন, "মনেতেই স্বর্গ-নরক কিনা! মনেতেই সংসার। 'আমি', 'আমার' জ্ঞান করাতেই মানুষ সংসারে আসক্ত হয়। 'অহং' না থাকলেই সংসার থাকে না! 'মন চলে তো কাঠোরা মে গঙ্গা হ্যায়'। মন সৃষ্টিকর্তা। মনই পুরুষ। মনই জগৎ সৃষ্টি করছে কিনা! মন যা করে তাই আমাদের করা হয়। শরীর তো জড়। ভগবান কারো পুণ্যও নেন না, কারো পাপও গ্রহণ করেন না। কাউকে শাস্তিও দেন না, কাউকে শাস্তিও দেন না। মানুষ তার কর্মের ফলাফল ভোগ করে। অজ্ঞানেতেই মানুষ দুঃখকষ্ট ভোগ করে, তা' তো খতিয়ে দেখে না।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥"

২৪শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৭১ সন।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্ণরানাং।
জ্ঞানং হি বিশেষো পশুমানবানাং জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥

—এই শ্লোকটি জীবনে স্মরণ করে রাখ্‌বি, নিজের মধ্যে বিচার করে দেখ্‌বি। আহার-নিদ্রা-ভয় আর বংশবৃদ্ধি নিয়েই মানুষ ব্যস্ত। নানা দেশ ঘুরে দেখ্‌লি তো! কয়জন জ্ঞানী পেলি? জ্ঞানহীন ব্যক্তি পশুর সমান। পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ কি? মানুষের জ্ঞান আছে বলেই। আহারে সংযম হওয়া চাই। যারা হোৎকা হোৎকা,—খাওয়ার লোভ আছে, ঘি খাবে অনেকখানি, তাদের কামভাবতো হবেই! মাগী ত ধরবেই। তা' না হলে মর্দী রাখবে কোথায়?

শরীরকে নীরস করতে হবে,—শুষ্ক। কঠোরতা করে! তবে তো তপস্বীর শরীর হবে! আমরা করেছি। একবেলা খাবে। একাহারী সদা সুখী। পরিব্রাজক অবস্থায় একবার আহার করতাম। রাত্রিতে কে আর মাধুকরী দিত! যখন ঠাকুরের কাছে ছিলাম, ঐ রামলালদা, মা কালীর ভোগের একখানি লুচি আর সামান্য একটু মিষ্টি দিত। তাই আহার করতাম। রাত্রিতে ধ্যান করতাম। ঠাকুর বলতেন, "দিনের বেলা বারুদ-ঠাসা খাবি।" ঠাকুরও ঐ মায়ের প্রসাদী একখানি লুচি খেতেন রাত্রিতে, তবে ওঁর জন্যে একটু সুজির পায়েস হত। দিনের বেলায় একটু ভাত খেতেন। এই তাঁর খাওয়া ছিল! তখন আমাদের মধ্যে টক্কা-টক্কি হত, কে কত কম খেতে পারে!—তবে ক্ষিধে পেলে রাত্রে একটু দুধ বা একটা ফল খেতে পারিস। রাত্রিতে কম খেলে স্বপ্নদোষ, কামভাব হবে না। পূর্ণ যৌবনের সময় সংযম অভ্যেস করলে বেঁচে যাবি। যত কঠোরতা করবি, তত ভবিষ্যৎ ভাল হবে। তা' না হলে, এসময় যত ঢিলেমি দিবি ভবিষ্যতে তত অমঙ্গল হবে। তখন ইন্দ্রিয়সংযম করতে পারবি নে। তোদের বয়সে ঐ রকম করেছিলাম বলে ইন্দ্রিয়সংযম করতে পেরেছি, ঠিক আছি। কম ঘুমুবি। রাত্রিতে ধ্যানজপ করবি। আমরা যদি রাত্রিতে বেশীক্ষণ ঘুমুতাম, তাহলে দুঃখ করতাম। সামান্য সময়

ঘুমিয়ে রাত্রিতে ধ্যানজপ করতাম। এই বয়েসে যেইটি অভ্যেস করবি, সেইটিই রয়ে যাবে, বুঝলি ?

গান্ধী ব্রহ্মচর্য পালন করচে ; কম খায় আর ঘুমায়ও কম। গান্ধী শেষ বয়েসে বুঝতে পেরেছে ব্রহ্মচর্যের ফল। তাই দুঃখ করে। তা' আমরা ঠাকুরের কৃপায় ছেলেবেলায়ই বুঝতে পেরেছি।

এ সময় নিয়ম পালন করলে চরিত্র গঠন হবে, strict হয়ে থাকলে ইন্দ্রিয় দমন হবে, তা' হলে চরিত্রবান হতে পারবি !"

২রা ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজ প্রাতঃকালে নন্দকে বলিলেন,—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

—এই শ্লোকটি হচ্ছে গীতার সার উপদেশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাপীতাপী সকলকেই আহ্বান কচ্ছেন, বলছেন, 'ধর্মের আড়ম্বর ত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, হৃদয়ে শান্তি দেব। শোক কোরো না। সম্পূর্ণরূপে শরণাপন্ন হও। শরণাগত, Absolute resignation to the will of Lord. যীশুখ্রীস্টও একথা বলেছেন,—'Come unto me all ve that are weary and heavy laden. I shall give you rest.' বুদ্ধদেবও বলেছিলেন, 'সত্যের শরণাপন্ন হয়ে সত্যকে জান।' গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে বকলমা দিয়েছিলেন,—আমার হয়ে তুমি কর। বকলমা মানে হচ্ছে, সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা। ভারী শক্ত। তোমার যা ইচ্ছে, তাই পূর্ণ হোক।"

৩রা ভাদ্র, বুধবার, ১৩৩৭ সন।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ কহিলেন, "যাদের মন ভাল, ভক্তি আছে, তারা আশীর্বাদ টেনে নেয়। যারা স্বার্থপর, ঘোর সংসারাসক্ত, সেরূপ ভক্তি নেই, তাদের জোর করে আশীর্বাদ করতে হয়। তাদের আশীর্বাদ করলেও ফলে না।"

৪ঠা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ ভুবনদাদা ও সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,

"গান্ধীই হচ্ছে যথার্থ বিবেকানন্দের শিষ্য। তাঁর mission থেকে তো কেউ তাঁর ভাবানুযায়ী মানুষ বের হল না! স্বামীজী যা' বলে গিয়েছেন, সেইটাই গান্ধী তাঁর নিজের জীবনে পালন করে ভারতবাসীকে দেখাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, "মনে রাখিও, তুমি ভারতের, ভারতবাসী তোমার ভাই, ভারতের দেবদেবী তোমার দেবতা—এই ভারতীয় চেতনায় স্থির হইয়া নিজ বাসভূমে পরবাসী ভারত, শৃঙ্খলিত, নির্যাতিত হইয়াও জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড কটিতটে জড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বল, ভারতের কল্যাণেই বিশ্বের কল্যাণ।" তাই গান্ধী কটিতটে একখণ্ড বস্ত্র জড়িয়ে মহাত্যাগী হয়ে ভারতের মহান আদর্শ জগতের সামনে দেখাচ্ছে। স্বামীজীর বই পড়েই তাঁর inspiration হয়। আমি তাঁকে বলেছিলাম,—"শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আশীর্বাদে তোমার মহৎ উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হোক্।" গান্ধীর কোন গোঁড়ামি নেই, উদার ভাব। গীতা পাঠ করে বেদান্তের ভাব পেয়েছে। তোরা নিত্য গীতার শ্লোক মুখস্থ করবি। গান্ধী যা দেখাল, তা' আশ্চর্য। অহিংসা-পথ অবলম্বন ছাড়া কোন্ পথ ধরবে? দুটো একটা বোমা দিয়ে ইংরেজদের কি করবে? এতে আরও কাজ খারাপ হয়। গান্ধী আত্মশুদ্ধির কথা বলে। ঐ গীতা পাঠ করেই তার মধ্যে আত্মশুদ্ধির ভাব জেগেছে। তাই সে সকলকেই আত্মশুদ্ধি করতে বল্ছে। ভারত পশু বলের দ্বারা উদ্ধার হবে না। আত্ম-জাগরণ, আত্মপ্রত্যয় আস্লে ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করবে। মৃত্যুভয় থাকবে না। আত্মা অজর, অমর, নিত্য, শাশ্বত। আত্মার ধ্বংস নেই। হাজার কামান মারলেও মৃত্যুকে নির্ভীক চিত্তে বরণ করে নিতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন,—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগত স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

আমাদের দেশে যুবকদের প্রত্যেকের গীতা পাঠ করা উচিত। এতে তাদের দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ জেগে উঠবে, চরিত্র গঠন হবে। নিত্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করবে, তাহলে তাদের আত্মপ্রত্যয় আসবে। আত্মপ্রত্যয় আসলেই বলতে পারবে,—'আমার মৃত্যু নেই, জন্ম নেই, আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ আত্মা আর তখনই ঠিক ঠিক আত্মশুদ্ধি হবে।"

মধ্যাহ্নে মাদ্রাজী-শিষ্য শ্রীনিবাসের ব্রহ্মচর্য হইবার পর স্বামীজী মহারাজ ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইয়া টুলুর মা ও রামের মাকে বলিলেন,—"কি গো, তোমাদেরও কি ব্রহ্মচর্য হবে?' টুলুর মা হাসিয়া বলিলেন, 'আমাদেরও কি সেই সৌভাগ্য হবে? আশীর্বাদ করুন, আমরাও যেন নিতে পারি।' রামের মা বলিলেন, 'আমাদের কি ব্রহ্মচর্য হতে পারে? মেয়ে মানুষ।"

ইহাতে স্বামীজী মহারাজ বলিলেন, "কেন হবে না? আত্মা তো মেয়ে মানুষ নয়। আত্মার কোন লিঙ্গ নেই। পুরুষে যেমন ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করে, তেমনি মেয়েরাও পারে। পরজন্মে তোমরাও পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পার।

এই শ্রীশ্রীমা! তিনি তো আজীবন ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে মা বলে ডাকতেন। তিনিও তাঁকে মা বলে ডাকতেন, সাক্ষাৎ জগদম্বা বলে জানতেন। তাঁদের আত্মায়-আত্মায় সম্বন্ধ ছিল, স্ত্রী-পুরুষ কোন ভাব ছিল না। গৌরীমা, দুর্গামা, তাঁরা তো সন্ন্যাসিনী হয়েছেন,—বে-ই করেন নি জীবনে। তোমরাও এই আদর্শ নিতে পার।" তারপর স্বামীজী মহারাজ সকলকে বলিলেন, "তোমাদের সকলের ভক্তিবিশ্বাস হোক্, হৃদয়ে শান্তি পাও,—এই আশীর্বাদ আমি কচ্ছি।"

৭

Darjeeling
12th Aug. 1934.

প্রিয় বীরেন্দ্রবাবু,

অদ্য তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র (dated, August 10th) পাইয়া প্রীত হইলাম।

কাশীপুরের শ্মশানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি মন্দির নির্মিত হইয়াছে জানিয়া পরমানন্দিত হইয়াছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগ হইয়াছিল কাশীপুরের বাগানে ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার, পূর্ণিমা; ইংরাজী 16th August, 1886, রাত্রি ১টার সময়। তখন আমরা সন্ন্যাসী সেবকগণ তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির হইয়াছিল এবং তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) উচ্চৈঃস্বরে ওঁকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া সমবেত স্বরে ওঁ উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। সকলের মনে আশা ছিল যে অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইবে। এইরূপ আশা করিয়া আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বসিয়া রহিলাম। রাত্রি শেষ হইয়া গেল, তথাপি শ্রীশ্রীঠাকুরের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না। পরদিন সোমবার, August 17th, প্রায় বেলা ৯ টার সময়ে শ্রীমাকে সংবাদ দেওয়া হইল। শ্রীমা উপরে আসিয়া শয্যার পার্শ্বে বসিয়া "মা, কোথায় গেলি গো" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমরা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামী ও স্ত্রীর অপূর্ব সম্বন্ধ ভাবিতে ভাবিতে নির্বাক্ হইয়া রহিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাঁহাকে ষোড়শীরূপে পূজা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে জগন্মাতা জানিতেন।

তৎপরে এক নেপালী, captain, ভক্ত সংবাদ পাইয়া তথায় আসিয়া বলিলেন যে মেরুদণ্ডে ঘৃত মালিস করিলে বোধহয় চৈতন্য আসিতে পারে। তখনই শশী মহারাজ (রামকৃষ্ণানন্দ) ঘৃত মালিস করিতে লাগিলেন। কিন্তু

কোন পরিবর্তন ঘটিল না। অপরাপর ভক্তগণ সংবাদ পাইয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিল। তৎপরে বেলা ১টার সময় Dr. Mahendra Lal Sarker-কে আনা হইল। তিনি দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আর ঘি মালিস করিলে কি হইবে? এবার মহাসমাধি হইয়াছে। জীবনীশক্তি নাই। শরীর decompose হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন দেহের সৎকারের বন্দোবস্ত করা হউক।" তখন আমাদের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল। সকলেই নীরবে শোকসাগরে মগ্ন হইলাম।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য দেহ পীত বস্ত্র দিয়া সজ্জিত করান হইল। গলায় ফুলের মালা এবং পাদপদ্মে সচন্দন পুষ্প দিয়া একটি খাটে শয়ন করান হইল। সকলে খাটের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। দুইখানি Group Photo তোলা হইল। এই Photo কথামৃতে ছাপান হইয়াছে। তাহাতে সকলের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

তৎপরে বেলা ৫টার সময় কাশীপুরের বাগান হইতে সঙ্কীর্তন করিতে করিতে শ্মশানঘাটে চলিলাম, সঙ্গে নিশান, খোল, করতাল, ওঁকার, ত্রিশূল, বৈষ্ণবদিগের খুন্তি, cross, crescent সকল ধর্মের symbols একত্রে সর্বধর্ম সমন্বয় ভাবের প্রতীক লইয়া procession হইয়াছিল।

কাশীপুরের শ্মশানে বিল্ববৃক্ষমূলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাঞ্চভৌতিক দেহের অগ্নিসংস্কার করা হইল। তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্য সন্তানগণ চিতায় অগ্নিপ্রদান করিয়াছিলেন। অবশেষে অস্থি সংগ্রহ করিয়া একটি তাম্র কলসে স্থাপন করিয়া মস্তকে লইয়া কাশীপুরের বাগানে ফিরিয়া আসিলাম। কিছুদিন পরে জনৈক ভক্ত ঐ বিল্ববৃক্ষমূলে শিবলিঙ্গ প্রোথিত করিয়াছিলেন। তৎপরে কলস হইতে অধিকাংশ অস্থি বাহির করিয়া একটি তাম্র কৌটাতে আমরা রাখিয়াছিলাম। সেই কৌটা ও অস্থির নিত্যপূজা বেলুড় মঠে হইয়া পাকে। এক সপ্তাহ পরে ৮ই ভাদ্র ১২৯৩ সাল, ইংরাজী 24th August, 1886, বুধবার, জন্মাষ্টমীর দিন অবশিষ্ট অস্থি সহিত তাম্র কলসটি ভক্ত শ্রীরামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সিমলা মধু রায়ের লেনস্থিত বাটী হইতে সঙ্কীর্তন করিতে করিতে মস্তকোপরি ধারণ করিয়া আমরা (সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তগণ) কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে লইয়া গিয়াছিলাম। তথায় মহাসমারোহে ঐ কলস ও অস্থির সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। ইতি— শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীচরণাশ্রিত সন্তান

স্বামী অভেদানন্দ

৮

১২ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৪১ সন।

ডাক্তার বৈদ্যনাথ বিশ্বাস মহাশয় ও শৈলেনদাকে স্বামীজী মহারাজ কহিতে লাগিলেন,—"এ মহামায়ার হাত হ'তে এড়িয়ে যাওয়া সোজা কথা নয়। মহামায়া ভেল্কি খেলছেন! তোমাকে এমন কুহকে ফেলে দেবেন, তুমি কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না। মেয়েমানুষ আর টাকা-পয়সা নিয়েই এই দুনিয়া চলছে। এ জীবনে আমি কি কম প্রলোভনে পড়েছি! আমেরিকায় মেয়েমানুষ নিয়ে কাজ। সেখানে কত প্রলোভনে পড়েছি! শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এ সবের হাত থেকে তরে গিয়েছি। আমেরিকায় স্বামীজীকেও এমন অবস্থায় পড়তে হয়েছে। তখন তিনি বলেছিলেন, "Madam, Madam, I am a monk." —এই কামিনী আর কাঞ্চন যারা ত্যাগ করতে পেরেছে, তারা কি সাধারণ লোক! তুলসীদাসের একটি বেশ দোঁহা আছে,—

'দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী
পলক পলক লৌ চুষে।
দুনিয়া সব বাওরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥"

—এইটি আমরা আগে আগে আওড়াতাম। এ সব জেনেই তো আমরা বেঁচে গেলাম।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।'

—এই দৈবী, সত্ত্বরজস্তমো ত্রিগুণবিকারময়ী আমার মায়া দুস্তরা।

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

—আমাকেই যারা ভজনা করে, তারা এই মায়াকে অতিক্রম করে।

২৫শে চৈত্র, সোমবার, ১৩৪১ সন।

বাংলার সন্তরণবীর প্রফুল্লকুমার ঘোষ মহাশয়ের হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ৬২॥৹ ঘণ্টার সন্তরণ দেখিবার জন্য সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় স্বামীজী মহারাজ হেদুয়ায় আসেন। তিনি প্রফুল্লবাবুর সন্তরণ দেখিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। প্রফুল্লবাবু আনন্দের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্ত উত্তোলন করিয়া শ্রদ্ধার সহিত স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করিলেন। স্বামীজী মহারাজ প্রফুল্লবাবুকে বলিলেন, "আপনি যা করছেন, এ দেশের গৌরব, জাতির গৌরব।"

২৯শে চৈত্র, শুক্রবার, রামনবমী, ১৩৪১ সন।

স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বলিলেন, "যে কিছু চায় না, সে-ই পায়; যে চায়, সে পায় না। তোরা যত ত্যাগ আর কঠোরতা করবি, দেখবি, তত তোদের কোন জিনিসের অভাব হবে না। ভগবানের উপর নির্ভর করলে আপনিই সব এসে জুটবে। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন, 'First serve thy God, everything will be added unto you.' ভগবানের উপাসনা বা সাধন-ভজন করলে আপনিই এসে সব জুটবে। গীতায়ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

—অনন্যভাবে যারা আমার ভজনা করেন, আমাতেই যাদের চিত্ত সর্বদা নিবিষ্ট, আমি তাদের যোগ আর ক্ষেম বহন করি, অর্থাৎ যা পায়নি, তা পাওয়ার নাম যোগ আর যা' পেয়েছে, তা' রক্ষার নাম ক্ষেম।

—সব শিয়ালেরই একই রা',—সব মহাপুরুষেরই একই উপদেশ, নূতন আর কিছুই নয়।"

১লা বৈশাখ, রবিবার, ১৩৪২ সন।

স্বামীজী মহারাজ বিনোদ দাদাকে বলিলেন, "আমি সমস্ত পৃথিবী ঘুরে এলাম, কোন জায়গায় কোন accident হয়নি। আমি মাঝে মাঝে voice পাই। যখনই voice পাই আমি তখন obey করি।"

সন্ধ্যার সময় সমাগত ভক্তদিগকে স্বামীজী মহারাজ বলিলেন, "সম্পূর্ণ যৌবনে, যখন energy থাকে, ঐ সময়ই ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করতে হয়। পরে বুড়ো হলে ইন্দ্রিয় সব শিথিল হয়। তখন কি আর সংযম হয়? যা কিছু করার ইন্দ্রিয় সব সবল আর সতেজ যখন থাকে, তখনই করতে হয়।"

২রা বৈশাখ, সোমবার, ১৩৪২ সন।

রাত্রিতে আহারের পর ২॥০ ঘটিকার সময়ে স্বামীজী মহারাজ আনন্দোৎফুল্ল মনে গান গাহিতে লাগিলেন,—

"সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই
হাসন বলোন, চতুর চাল
অয়ন বয়ন দৃক্‌বিশাল
ভ্রুকুটি কুটিল তিলক ভাল, নাসিকা সোহাই;
বিহরে রঘুবংশবীর সখাসহিত সরযুতীর
তুলসীদাস হরখ নিরখি, চরণরজ পাই।"

৬ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৪২ সন।

স্বর্গতঃ যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাহার বধূঠাকুরাণীর দেহত্যাগে (২রা বৈশাখ, সোমবার, ১টার সময় রাত্রিতে দেহত্যাগ হয়) অতীব দুঃখিত ও ম্রিয়মান হন। তিনি অপরাহ্ণে স্বামীজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজ অতুলবাবুকে বলিলেন,—"মানুষের জীবন এতই নশ্বর! মানুষ যে বেঁচে আছে,—এ-ই আশ্চর্য!"

অতুলবাবুর কাতরতা দেখিয়া স্বামীজী মহারাজ তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "সিঁদুরিয়াপটির মণি মল্লিক শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে যেতেন। মণিবাবুর বড় ছেলেটি মারা যায়। তাতে তিনি খুবই শোক পান। তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছেন,—বিমর্ষ ভাব! শ্রীশ্রীঠাকুর তার বিমর্ষভাব দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন,—'তোমার কি হয়েছে?'

তিনি বললেন, 'আমার বড় ছেলেটি মারা গিয়েছে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাকে সহানুভূতি জানিয়ে গান ধরলেন,—

"জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তি রথে চড়ি লয়ে জ্ঞান তূণ, বাসনা ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহেক সন্ধান করে॥
আর এক যুক্তি রণে, চাই না রথ-রথী,
শত্রুনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি,
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে॥"

"জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে"—এই ছত্রটি স্বামীজী মহারাজ দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—"জীবকে সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। কাল-মৃত্যু তোমাকে বিনাশ করতে ছুটে আসছে। মৃত্যু তো জীবের কেশ ধরে টানছে! সেইজন্য জীবকে সর্বদাই সতর্কভাবে থাকতে হবে। 'সতর্কভাবে থাকা' মানে,—সর্বদাই ভগবানকে ডাকতে হবে। কার কখন ডাক আসে, কেউ তা' বলতে পারে না। ডাক আসলে যেতেই হবে। যে ভগবানের নাম-করা অভ্যাস করে, সে ভগবানের নাম করতে করতেই এ দেহ ত্যাগ করে, তার সদ্‌গতি হয়। জীবদ্দশায় মানুষের যে ভাব প্রবল থাকে, মৃত্যুর পরেও সেই ভাবই পায়, সেইরূপ গতি হয়।

মৃত্যু মানে কি জানেন? এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়া! গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্য-
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

—যেমন জীবগণ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে অন্য নব দেহ ধারণ করে।

আপনারা তার জন্য শোক করবেন না। তার আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আপনারা প্রার্থনা করবেন। তাতে সদ্গতি হবে। তিনি উদার ছিলেন, অল্প দিনে আমাদের সকলকে ভালবেসে আপনার করে নিয়েছিলেন। মায়ের মত সেবা করতে ভালবাসতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর তাঁর বেশ ভক্তিবিশ্বাস ছিল। আমি আশীর্বাদ করছি, তার আত্মার কল্যাণ হোক্, সে শান্তি লাভ করুক।"

৭ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৪২ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ দুইটি ছাত্র এবং একজন ভক্তকে বলিলেন,—"এক শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখেছি, লোকমান্যির জন্যে কোন বুজরুকি দেখাতেন না। বালকের মত সরল ছিলেন। তাঁর মধ্যে কোন ভণ্ডামি ছিল না।"

১৪ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৪২ সন।

জনৈক ভদ্রলোক যীশুখ্রীস্টের পরম ভক্ত। গোপালদা তাহার যীশুখ্রীস্টের

উপর প্রগাঢ় ভক্তি-বিশ্বাস আর নিষ্ঠার সঙ্গে উপাসনা করিবার কথা স্বামীজী মহারাজকে কহিতে লাগিলেন। স্বামীজী মহারাজ তাহাকে কহিলেন,—"শ্রীশ্রীঠাকুর যীশুকে কত ভক্তি করতেন! এক জিনিস। যীশুতো অবতার।

এই পরিবর্তনশীল জগতে যে জিনিসের পরিবর্তন হয় না,—নিত্য, সে-ই ব্রহ্ম!"

১৯শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ সন।

স্বামীজী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রণাম-মন্ত্র রচনা করিয়া সেবক-শিষ্যকে দিলেন,—

"ত্রেতায়াং যোঽভবদ্ রামঃ শ্রীকৃষ্ণো দ্বাপরে তথা।
রামকৃষ্ণঃ কলৌ সোঽয়ং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

৮ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৪২ সন।

স্নেহলতা ধরকে স্বামীজী মহারাজ পত্রে লিখিলেন,—"সকল দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়িয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। তিনি তোমাকে সংসারের সমস্ত বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিবেন। তিনিই সত্য, আর সব মিথ্যা। এই ধারণা সর্বদা মনে রাখিবে।"

২১শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৪২ সন।

জনৈক ভক্তকে স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"নিত্য গীতা পাঠ করবেন, তাহলে চিত্তশুদ্ধি হবে। চিত্তশুদ্ধি হলেই আনন্দ পাবেন।

—দীর্ঘজীবন! নীরোগ শরীর লাভ করা,—এ পুণ্যের ফল। জন্মালেই মরতে হবে! এর জন্য শোক করে কি হবে? মূর্খ যারা, তারাই শোক করে। বেঁচে থাকাই আশ্চর্য! যতদিন বেঁচে থাক, আনন্দ কর আর সৎকর্ম করে যাও।"

১৬ই কার্তিক, শনিবার, ১৩৪২ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজের সহিত সেবক-শিষ্যের ভগবান তথাগতের বৌদ্ধদর্শনের মতবাদ ও ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের উজ্জ্বল চরিত্রের বিষয় আলোচনা হইবার পর স্বামীজী মহারাজ শিক্ষা সম্বন্ধে কহিতে লাগিলেন,—"আজকাল-

কার ছেলেদের রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবৎ, পুরাণ ইত্যাদি সব বই পাঠ করা উচিত। নভেল, বায়োস্কোপ আর স্কুলকলেজে যে শিক্ষা দেয়, এতে কি ছেলেদের বা মেয়েদের চরিত্র গঠন হয়?

রামায়ণ, মহাভারত,—এই সব গ্রন্থের মধ্যে কত গভীর জ্ঞান রয়েছে! মানবজীবনের সব সংশয় দূর হয়ে যায়, চরিত্র গঠন হয়। আমার মাকে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি যে তিনি নিত্য রামায়ণের এক অধ্যায় আর মহাভারতের এক অধ্যায় পাঠ না করে জল খেতেন না। আমি তাঁর কাছে বসে এই রামায়ণ-মহাভারত পাঠ শুনতাম। তাই শুনেই তো আমি রামায়ণ-মহাভারত শিখি। ছেলেবেলায় যা শোনা যায়, সেইটাই মনে একটা impression হয়ে থাকে। এইজন্যে ছেলেবেলাতেই সৎশিক্ষা দিতে হয়,—যাতে চরিত্রগঠন হয়। চরিত্রগঠনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

৩০শে কার্তিক, শনিবার, ১৩৪২ সন।

স্বামীজী মহারাজ—"ঈশ্বরের চক্ষে দুর্নীতি-সুনীতি নাই। নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।—তিনি কারও পাপ-পুণ্য গ্রহণ করেন না। মা কালীই হচ্ছেন ঈশ্বর! এক হাতে খড়্গ-নরমুণ্ড, অপর হাতে বর-অভয়।"

৯ই পৌষ, বুধবার, ১৩৪২ সন।

স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—"কাম হচ্ছে অন্ধ আর প্রেম নির্মল, ভাস্বর।"

১৬ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৩৪ সন।

সকালবেলা স্বামীজী মহারাজ বিনোদ দাদাকে বলিতেছেন,—"কি রে! তোর কি শক্তি আছে? তুই যা ইচ্ছা করিস্ তা করতে পারিস? সবই ভগবানের ইচ্ছা! First serve God, then obey thy parents. তুই যদি আজ মরে যাস্ তাহলে কি হবে? তোর বাবা কি খেতে পাবে না? ঈশ্বরকে ধর, ভগবানের উপর নির্ভর কর। তাঁকে বিশ্বাস কর, তিনি উপায় করে দেবেন। তুই কি কোন উপায় করতে পারিস্? সবই তাঁর ইচ্ছা!"

জনৈক ভক্ত স্বামীজী মহারাজকে প্রশ্ন করিলেন,—"আচ্ছা, তন্ত্রে যে এত মন্ত্র রয়েছে, এসব কি?"

স্বামীজী মহারাজ—"মন্ত্র! মন+তোর=মন্ত্র! ঠাকুর বলতেন। সবই

নিজের বিশ্বাস। তুমি যেমনটি বিশ্বাস করবে, তেমনটি হবে। তোমার ইচ্ছাই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করছে কিনা! এই যেমন চণ্ডীতে রয়েছে,—

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।
ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্॥"

—সব প্রার্থনাই দিয়েছে। যে যে-টি চাইবে, সে সে-টি পাবে। সব প্রার্থনা তো পূর্ণ হবে না! যার মনের যে ভাবটি প্রবল, সে-টি পাবে। মানুষ তো এক রকমের নয়, অসংখ্য মানুষ, অসংখ্য কামনা, নানা রকমের।"

১৮ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৩৪ সন।

জনৈক ভক্ত—"মশাই! এই-যে ষট্‌চক্র ভেদ করতে হয়—মূলাধার, সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা,—এই সব চক্র ভেদ করতে হয়, এই সব চক্রে কি পদ্মফুল আছে?"

স্বামীজী মহারাজ—"না! পদ্ম নাই। তবে ঐ সব যায়গায় nerve-centre (স্নায়ুকেন্দ্র) রয়েছে। পদ্ম কল্পনা করে নিতে হয়। সাধারণ মানুষ তো সহজে বুঝতে পারে না, সেইজন্যে প্রথমে কল্পনা করে নিতে হয়। তবে পদ্ম নাই। ঐ সব কেন্দ্রে সাধন করলে এক এক যায়গায় এক এক ফল পাওয়া যায়। এসব বিষয় নিয়ে সাধন করতে হয়, তবে বোঝা যায়।"

ভক্ত—"আচ্ছা মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি সর্পাকারে কুণ্ডলি পাকিয়ে রয়েছে,—ওটা কি সত্যি?"

স্বামীজী মহারাজ—"সর্পাকারে নেই, তবে ঐ যায়গায় শক্তি আছে, —energy রয়েছে, তা সত্যি! ঐ শক্তিকে উপরে নিয়ে যেতে হবে, – সহস্রারে।"

ভক্ত—"সহস্রারে যে পদ্মের সহস্র পাপড়ি আছে, ওটা কি সত্যি?"

স্বামীজী মহারাজ—"সহস্রারে,—ওখানে brain রয়েছে। Brain-এ অসংখ্য convulsion,—সেটি কল্পনা করে নিয়েছে।"

ভক্ত—"গানে রয়েছে—'কবে মা আমার হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, যাবে মনের আঁধার ছুটে।'—এইটি কি রকম?"

স্বামীজী মহারাজ—"সাধক, সে তার নিজের ভাবে গাইছে। পদ্ম কি আছে, যে ফুটবে, যে মনের মলিনত্ব কেটে যাবে, অবিদ্যা দূর হবে, হৃদয়ে জ্ঞান হবে!"

ভক্ত—"দান করা যায় কাকে? বিচার করে কি দান করতে হবে?"

স্বামীজী মহারাজ—"যার প্রকৃত অভাব হয়েছে, অভাবগ্রস্তী, তাকেই দান করবে। উপযুক্ত পাত্রে দান করবে। তা' না হলে তোমার পাপ হবে। ধর, তুমি একজনকে কিছু দান করলে, সে অমনি মদের দোকানে যেয়ে মদ খেলে, তারপর সে মাতাল হয়ে একজনকে খুন করলে। সে পাপের দায়ী কে? তুমি! তারপর তোমাকে নিয়ে টানাটানি করবে, তোমায় থানায় যেতে হবে, court-এ যেতে হবে! এসব ফলভোগ তোমায় করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন,—

"দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।"

—দেশকালপাত্র অনুযায়ী দান করবে। যে সময়ে, যে স্থানে আর যে ব্যক্তির যথার্থ অভাব, তা' বিবেচনা করে দান করলেই তাকে শ্রেষ্ঠ দান বলে।"

১৮ই কার্তিক, সোমবার, ১৩৪২ সন।

স্বামীজী মহারাজ তন্ত্রের সাধন সম্বন্ধে কহিলেন,—"প্রবৃত্তির পথ দিয়ে বা ভোগের মধ্য দিয়ে নিবৃত্তির পথে যেতে হবে। সাধারণ লোককে ভোগের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নিবৃত্তি মার্গের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মদ্য-মাংস-মেয়েমানুষ নিয়ে সাধন করা ভারী শক্ত! শ্রীশ্রীঠাকুর মেয়েমানুষ নিয়ে সাধন করা পছন্দ করতেন না। এক তিনিই মেয়েমানুষকে জগন্মাতার অংশ বলে জানতেন,—সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি। নিজের স্ত্রীকেও জগদম্বা বলে জানতেন। এ দৃষ্টান্ত বিরল,—দ্বিতীয় নেই। তিনি বার বৎসর তন্ত্রের সাধন করেছিলেন। তবে যে-পথ দিয়েই যাও, সেই একই স্থানে যেয়ে পৌঁছুবে,—মুক্তি (নির্বাণ) লাভ হবেই হবে। সকলের সাধনের লক্ষ্যই—মুক্ত হওয়া! তিনি চৌষট্টিখানা তন্ত্রের মতে সাধন করে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ, পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ। পাশমুক্ত হওয়াই তন্ত্রের সাধন আর লক্ষ্য। যখন পাশবদ্ধ অবস্থায় থাকে তখন জীব, পাশমুক্ত হলেই শিব।

তন্ত্রের মদ্য-মাংস-মৎস্য-মুদ্রা-মৈথুন সম্পর্কে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"শোন্, শিব পার্বতীকে বলছেন,—

সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥

—ব্রহ্মরন্ধ্র হতে যেই সুধা ক্ষরে অনিবার।
পিয়ে যেবা সদানন্দে সে-ই মদ্য সাধক সার ॥

তারপর মাংস কি ?

মাশব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়াম।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ ॥
—মা শব্দে রসনা বুঝ, বাক্য তারি অংশ হয়,
সেই বাক্য রসনার অতি প্রিয় সুনিশ্চয়।
সে বাক্য ভক্ষণ করে বাক্ সংযত যেই,
নির্বাক সেই মহাসাধু—মাংসের সাধক সে-ই ॥

তারপর মৎস্য কি ?

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ ॥
—গঙ্গাযমুনার মধ্যে দুই মৎস্য চরে অবিরাম,
ইড়া ও পিঙ্গলা সেই দুই নদী অনুপম।
রজ, তম দুই মৎস্য চলে ফিরে তাহার মাঝারে ;
সেই মৎস্যদ্বয় যেই ভক্ষিবারে পারে,
সেই সে সাত্ত্বিক বীর সদা স্থির সুষুম্নাবিমানে,
মৎস্যের সাধকশ্রেষ্ঠ বলি তারে মানে যোগিগণে ॥

তারপর মুদ্রা। সেটা এই—

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্ ॥
সূর্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্ ;
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে ॥
—সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকার মাঝে,
শ্বেতবর্ণ সুনির্মল ঢল ঢল পারদের সাজে,
চন্দ্রসূর্য হইতেও রশ্মি যার হয় জ্যোতিষ্মান্।
অতীব কোমলস্নিগ্ধ কুণ্ডলিনী মহাশক্তিমান্।
এই যে অপূর্ব আত্মা তাহারে যে হয় অবগত,
সেই সে মহান্ প্রাজ্ঞ মুদ্রার সাধক জগতে বিদিত ॥

চরম হল মৈথুন। সেই মৈথুনের তত্ত্ব শিবের মুখে শোন্,—

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোগৌ স্থিতঃ প্রিয়ে॥
আকার হংসমারুহ্য একতা চ যদাভবেৎ।
তদা জা॰ং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥
—মৈথুন পরমতত্ত্ব সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারণ,
তাহাতে হইলে সিদ্ধি সুদুর্লভ লভে ব্রহ্মজ্ঞান।
নাদ বিন্দু করি যোগ যেই মুক্ত পুরুষ ধীমান্,
শিবাশিব রমণেতে মৈথুনের করে অবসান।
আত্মা আর কুলকুণ্ডলিনী রমণের মূল উপাদান,
এই মৈথুনে রত যে-ই মৈথুনের সাধক প্রধান।

—ব্রহ্মজ্ঞানই সে সকল সাধনার চরম লক্ষ্য!"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ আপন মনে গাহিতে লাগিলেন,—

"মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।
মন শশী অগ্রে বশীভূত কর তোমার শক্তি সারে।
ওরে কঠোর ভিতর চোরকুঠরী ভোর হলে লুকাবেরে॥
ষড়্‌দর্শনে দর্শন পেলাম না, আগম-নিগম-তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে,
সে ভাব লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় হয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে.
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বুঝে মন ঠারে ঠোরে॥"

৯ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৪০ সন। জামসেদপুর।

জামসেদপুর হইতে স্বামীজী মহারাজ কলিকাতা চলিয়া আসিবেন, তাহাতে

জামসেদপুরবাসী-ভক্তদের মনে দুঃখ হইয়াছে ; আর স্বামীজী মহারাজ তাঁহার ঘরে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া গান গাহিতেছেন,—

"যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী
শুকাল মালতীমালা, বাড়িল বিরহ-জ্বালা,
কাঁদে যত ব্রজবালা বিনে কালা গুণমণি ॥"

১৯শে পৌষ, বুধবার, ১৩৪০ সন।

স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—"তুই প্রার্থনা কর! তুই যা' প্রার্থনা করবি তা-ই পাবি। এই জগৎটা হচ্ছে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের প্রাণের কম্পন। যা' কিছু দেখছিস্, সব কম্পনের খেলা। কম্পন দুই ভাবের আছে। —নীচভাবের আর উচ্চভাবের। এই যে লোক মাগ-ছেলে পেয়েছে,—সে ঐ ভাবের কম্পন করেছে, তাই পেয়েছে! তুই উচ্চভাবের কম্পন চালা, তোর মন ঐ ভাবে ভাবিত হয়ে যাবে। তাই মনমুখ এক করে যা' প্রার্থনা করবি, তাই পাবি। New York-এ আমি যখন ধ্যানের ক্লাস করতাম, তখন আমার মেরুদণ্ডে কম্পন হত,—এমন কম্পন হত যে ঘর কেঁপে যেত।"

২১শে পৌষ, রবিবার, ১৩৩৫ সন।

স্বামীজী মহারাজ গীতার ক্লাসে কহিলেন,—"ভগবানকে পেতে হলে তাঁকে প্রাণভরে ভালবাসতে হবে। কেবল ভালবাসা দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়, "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বিবৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ"। জগতে যে যা' ভালবাসে সে তা-ই পায়। স্ত্রীপুত্র, ধনজন ভালবাসলে তাই পাওয়া যায়। ভগবানকে ভালবাসলেও তাঁকে পাওয়া যায়। অনেকে বলে, 'তাঁকে ভালবাসি অথচ পাই না' ; কিন্তু বাস্তবিক ভালবাসা নেই! ভালবাসা থাকলে ব্যাকুলতা আসে। তাতে তাঁর বিরহে মন ছট্ফট্ করে,—কৃষ্ণবিরহে গোপীদের যেমন হয়েছিল। রাধিকা কৃষ্ণের বিরহে এমন ব্যাকুল হয়েছিলেন যে তমাল গাছকে কৃষ্ণ বলে ভুল করেছিলেন। ভক্তি শাস্ত্রের চরম সার্থকতা পৌঁচেছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। উক্ত বেদের শ্লোক হতেই ভক্তিশাস্ত্রের উৎপত্তি। কৃষ্ণরাধার প্রেমে কামের সম্বন্ধ নাই। রাধা আর কৃষ্ণ, জীবাত্মা আর পরমাত্মারই প্রতীক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রাধার প্রতীক জীবাত্মা আছে। ভগবানের জন্যে বিরহে ব্যাকুল হলেই তিনি দেখা দেন। বিরহেই প্রেমের সার্থকতা আর

যাথার্থ্য বোঝা যায়। মিলনের চেয়েও বিরহে প্রেমের পরীক্ষা নিবিড়তর হয়। রাধাকৃষ্ণের লীলায় ঐতিহাসিক সত্য থাকুক, বা না থাকুক, তাতে কিছু এসে যায় না। ঐ ভাবটুকু নিলেই জীবের উন্নতি হবে।—আর ভক্তের কাছে এইটুকুই দরকার।"

ক্লাসের পর চট্টগ্রামের একজন ভক্ত স্বামীজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবানকে কি করে ভালবাসবো?—যাঁকে কখনও দেখি নি, তাঁকে কি কখনও ভালবাসা যায়?"

স্বামীজী মহারাজ—"না দেখেও ভালবাসতে পারা যায়,—ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে। যেমন প্রহ্লাদ ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখেছিল, পরে সেই বিশ্বাসেই ভগবানকে দর্শন করেছিল।"

ভক্ত—"বিশ্বাস করলেও তো মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়!"

স্বামীজী মহারাজ—"সন্দেহ হয় বটে! ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস হবে। তাঁর ওপর ক্রমে ভালবাসা হবে। তাঁকে প্রাণ ভরে ডাকলে তাঁকে ভালবাসা হয়। প্রহ্লাদের কেমন হয়েছিল? আর, দেখলেই কি ভালবাসা হয়? তবে এক রকম আছে। কোন সাধু মহাপুরুষের মধ্য দিয়ে তাঁকে ভালবাসা যায়। আমরা ঈশ্বর-টিশ্বর কিছুই বিশ্বাস করতুম না, ঘোর নাস্তিক হয়েই পড়েছিলাম। ঠাকুরকে দেখে আমাদের সবই বিশ্বাস হল। এখন সবই বিশ্বাস করি।

—তাঁকে তো আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখতে পাইনে। তাঁকে দেখতে হলে দিব্যচক্ষুর দরকার হয়। গীতায় যেমন ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন,—'দিবং দদামি তে চক্ষু পশ্য মে যোগমৈশ্বর্যম্।"

ভক্ত—"ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলে তাঁকে আমরা ভাববো কেমন করে?"

স্বামীজী মহারাজ—"তিনি ভক্তের কাছে সসীম হয়ে আসেন। তখন তিনি নির্গুণ, নিরাকার নন। এ ভক্তেরই কামনাপ্রসূত। তিনি তো অসীম! তাঁকে কি দেখা যায়? তাঁকে অনুভব করা যায়। রূপাদি ভক্তেরই কামনায় সৃজিত। তিনি তো আমাদের অন্তরেই আছেন। বাইরে আবার দেখবো কি?"

ভক্ত—"পরমহংসদেব তো খাঁড়া নিয়ে নিজের গলা কাটতে গেলেন। সেই সময় অমনি মা কালী তাঁকে দর্শন দিলেন আর তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।—এসব কি?"

স্বামীজী মহারাজ—"তাহলে তুমিও খাঁড়া নিয়ে নিজের গলা কাটতে যাও!

পরীক্ষা করে দেখ। তারপর কি হয়, দেখ্‌তে পাবে নিজেই এখন! পরমহংসদেব অনেক কিছুই করেছিলেন। তুমি কি তাঁর মত তপস্যা করতে পারবে?”

২৮শে পৌষ, রবিবার, ১৩৩৬ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কথা কহিলেন,—“আমি ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে কাশীতে দুইবার দেখেছিলাম। তিনি মৌনী ছিলেন, কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। তিনি আপনভাবে থাকৃতেন, কোন দিকে দৃক্‌পাত করতেন না!

একদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে দেখেছি! সেই চৈত্র মাসের রোদে, বাতাসে লু-ও দেখা যাচ্ছিল! পাথর এমন গরম হয়েছে যে পা দিলেই পায়ে ফোস্কা পড়ে যায়! তিনি সেই পাথরের উপর সটান চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন। অনেকক্ষণ পরে ঝপ্‌ করে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ছয়-সাত ঘণ্টা জলেই ভাস্‌ছেন, আবার কখনো জলের মধ্যে ডুব মেরে রয়েছেন, অদর্শন হয়ে রইলেন।

ঠাকুর ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দেখেছিলেন। তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সম্পর্কে বলেছিলেন,—“কাশীতে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর দর্শন করে এলাম।”

আর একবার দেখেছি, তাঁকে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি সংস্কৃতে শ্লেটে উত্তর লিখে দিতেন।”

এই সকল কথার পর স্বামীজী মহারাজ যোগের বিভূতি সম্বন্ধে অনেক কথা কহিলেন। তারপর স্বামীজী মহারাজ গুরু নানকের কথা কহিলেন,—“গুরু নানকের ভাব হচ্ছে,—বেদান্তের ভাব! তিনি গোঁড়া ছিলেন না। তাঁর দিব্যদৃষ্টি ছিল। সেই সম্বন্ধে তাঁর একটা গল্প আছে,—তিনি একবার জুম্মা মসজিদে এসেছিলেন। সকলে মসজিদে নমাজ পাঠ করছেন। তিনি সেখানে বসেছিলেন। যখন প্রধান মৌলভী প্রার্থনা করছেন, সে সময় তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। তখন সকল লোক তাঁর কাছে এসে তাঁকে মারবার জন্যে উদ্যত হয়েছে। এমন সময় মৌলভী এসে বললেন, ‘আচ্ছা, আপনারা সকলে অপেক্ষা করুন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, তিনি হাসলেন কেন!’ মৌলভী জিজ্ঞেস করায় তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন,—“আপনি যখন প্রার্থনা করছিলেন, সে সময় মনে মনে আপনি ভাবছিলেন না যে, বাড়ীতে ঘোড়ার

বাচ্চাটাকে বেঁধে রেখে আসিনি, কোথায় পালিয়ে যাবে! —এ জন্যেই আমি হেসেছিলাম।"

একথা বলামাত্র মৌলভী বললেন, "আপনি মহাপুরুষ! আপনি ঠিক বলেছেন!" সে সময় সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। মৌলভী তখন তাঁকে বললেন, "আপনি এখান থেকে চলে যান।"

৬ই চৈত্র, বুধবার, দোলপূর্ণিমা, ১৩৪১ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনের দাঁতের কাছে একটু ফাঁক ছিল। দাঁতটা একটু ভেঙ্গে গিয়েছিল। তা' বলে তিনি ফোক্‌লা ছিলেন না। সমাধি অবস্থায় গায়ে জামা থাকলে দাঁত দিয়ে তিনি এমনি করে টেনে ছিঁড়ে ফেলতেন। কাপড় পরা, জামা গায়ে দেওয়া, এসব তিনি বন্ধন মনে করতেন। তিনি বন্ধন অবস্থায় থাকতে ভালবাসতেন না।"

১১ই ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৪২ সন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে সমিতি প্রাঙ্গনে জনসভায় সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বক্তৃতার সারাংশ—

"আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যত্বের সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। তাই আমি বিশেষরূপে বুঝিতে পারি, শ্রীশ্রীঠাকুর কি এবং কেমন ছিলেন। তাঁহার কার্যকলাপ হইতে বুঝা যায় যে, তিনি অংশাবতার বা কলাবতার ছিলেন না। তিনি ছিলেন পূর্ণাবতার এবং তাঁহার আবির্ভাবের সময় হিন্দুধর্মের যে শোচনীয় অবস্থা ছিল তাহাতে এই পূর্ণাবতারের একান্ত প্রয়োজন ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের জীবনের কার্যকলাপাদি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, সকল ধর্মের নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থল হইতেছে সেই এক ভগবান এবং নিজ নিজ ধর্মে অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিলে সকলেই সেই আদি পুরুষকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব ধর্মে ধর্মে এই যে বিবাদ-বিসম্বাদ, ইহা ভ্রান্ত মনোবৃত্তির পরিচায়ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থকরী বিদ্যায় প্রকৃত জ্ঞান-লাভ খুব কমই ঘটে। আত্মা যদি অধ্যাত্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয় তাহা হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠ না করিয়াও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। এই শিক্ষা দিতেই

শ্রীশ্রীঠাকুর নিরক্ষর পুরোহিতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে বাংলার তথা সমস্ত ভারতে এক নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। আজ শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা তাঁহার জীবনী ও কথামৃত বিশেষভাবে আলোচনার অবসর পাইয়াছি। আজ এই সভায় আমি ইহাই বলিতে পারি যে, আমরা যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের মহান্ আদর্শ সাম্‌নে রাখিয়া আমাদের জীবনের পথে অগ্রসর হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনন্ত শান্তি পাইব ও মুক্তি প্রাপ্ত হইব।"

১১ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৪২ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন, "গ্রহ-নক্ষত্রের শক্তির চেয়ে আত্মার বল বেশী। ও সব আমি বিশ্বাস করিনে। মনের যখন যে ভাব প্রবল হবে সেই ভাবেরই রেখা হাতে পড়বে। আমার হাতের রেখাতো এক মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায়। সন্ন্যাসী কাউকে হাত দেখাবে না, নিজেও কারো হাত দেখবে না। বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের গ্রহনক্ষত্রের শক্তি, হাত দেখানো, এই সব বিশ্বাস করতে নিষেধ করে গিয়েছেন। নিজেকে বিশ্বাস কর। আত্মিক শক্তিই শক্তি। যার আত্মপ্রত্যয় হয়নি, সে-ই এই সব বিশ্বাস করবে। যার আত্মপ্রত্যয় হয়েছে. সে কি এইসব বিশ্বাস করে? যীশুখ্রীস্টও তাঁর শিষ্যদের এইসব বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও নিষেধ করেছেন।"

১২ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৪৩ সন।

স্বামীজী মহারাজ নিখিল মহারাজকে কহিলেন, "যে কোন অবস্থাই ঘটুক না কেন, জীবনে সকল অবস্থায় ধৈর্যকে ধরে ধীরভাবে কার্য করতে হবে। বিচলিত হলে হবে না।

তুমি যদি লোকের কেবল দোষই দেখ, তা'হলে এ জীবন তোমার বৃথাই নষ্ট হয়ে যাবে। কারও দোষ দেখবে না। তার গুণটাই দেখবে। দোষে-গুণে মানুষ। দোষ সকলেরই আছে। যে দোষ বাদ দিয়ে গুণ দেখে, সে-ই মহৎ।

যে তোমাকে ঘৃণা করে, তুমি তাকে ভালবাস, ভালবেসে আপনার করে নাও। আর, ভালবাসাই হচ্ছে ভগবান।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ "Human affection" হইতে নিখিল মহারাজকে অংশবিশেষ পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন।

৬ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৪৩ সন।

সন্ধ্যার সময় কতিপয় যুবককে স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"শ্রীশ্রীঠাকুরই আদর্শ। তাঁর আদর্শে জীবন কাটাও। সংসার জ্বালাময়। কুসঙ্গ ত্যাগ করে, কাম-ক্রোধ-লোভকে দমন করে চরিত্র গঠন করবে। মনে রাখবে, জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে,—ঈশ্বর লাভ করা। নিত্য গীতা পাঠ করবে।"

জনৈক ভদ্রলোক - "সংসারে থাকতে গেলে অর্থের প্রয়োজন হয়।"

স্বামীজী মহারাজ—"সন্ন্যাসীরও অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থকে অনর্থ জ্ঞান করবে। অর্থ,—means of exchange. সৎকার্যে যে অর্থ ব্যয় না করে, তার অর্থ মামলায় আর ডাক্তারে খরচ হয়।"

ভদ্রলোক—"সংসারে কি করে সুখশান্তি হয়?"

স্বামীজী মহারাজ—"সংসারে সুখশান্তি নেই। কেবল দুঃখের বোঝা বইতে হয়। তা' না হ'লে, আমরা সন্ন্যাসী হয়েছি কেন? ভগবানই হচ্ছেন সুখশান্তি-দাতা। তাঁর সংসার,—এ জ্ঞান করে সংসার কর। সব ভগবানের,—স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, সব তাঁর। তুমি কেবল তাঁদের ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করবে। তাঁর নাম করবে। তবেই সংসারে সুখশান্তি পাবে।"

মন্দিরের টাকার জন্য প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন, "রাজা-মহারাজার কাছে খোসামোদ করতে পারিনে। এ তাঁর কাজ, তিনিই করবেন। ভয় কি? দেখিস্, কাজ আট্‌কে থাকবে না টাকার অভাবে। টাকাও আস্‌ছে, কাজও হয়ে যাচ্ছে।"

৮ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৪৩ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজের সহিত সেবক-শিষ্যের ব্রহ্মদেশের আচার-পদ্ধতি, চীনা ও জাপানীদের কর্মকুশলতা এবং Swedagon Pagoda ও পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের বিষয় আলোচনা হইবার পর সেবক-শিষ্য স্বামীজী-মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, পুরীর মন্দিরে অশ্লীল মূর্তি কেন এঁকেছে?' এখন ইচ্ছে করলে ঐ সব মূর্তিতো কেটে বাদ দিতে পারে। এ নিয়ে কাগজেও একবার লেখালেখি হয়েছিল।"

স্বামীজী মহারাজ—"কেটে কেন বাদ দেবে? জগন্নাথ! তিনি জগতের নাথ। তাঁর চোখে কি ভাল-মন্দ আছে? সব সমান। ওখানে হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। পশুরা রমণ করে মানুষের সামনেই। তাতে কি তাদের লজ্জা বোধ হয়?

মানুষও রমণ করে। আগে মানুষ উলঙ্গ থাকত। তাতে কি তাদের লজ্জা বোধ হত ? লজ্জা কিসের ? রমণ করা তো খারাপ নয় ! এ জগতের নিয়ম। তিনিই পুরুষ হয়েছেন, তিনিই স্ত্রী হয়েছেন, তিনিই রমণ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ্যাদের অসতী-মা জ্ঞানে নমস্কার করতেন। ঈশ্বরের চোখে বেশ্যা আর সতী সমান। সূর্যরশ্মি কি বিষ্ঠার উপর পড়ে না ? চন্দন আর বিষ্ঠা সমান জ্ঞান,— একেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান।

শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে করে শুবি।

দুই সতীনে পীরিত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি।

—কাম খারাপ নয়। কাম থেকেই প্রেম হয়,—পশুভাবের কাম নয়। তবে স্তর আছে। ঈশ্বরের চোখে moral, immoral নাই।"

১৩ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৪৩ সন। প্রাতঃকাল।

জনৈক ভদ্রলোক কামরিপু দমন করিতে পারেন না। তাঁহাকে স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"এক বিছানায় স্ত্রীর সঙ্গে শোবে না, আলাদা থাকবে। স্ত্রীর ভেতর মাতৃভাব দর্শন করবে। আর কেন ? তিন-চারটি সন্তান তো হয়েছে ! এখন তোমরা ভাই-বোনের মত থাক। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর। তাঁকে মনের ভাব জানাও। তিনিই তোমাদের মনের দুর্বলতা দূর করে করে দেবেন, শান্তি দেবেন।"

স্বর্গতঃ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) মহাশয়ের পৌত্র অরুণবাবু স্বামীজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাহার সহিত স্বামীজী মহারাজের বহুক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনা হইল। কথাপ্রসঙ্গে অরুণবাবু তাহার নিজের জীবনের অনেক ঘটনা কহিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া মহারাজ তাহাকে বলিলেন,—"তাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নেন।"

স্বামীজী মহারাজ কালী তপস্বীর photo দেখাইয়া অরুণবাবুকে বলিলেন, "যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গিয়েছি, তখন আমার ঐ রকম চেহারা ছিল।"

অরুণবাবু—"তখন আপনার কত বয়স ছিল ?"

স্বামীজী মহারাজ—"সতের বৎসর। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের সময় শ্যামপুকুরের বাসায় আর কাশীপুরের বাগানে আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমরা কথামৃতের ভেতর "ইত্যাদি'-র মধ্যে পড়েছি। অসুখের সময় দু' বৎসর আমি তাঁর সেবা করি। বহুকাল পূর্বে তোমাদের ঠাকুরবাড়ীতে আমি একবার

গিয়েছিলাম। একবার Morton Institution-এ চারতলার উপরে মাস্টারমশাইকে দেখতে গিয়েছিলাম। Beadon Street-এ যখন আমাদের সমিতি ছিল, তিনিও আমাদের উৎসবে এসেছিলেন।"

অরুণবাবু—"দাদু ধ্যান-জপ করতেন। যেভাবে তিনি জীবন কাটাতেন, তা' দেখে আমার ওকে পাগল বলে মনে হত। ভাবতুম, এ সব পাগলামি কেন! ও-সব বাজে মনে হত। কিছুই বিশ্বাস হত না। তাঁকে তখন বুঝতে পারি নি! এখন যত দিন যাচ্ছে, তত যেন বুঝতে পাচ্ছি! বিশ্বেস হচ্ছে। কথামৃত পড়ি, আর ভাবি।"

১০ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩ সন।

সেবক-শিষ্য—"৪৬ ইঞ্চি, ৪৮ ইঞ্চি গেঞ্জি বাজারে কোন দোকানে নাই। অর্ডার দিলে তৈরী করে দিতে পারে। ৪৬ ইঞ্চির দাম ১ টাকা ১০ আনা আর ৪৮ ইঞ্চির দাম ১ টাকা ১২ আনা। এক দোকানে তিন দিনে তৈরী করে দেবে বললে, আরেক দোকানে বললে এক সপ্তাহে তৈরী করে দেবে।"

স্বামীজী মহারাজ—"বাজারে আমার গেঞ্জি পাওয়া যায় না, পায়ের মোজা পাওয়া যায় না, কোমরের belt পাওয়া যায় না, পায়ের জুতো পাওয়া যায় না! —অর্ডার দিলে পাওয়া যাবে!"

অতঃপর তিনি হাসিয়া সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—"এ এক অপূর্ব মহাপুরুষ! তোর খাতায় লিখে রাখ্‌বি।"

২০শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৪৩ সন।

সন্ধ্যার সময় জনৈক ভদ্রলোককে স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"প্রার্থনা করুন, তা'হলে ঈশ্বরকে জান্‌তে পারবেন। কেবল প্রার্থনা।"

ভদ্রলোক—"প্রার্থনা দ্বারা কি তাঁকে জান্‌তে পারা যায়?"

স্বামীজী মহারাজ—"হাঁ, নিশ্চয়ই।"

ভদ্রলোক—"প্রার্থনা করি; কই, হয় না তো!"

স্বামীজী মহারাজ—"চেষ্টা করুন বার বার। আপনি ঠিক প্রার্থনা করতে পারেন না। প্রার্থনা মানে কি?—চাওয়া। চাইলেই তাঁকে পাবেন আপনি কি চাইতে জানেন? প্রার্থনা করার সময় আপনার মন কোথায় থাকে? সে সময় মনে মনে যা চেয়েছেন, তাই পেয়েছেন। তাঁর কাছে স্ত্রী

চেয়েছেন, স্ত্রী পেয়েছেন ; পুত্র চেয়েছেন, পুত্র পেয়েছেন ; আমি স্ত্রী চাই নি, তাই পাইনি।

আপনি সংসারের ভোগসুখ চেয়েছেন, তাই সংসারের সুখ ভোগ করছেন। মনে রাখতে হবে, সংসারের সুখ ভোগ করতে গেলে দুঃখও ভোগ করতে হবে। বাস্তবিক সংসারে প্রকৃত সুখ নাই। ভগবানে আত্মসমর্পণ করে প্রার্থনা করবেন। আরেকটি কাজ করবেন,—প্রার্থনা করার আগে তাঁর কাছে প্রাণ খুলে কাঁদলে মনের সব ময়লা ধুয়ে যায়,—মন নির্মল হয়।"

জনৈক যুবক—"মহারাজ, মনের দুর্বলতা নষ্ট হয় কিসে ?"

স্বামীজী মহারাজ—"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, —আমার দুর্বলতা দূর করে দিন। আমায় শক্তি দিন। বলং দেহি মে। বীর্যং দেহি মে। এইরূপে প্রার্থনা করবে। তা'হলে মনে শক্তি আসবে।"

রাত্রি প্রায় এগার ঘটিকার সময় স্বামীজী মহারাজ জনৈক ভক্তের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়া সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—"কামভাব জাগলেই কি স্ত্রীর কাছে যেতে হবে ? স্ত্রীকে মাতৃভাবে দেখতে হবে। কাম দমন না করলে ব্রহ্মচর্য রক্ষা হয় না। ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে গেলে স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞান করতে হবে।"

৭ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৩৫ সন।

সকালবেলা স্বামীজী মহারাজ হিন্দু মিশনের শুদ্ধির বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া সেবক-শিষ্যকে শুনাইলেন।

সেবক-শিষ্য—"স্বামীজীও শুদ্ধির কথা বলতেন।"

ইহা শুনিয়া স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—"আমরাও শুদ্ধি করি। এই কালিদাস, সিস্টার ভবানীকে শুদ্ধি করা হয়েছে হিন্দুধর্মে। হিন্দুকে মুসলমানরা মুসলমান করছে, খ্রীস্টানরা খ্রীস্টান করছে। হিন্দুদের শুদ্ধি করা উচিত।"

৮ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৩৫ সন।

স্বামীজী মহারাজ রাত্রিতে আহার করিতেছেন। আহার করিতে করিতে সেবক-শিষ্যকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে ! বংশবৃদ্ধি করবি ?"

ইহা শুনিয়া সেবক-শিষ্য উত্তর দিলেন, "না।"

স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বলিলেন, "ঠাকুর তো বংশবৃদ্ধি করলেন না, আমিও বংশ ধ্বংস করলাম, স্বামীজীও তা'ই করেছিলেন ;—তিন ভাই, কেউ বে' করেনি। ঠাকুর আমাদের আশীর্বাদ করতেন,—"তোর বংশ নির্বংশ হোক্।" আমরা সব বংশ ধ্বংস করতে এসেছি। বংশবৃদ্ধি করে কি হবে, বল! শেয়ালটা, কুকুরটা জন্মাবে বইতো নয়! তার চেয়ে ধ্বংস হওয়াই ভাল। তুই যে এ পথে এসেছিস্, তা' তোর বাবা-মা কি এসব বুঝতে পারে?"

সেবক-শিষ্য উত্তর দিলেন, "না।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ আবার বলিতে লাগিলেন,—"সবাইতো এসব বুঝতে পারে না! তাইতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন,—

"অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥"

—পূর্বজন্মের সুকৃতি চাই! তোর পূর্বজন্মের সুকৃতি ছিল বলেই এত অল্প বয়সে তোর এ মতিগতি হয়েছে!"

সেবক-শিষ্য—"তাইতে আপনার সঙ্গ জুটে গেছে।"

স্বামীজী মহারাজ—"আমারও তাই! পূর্বজন্মের সুকৃতি ছিল, তাই ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। বিবেকানন্দেরও তাই! এইসব যোগাযোগ ঘটে যায়।"

১৯শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩৫ সন।

বৈকালবেলা স্বামীজী মহারাজের সহিত একজন ভক্ত দেখা করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজকে ভক্তটি একটি বেদের মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। তাহার আবৃত্তি শুনিয়া স্বামীজী মহারাজ আনন্দ-সহকারে মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার শুনতে বেশ ভাল লাগে। তুমি আমায় শিখিয়ে দাওতো! আমার শিখতে ভারি ইচ্ছে!"

ইহা শুনিয়া ভক্তটি কহিলেন, "সে কি বলছেন! আপনি আমার সঙ্গে ছলনা করছেন?"

স্বামীজী মহারাজ—"বাস্তবিকই আমি ছলনা করছি না।"

ভক্ত—"আপনি যে রামকৃষ্ণের ভক্ত!"

স্বামীজী মহারাজ—"আমি ভক্ত নই! তোমরা ভক্ত। তোমাদের ঠাকুরের ওপর ভক্তি আছে। ভক্তি থাকলে তো ভক্ত হব!" শ্রীম ভক্ত। আমরা ঠাকুরের সঙ্গে কেবল খেলা করেছি, ঠাকুরের খেলার সাথী!—তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এক আত্মা! তিনি এখন অশরীরী হয়ে আমাদের ভেতর দিয়ে

খেলা কচ্ছেন। অর্জুন যেমন সখাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলতেন! তাই বলে কি অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করতেন না? আমরাও তাই।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রাসাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥"

২০শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৩৫ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ খাইতেছেন আর বলিতেছেন,—"গুরুর দোষ ধরতে নেই, গুরুর দোষ অনুসন্ধান করতে নেই। গুরু কখন কি ভাবে কি করেন, কেউ বুঝতে পারে না। ঠাকুর বলতেন,—

'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

—গুরু হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবান। আমার কাছে যে সব ছেলেরা আসে, আমি তাদের চেষ্টা করি ভালর জন্যে, যদি ভাল হয়! যদি ভাল না হয়ত আমার দোষ কি, বল!

আমেরিকাতে স্বামীজী তিন জনকে সন্ন্যাস দিলেন। পরে তারাই স্বামীজীর নিন্দে করতে লাগল। আমি স্বামীজীকে বললাম, "আপনি কেন এমন শিষ্য করলেন? তারা যে আপনার নামে নিন্দে করে রটিয়ে বেড়াচ্ছে!"

তাইতে তিনি বললেন, "জীবনে একটা chance দিলাম, যদি ভাল হয় তো ভালই, তা' নাহলে, আমার দোষ কি? তার অদৃষ্টে কিছুই নেই, তাই হল না। সে দোষ কি আমার?"

—মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

—আধার ভাল না হলে তো জ্ঞান হয় না! আধার ভাল হওয়া চাই। ভেতরে কিছু থাকা চাই,—সত্য, সরলতা! একেবারে না থাকলে কিছু হয় না। ঠাকুরের কাছে অনেকে এসেও ভেস্তে গেছে। এত বড় শক্তির কাছে! যারা মহাপুরুষের কৃপা পেয়েও কর্ম ভোগ করে, তারা সংসারের অনেক ঘাত-প্রত্যাঘাতে ধাক্কা খেয়ে একদিন না একদিন বুঝতে পারবেই, ফুটে উঠবেই। মহাপুরুষের কৃপা কখনো নষ্ট হয় না।"

সন্ধ্যার পর স্বামীজী মহারাজের ক্লাসের পরে একজন ভক্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যারা আসুরিক সম্প্রদের লোক, তারা যদি বেদ-পুরাণ, গীতা-রামায়ণ পড়ে, তাদের কি দৈবী সম্পদ হবে?"

স্বামীজী মহারাজ—"হয়, যদি প্রাণে ইচ্ছে থাকে! Thirst থাকলেই হবে। ইচ্ছে না থাকলে কি কারো হয়? যখনই ইচ্ছে হবে তখনই spiritual evolution আরম্ভ হবে। আপনার যদি জল তেষ্টা না পায়, আর আমি যদি আপনার সামনে এক গ্লাস জল দিই, তা'হলে আপনি কি খাবেন?"

ভক্ত—"ইচ্ছে থাকলেও অনেকের সদ্‌গুরুর অভাবে হয় না, তা'হলে কি হবে?"

স্বামীজী মহারাজ—"ইচ্ছে থাকলে আপনিই জুটে যায়। ভগবানই জুটিয়ে দেন। এই দেখুন না, ঠাকুরের জীবন! ঠাকুর যখন যে সাধন করেছেন, গুরু আপনিই এসে জুটে গেছেন! আমাদেরও তাই!"

২১শে শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৩৫ সন।

সকালবেলা স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বলিলেন, "কিরে, তোর বাপ-মা কি বলে?"

সেবক-শিষ্য চুপ করিয়া রহিলেন। স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া হাসিয়া কহিতে লাগিলেন, "কর্মনাশা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিস্, তোর কর্মনাশ হয়ে গিয়েছে। ঠাকুরের কাছে গিয়ে আমাদের কর্মনাশ হয়ে গিয়েছে। তিনি আমাদের কর্মনাশ করে দিতেন।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, "আমি আবার তোদের কর্মনাশ করে দিচ্ছি!"

সেবক-শিষ্য—"কাল একজনের সঙ্গে তর্ক করলাম, কিন্তু কিছুতেই তাকে ধর্মভাব বুঝাতে পারলাম না! সে বুঝতেই চায় না!"

স্বামীজী মহারাজ—"তর্ক করিসনে! তর্ক করে কি কাউকে বোঝানো যায়? ঠাকুর বলতেন, 'তর্ক করো না। ভেতর থেকে বুঝতে না পারলে কাউকে তর্ক করে বোঝানো যায় না! জাগরণ চাই! জাগরণ না হলে হয় না! ভাল আধার হলেই বুঝতে পারে। বুঝবে একদিন। সময় হলে ভগবান আপনিই বুঝিয়ে দেবেন। ভগবানের কৃপা ছাড়া হয় না।

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥

প্রথমে বন্ধন! এটা বুঝতে হবে। বন্ধন বুঝতে পারলেই মুক্তি পাবার ইচ্ছে হবে। মুক্তি লাভ করতে ইচ্ছে হলে মোক্ষ লাভ হবে।

কাল যে দৈবী সম্পদের কথা বলেছিলাম, সেই দৈবীসম্পদ চাই।"

২৬শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩৫ সন।

সেবক-শিষ্য—"আপনি যে একদিন বললেন, জগতের মূল কি, তা বলে দেবেন।"

স্বামীজী মহারাজ—"মূল হচ্ছে, এক-অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। অনুভূতি চাই। কথার মানে করলে তো হবে না! অখণ্ড মানে, যা খণ্ড নয়। সচ্চিদানন্দ হচ্ছে সত্যস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ! তা'হলেই কি হল? এ অবস্থা পূজার শেষ অবস্থা। সংসারী লোকেরা কি এসব বুঝতে পারে? আমার মাগ, আমার ছেলে,—এ বুদ্ধি থাকলে কি হয়? ত্যাগ কই! ত্যাগ হচ্ছে, আসক্তি থাকবে না, 'আমি আমার', এ বুদ্ধি থাকবে না। অনেকে বলে, সংসারে থাকলে কি ব্রহ্মজ্ঞান হবে না? হবে না কেন? যার কিছুতেই আসক্তি নেই, 'আমি আমার' ভাব নেই, সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, তারই হয়!"

৩রা আশ্বিন, বুধবার, ১৩৩৫ সন।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ চণ্ডীদাদাকে বলিলেন, "ত্যাখ্ জগতে নূতন কিছু করতে গেলে সকলেই তার বিরোধী হয়; কিন্তু সকলে বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও যে নূতন পথ দেখিয়ে যায়, সে-ই মহাপুরুষ! মহাপুরুষ জগতে শান্তি লাভ করতে আসে না, দুঃখ-কষ্ট করে যায়, একটা পথ দেখিয়ে যায়। মহাপুরুষ জীবিত থাকতে তাকে কেউ বুঝতে পারে না, তার দেহাবসানে তার কদর বুঝতে পারে।

আজ প্রবাসীতে রবি ঠাকুরের একটা article দেখলুম। রামমোহন সম্বন্ধে বেশ লিখেছে। তার প্রথমেই আছে,—"মহাপুরুষ যখন আসেন তখন বিরোধ নিয়েই আসেন, নইলে তাঁর আসার কোন সার্থকতা নেই। ভেসে চলার দল মানুষেরা ভাটার স্রোতকেই মানে। যিনি উজিয়ে নিয়ে তরীকে ঘাটে পৌঁছে দেবেন, তাঁর দুঃখের অন্ত নেই। স্রোতের সঙ্গে প্রতিকূলতা তাঁর প্রত্যেক পদেই।"......স্বামী বিবেকানন্দের মত কি কেউ প্রথমে মেনেছিল? পরমহংস-দেবের মত কি কেউ মেনেছিল? মহাপুরুষদের জীবনটা খেটে খেটেই যায়।

যারা বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়, পরে তারাই বুঝতে পারে মহাপুরুষরা কি করে গিয়েছেন,—তখন পথে আসে।

আমি যখন আমেরিকাতে ছিলাম, সেখানে সকলেই আমার বিরোধী ছিল, পরে আমায় বুঝতে পেরেছিল, তখন আমায় মেনেছে।"

১৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৩৫ সন।

স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া হাসিয়া ঈশ্বরবাবুকে বলিতেছেন, "ওসব অশ্লেষা-মঘা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে কি হবে? যত মানবে, তোমার মনের দুর্বলতা তত বাড়বে। তোমার মনকে দুর্বল করে দেবে। তুমি যদি ওদের না মান, তোমার কিছুই হবে না। যত মানবে তত তোমার মনের ওপর আধিপত্য খাটাবে। আমি পঁচিশ বৎসর আমেরিকায় ছিলাম। সেখানে আমি এক দিনও পাঁজি দেখিনি। তাতে আমার কি হয়েছে? গ্রহ-উপগ্রহ, এ-তো ক্ষুদ্র জিনিষ! ভগবানই হচ্ছে সমস্ত শক্তির আধার। গ্রহ-উপগ্রহের পূজা আবার করবে কি! ভগবানের পূজা কর। ভগবানকে ধরে থাক। সংসারে থাক; কিন্তু মন ভগবানে রাখ। ভগবানের সংসার জ্ঞান কর। সংসারকে ধরে রয়েছ, আর বলছ, 'আমায় সংসার ছাড়ে না!' তুমি ছাড়লেই সংসার তোমায় ছেড়ে দেবে!

ঠাকুরের একটা গল্প শোন।……একজন একটা খুঁটি ধরে ঘুরছে। সে চীৎকার করছে, 'ওগো, কে কোথায় আছ? আমায় খুঁটি থেকে হাত ছাড়িয়ে দাও।' এমন সময় সেখান দিয়ে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যাচ্ছিল। সে দেখে হাসছে। তাকে বললে, 'তুমি নিজেইতো খুঁটি ধরে রয়েছ। হাত ছেড়ে দাও, খুলে যাবে এখন।'

ঠিক সেই রকম। তুমি যখনই সংসার ত্যাগ করতে চাইবে, তখনই পারবে। এ-তো তোমার নিজের ইচ্ছে। তোমার কোন বন্ধন নেই,—তুমি সন্ন্যাসী হয়ে যাও। ঐহিকের সুখ হল না বলে, এ-কূল ও-কূল দুকূল নষ্ট করতে হবে?—তা কেন!"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ আপন মনে গাহিতে লাগিলেন,—

"হরিনাম লইতে অলস হইও না,
যা হবার তাই হবে।
ঐহিকের সুখ হল না বলে কি ঢেউ দেখে
নাও ডুবাবে॥"

২১শে আশ্বিন, রবিবার, ১৩৩৫ সন।

স্বামীজী মহারাজ—"আমাদের দেশে ঠিক ঠিক কয়জন patriot আছে? দেশাত্মবোধ কয়জনের আছে? ত্যাগ না করলে দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। গলাবাজি করলে patriot হয় না। C. R. Das যখন সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, তখনই দেশপ্রেমিক হয়েছিলেন।

দুটো leader একমত যেখানে হয় না, সে দেশের কি মঙ্গল হয়? সকলেই নিজের মত চালাবে, obedience নেই। সকলেই নিজের নাম-যশের জন্যে কাঙ্গাল।"

২৪শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৩৫ সন।

স্বামীজী মহারাজ—"আমেরিকাতে যারা স্বামীজীকে দেখেছে, তারা আমায় বলেছে, 'আপনি যখন বক্তৃতা দেন তখন আপনার মুখের expression স্বামীজীর মত হয়ে যায়।'

আমেরিকাতে একজন সাইকিক (psychic), তার দিব্যদৃষ্টি ছিল। সে আমায় বললে, 'আপনি যখন বক্তৃতা দেন তখন আপনার মাথার ওপরে এক অপূর্ব জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে দেখতে পেয়েছি। তাঁর এই বড় বড় দাড়ি।' তারপর আমি তাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো দেখাতে সে চিনে ফেললে; বললে,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক এই রকম চেহারা! সে এর পূর্বে কখনো ঠাকুরের ছবি, কি ফটো দেখেনি। সে কখনো কখনো শ্রীশ্রীমাকেও আমার মাথার ওপর দেখেছে!"

২৮শে আশ্বিন, রবিবার, ১৩৩৫ সন।

স্বামীজী মহারাজ—"স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বড় ভাই ছিলেন। চিরদিন তাঁকে মান্যি করে এসেছি। তিনি যখন যা আদেশ করতেন, তাই করতাম। তাঁর আজ্ঞাবহ ছিলাম। বিবেকানন্দ দেবতা। বিবেকানন্দ কি ছিলেন, তা আমি Vivekananda and his works বিষয়ে আমেরিকাতে বক্তৃতা দিই। তা' পড়ে দেখতে বলবি। তিনি জ্ঞানের অবতার ছিলেন। ১৯০৬ সালে কলকাতা টাউন হলে Reply to the Calcutta address-এ আমি বলেছি, "Swami Vivekananda was not an ordinary man. He was the patriot-saint of modern India. He may be called an incarna-

tion of divine wisdom in this age of commercialism."—তিনি তো বেশীদিন রইলেন না, চল্লিশে পৌছাবার আগেই চলে গেলেন। মহাপুরুষের (স্বামী শিবানন্দ) মত এতদিন বেঁচে থাকলে কত কি কাজ করতে পারতেন! তিনি অশরীরী, তাঁর বাণী আমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে এখন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "Even if I perish out of this plane my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it."—আমি মনোমোহন থিয়েটারে বক্তৃতায় বলেছি, "বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ করে হৈ চৈ করলে তাঁকে মান্য করা হয় না। তাঁর নামে মন্দির তৈরী করলুম আর দুটো ফুল ফেলে দিলুম 'বিবেকানন্দায় নমঃ' বলে, একটা পয়সা ফেলে দিলুম, তা' হলেই তাঁর পূজো হলো না।

তাঁকে মানো আর না-ই মানো, তিনি যা বলেছিলেন তা' যদি কার্যে পরিণত করতে পার, তখনই তাঁকে প্রকৃত মান্য করা হবে, তখনই তাঁর প্রকৃত পূজা করা হবে, আর তখনই তিনি তোমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করবেন।"

৭ই কার্তিক, ১৩৩৫ সন। ৺বিজয়ার দিন।

বিজয়ার দিন সন্ধ্যার সময় জনৈক ভক্ত ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ অঙ্কিত শ্রীশ্রীমায়ের তৈলচিত্র দেখিয়া স্বামীজী মহারাজকে বলিলেন, "মায়ের oil painting-তো মায়ের ফটোর মত হয়নি!"

ইহা শুনিয়া স্বামীজী মহারাজ কহিলেন, "ফটোতো painting নয়! ফটো ভিন্ন জিনিষ, painting ভিন্ন জিনিষ! ফটো মিনিট-সেকেণ্ডের এক expression দেয়। তুমি যেমন ভাব নিয়ে বসবে, সেই রকম ভাবটি উঠবে। আর painting-এ মানুষের character ফুটিয়ে তোলে। ঐ painting-এ গায়েতে কাল রং দিলে কালো ভূত হয়ে যাবে, তা' কি দেখতে ভাল হয়? অমাদের দেশের লোকেরতো artistic taste নেই! ঐ যে যীশুখ্রীস্টের ছবি, যীশুখ্রীস্টের চেহারা কি ও-রকম ছিল? নীল চোখ দিয়েছে, লম্বা চুল! ও-তো German-এর চেহারা। যীশুখ্রীস্টের চেহারা ছিল ইহুদীদের মত। Man makes God. মানুষ তার নিজের ভাব অনুযায়ী ঈশ্বর সৃষ্টি করে। কাল মানুষ তার ঈশ্বরের রূপ কালই করে, যেমন আমাদের শ্রীকৃষ্ণ। সাদা চামড়ার লোক, তারা তাদের ঈশ্বরের রং সাদাই করে। যীশুখ্রীস্টের সময় তো ফটোগ্রাফ ছিল না! যীশুখ্রীস্টের দেহত্যাগের চার শো বছর পরে রোমের Catacombs-এ

যীশুখ্রীস্টের একজন ভক্ত,—সে দেওয়ালে যীশুখ্রীস্টের মুখের একটা side আঁকে। সেইটে থেকে imagine করে যীশুখ্রীস্টের ফটো প্রথম করে।

ফ্রাঙ্ক ডোরাক্ এখান থেকে মায়ের অনেক ফটো নিয়েছে। তারপর সে idealise করে এই painting করেছে। আমাদের দেশে এ রকম কেউ করতে পারবে? ডোরাক্ একজন বিখ্যাত painter; আমাদের দেশের লোকে তো art বোঝে না! যারা মায়ের এই oil painting-কে খারাপ বলে, তারা অতি গাধা, art-এর বিষয় কিছু বোঝে না!

যামিনী গাঙ্গুলী, Government Art School-এর Vice Principal, তাকে অনুরোধ করেছিলাম,—'এর যদি কোন দোষ থাকে তবে আপনি correct করে দিন!"

তাইতে তিনি বললেন, "এই oil painting-এর দোষই গুণ।"

* * *

শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজের দেহাবসানের পর স্বামীজী মহারাজ বেলুড় মঠে গিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজকে মঠের প্রাঙ্গণে দেখিয়া গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দজী) শিশু বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "কালী ভাই, তোমার বেদান্তের হৃদয়! শোক-তাপ কিছু নেই। তোমার হৃদয়টা একবার আমায় দাওতো!"

এই বলিয়া গঙ্গাধর মহারাজ স্বামীজী মহারাজকে জড়াইয়া ধরিলেন। স্বামীজী মহারাজ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ভাই গঙ্গাধর, কেঁদে কি হবে! সবই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা।"

* * *

পূর্ববঙ্গের এবং আসামের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া সেবক-শিষ্য আট মাস পরে একদিন রাত্রি দশটায় কলিকাতা আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় স্বামীজী মহারাজ নৈশ আহার করিতেছেন। সেবক শিষ্যকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া স্বামীজী মহারাজ সস্নেহে হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "এসো, এসো, আমার যাদু এসো, আমার নন্দদুলাল এসো। আট মাস পরে আজ আমার যাদুর চাঁদমুখখানা দেখছি। আমার শঙ্কর দিগ্বিজয় করে এলো!"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বলিলেন, "যা, খেয়ে আয় গে!"

৯

৬ই পৌষ, শনিবার, ১৩৩৬ সন।

মধ্যাহ্নে আহারের পর স্বামীজী মহারাজ অনেক কথাবার্তার পরে লক্ষ্মণ দাদাকে বলিলেন, "ভগবানের ওপর নির্ভর কর, তিনিই সব জুটিয়ে দেবেন। মানুষে কখনো নির্ভর করবে না, কারো ওপর আশা রাখবে না। যখনই কারো ওপর আশা করছ, তখনই সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্যের বীজ বপন করলে। তাঁর ওপর যদি বিশ্বাস না রাখতে পার, তাহলে ধাক্কা খেয়ে মর! দেখছতো আমায়, কানাকড়ি না নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর বিশ্বাস রেখে দুনিয়া ঘুরে এলাম। এতেও তোমাদের শিক্ষা হয় না!"

১৭ই পৌষ, বুধবার, ১৩৩৬ সন।

সন্ধ্যার পর Oxford Mission-এর একজন পাদ্রীসাহেব স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজ তাঁহার সহিত যীশুখ্রীস্টের সম্বন্ধে কথোপকথন প্রসঙ্গে বলিলেন, "যীশুখ্রীস্ট বলেছেন, 'I and my father are one.' আমরা বলি, 'অহং ব্রহ্মোঽস্মি, I am Barhma.' মুসলমানদের মধ্যে সুফীরা বলে 'অনল্ হক্, I am He.' ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের অদ্বৈতভাব,—এটা সকল ধর্মেই আছে। তোমরা বল, 'যীশু একমাত্র ঈশ্বরের সন্তান ছিলেন।' আমরা বলি, 'জীবমাত্রেই জগৎপিতার সন্তান।' এই জ্ঞান যিনি লাভ করেছেন, তিনি Christ হয়েছেন। জীবের মধ্যে এই জ্ঞান যখন হবে তখন Christ যা বলেছিলেন, 'Christ will be born within you,'—আপনার আত্মাতে Christ জন্মগ্রহণ করবেন। তখন আপনি Christ-স্বরূপ হবেন। প্রত্যেক জীবের আত্মাতে Christ গুপ্তভাবে রয়েছেন! তাঁকে জাগিয়ে তুলতে হবে।...এ-ই হচ্ছে যীশুখ্রীস্টের ধর্মের সার উপদেশ!"

২৯শে পৌষ, সোমবার, ১৩৩৬ সন।

স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন, "ময়লা কাপড় পরবি না। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবি। ময়লা কাপড়ে সব ব্যাধির জীবাণু থাকে। এতে সংক্রামক ব্যাধি হয়। কাপড়-চোপড় সব রোদে দেওয়া ভাল। এতে জীবাণু মরে যায়। যেখানে থাকবি, সেখানেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবি, ঠাকুরঘরের মত। ভগবান সব জায়গায়ই আছেন, সবই ঠাকুরঘর। খালি কি ফটোর মধ্যেই ঠাকুর আছেন?

খালি কি ঠাকুরঘরই মার্বেল পাথরের হবে? তা কেন! আমার ঘর কেমন পরিষ্কার, দেখতে পাচ্ছিস? ইংরেজীতে একটা proverb আছে,—Cleanliness is next to Godliness. ঠাকুরতো তোর ভেতরেই রয়েছেন! তবে তোর দেহকে অপবিত্র রাখিস্ কেন? তোরাই হচ্ছিস জীবন্ত ঠাকুর! তোদের ভেতরে অজ্ঞান রয়েছে কিনা! তাইতে বুঝতে পারছিস না! আমাদের দেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাটা লোকে বাবুগিরি বলে মনে করে।"

১৩ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৩৬ সন।

প্রাতঃকালে পূর্বাকাশে অরুণোদয় হইয়াছে। আমাদের ট্রেন চলিতেছে। স্বামীজী মহারাজ ট্রেনের উভয় পার্শ্বে শস্যশ্যামল দিগন্তবিস্তৃত মাঠ দেখিয়া ধীরেনবাবুকে হাসিয়া কহিলেন, "এদেশ ওরা কখনো কি ছাড়তে চায়? এদেশ হচ্ছে সোনার খনি। ওদেশের কি আছে? ইংল্যাণ্ডে ছাই জন্মায়। এদেশ ছেড়ে দিলে ওরা না খেয়ে মরে যাবে। ভারতবর্ষের সব শোষণ করে নিয়ে যাচ্ছে, নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি কচ্ছে আর এদেশের লোক না খেতে পেয়ে রোগে-শোকে জরাজীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। বুকের ওপর বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে।

ইংরেজরা বলে, 'যতদিন তোমাদের দেশের লোক হতে কেরানী, পুলিশ, C. I. D. পাব ততদিন আমাদের রাজত্ব অটুট থাকবে, এ নিশ্চয় জানবে! কারও সাধ্য নেই আমাদের রাজত্ব দখল করে।"

১০ই মাঘ, শুক্রবার, ১৩৩৬ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজের সহিত বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—"কোন বাসনা না থাকলে এ দেহ থাকে না, 'নির্বাসনোঽপি সততং

পরমঙ্গলার্থী।' দুটো-একটা বাসনা রাখা ভাল। যতদিন এ দেহ থাকে ততদিন ভোগ করে নেওয়া ভাল। কি জানিস্, দুনিয়াটা হচ্ছে ফুর্তি করার জন্যে! ফুর্তি করতেই-তো এসেছিস। হা-হুতোশ করে কি হবে! দুর্ভিক্ষে মরবে, জলপ্লাবনে মরবে, রোগে-মহামারীতে মরবে। সব ব্রহ্ম। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"যে প্রচারক হবে, সে সকলকে একই উপদেশ দেবে না। যে যে-উপদেশের অধিকারী, তাকে সেই উপদেশ দেবে।"

২৫শে ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৩৬ সন।

সেবক-শিষ্য—"এবার কুম্ভমেলায় সন্তদাস বাবাজীকে দর্শন করলাম। তিনি রামদাস কাঠিয়া-বাবাজীর শিষ্য। তিনি বৃন্দাবনের মোহান্ত। আমি তাঁর সেবাও করেছি। তিনি আমাকে ভালবেসে উপদেশ দিলেন। রামদাস কাঠিয়া-বাবাজী তাঁকে গীতার একটি শ্লোকের অর্ধাংশ আবৃত্তি করে বলেছিলেন, 'যা' কিছু করবে তা' তুমি নিজে করছ, এ মনে করো না। তোমার সকল কাজের ভারই আমার ওপর জানবে।"

স্বামীজী মহারাজ—"রামদাস কাঠিয়া-বাবাজীকে আমিও দেখেছি বৃন্দাবনে। সে অনেক দিনের কথা! মনে নেই! সন্তদাস বাবাজীকে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখা হয়নি। তখন পঙ্গতে বসেছিল।

গীতার সেই শ্লোকটি হচ্ছে,—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, স্বপ্ন, শ্বাস, প্রলাপ, বিরাগ, গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ প্রভৃতি কার্য করেও তত্ত্বজ্ঞানী, সমাহিতচেতা ব্যক্তি বিবেচনা করে থাকেন যে ইন্দ্রিয়সকল (স্বভাবের বশে) ইন্দ্রিয়ার্থে প্রবৃত্ত হচ্ছে। (আমার মতে এতে কোন বিকার নেই, সুতরাং) তিনি এ-ই ভেবে থাকেন যে, আমি কিছুই করছি না। —এ বড় শক্ত ব্যাপার।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ গান গাহিতে লাগিলেন,—

"দূর্‌সে আওত সাথী, শুনকে ম্যায় খানে কুঁহু,
ব্যস্ তরপ্‌তে হি চলে আফ্‌শোষ, পায় মানে কুঁহু ।"

পরে সেবক-শিষ্যকে উহার অর্থ বলিলেন,—'হে সখা, আমি দূর থেকে এসেছি তোমার নাম শুনে। তুমি যে মদ (প্রেম) বিক্রী করছ, তা' পান করবার জন্যে! আমি এখন তাড়াতাড়ি আফ্‌শোষে চলে যাচ্ছি। তুমি তো আমাকে তোমার প্রেম দিলে না।'

—এ হচ্ছে গজল, ফার্সী গান। সদানন্দ গাইতো। সদানন্দ স্বামীজীর প্রথম শিষ্য।"

৩রা চৈত্র, সোমবার, ১৩৩৬ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ তাঁহার কয়েকজন শিষ্যের কথা কহিতে কহিতে বলিলেন, "এখানে অনেকে এসেও ভেস্তে যাবে! তাতে আর কি হয়েছে! সকলেই কি টেক্‌তে পারে? পূর্বজন্মের খুব সংস্কার চাই! বড় শক্ত ব্যাপার! গাছের সব আমই কি পাকে? কতক মুকুলের সময়ই ঝরে পড়ে যায়, কতক ঝড়ে পড়ে যায়, কতক কাঁচাই পড়ে যায়, অবশিষ্ট কতক পাকে। শ্রীরামপ্রসাদের গানে আছে, 'ঘুড়ি লক্ষে কাটে একটা-দুটো, হেসে দাও মা, হাত চাপড়ি।' গীতাতেও রয়েছে—

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

যীশুখ্রীস্টও বলেছেন, "Many are called, but few are chosen."—অনেকেই আসবে, তবে তার মধ্যে দুটি-একটি থেকে যাবে।...এই সব ব্যাপার, বুঝ্‌লি!"

১৬ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৩৬ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ ভূপেন দাদাকে কহিলেন, "ভগবান্ অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্। তিনি পরমাণু প্রভৃতি বস্তুর চাইতেও অনীয়ান্ (অতিশয় সূক্ষ্ম) আর মহৎ পদার্থ চাইতেও অতি মহান্।—এই ভাবটি বুঝতে আমার বার বছর লেগেছে, তবে বুঝেছি। এ-রকম একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকতো দেখি! জীবনটা কাটিয়ে দাও। আমরা যা তপস্যা করেছি তার এক আনিও করলে তোমাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে।"

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী মহারাজ গান গাহিতে লাগিলেন,—

"এত্‌নি মিনতি রঘুনন্দন সে।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজের সহিত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও আর্য সমাজের বিষয়ে অনেক কথোপকথনের পর তিনি সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,— "সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কেমন জানিস্‌?—

অহোময়ী চিদাম্বোধা বাশ্চর্যা জীব বীচয়।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ॥

—চিৎ সমুদ্রস্বরূপ আমাতে জগতের যাবতীয় প্রাণী তরঙ্গরূপে উঠ্‌ছে, খেল্‌ছে আবার নষ্ট হয়েও আমাতে স্বভাবতঃ প্রবেশ করছে। কি আশ্চর্য বিষয়!"

তারপর স্বামীজী মহারাজ জনৈক ভক্তের কথা কহিয়া সেবক-শিষ্যকে বলিলেন, "তুই-ও যদি বে' করিস্‌ তোকেও ঐ রকম ভুগ্‌তে হবে! কতকগুলো সন্তান হবে! শেষে লেজে-গোবরে হয়ে যাবি। রবি, দেখে শুনে শেখ্‌। সংসারটা কেমন, বুঝ্‌তে পারলি?—

একবৃক্ষে সমারূঢ়া নানাপক্ষী বিহঙ্গমাঃ।
প্রভাতে দশ দিক্‌ যান্তি কা কস্য পরিবেদনা॥

—রাত্রিতে এক বৃক্ষে নানা পক্ষী-বিহঙ্গ এক ডালে বাস করছে, প্রভাত হ'তে দশ দিকে চলে যাচ্ছে। কে কার জন্যে দুঃখ করে?—জগতেও সেই প্রকার সংসাররূপ বৃক্ষে লোক সকল কিছুকাল বাস করে, তারপর প্রভাত হতেই যার যার গন্তব্য স্থানে চলে যায়। তাতে দুঃখ করবার কি আছে!"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ যীশুখ্রীস্টের বিশ্বাসের কথা কহিয়া বলিলেন,—

"যীশুখ্রীস্ট বলেছিলেন, 'যদি তোমার একটি সরষের দানার মত বিশ্বাস থাকে, তুমি এই সামনের পাহাড়কে সরে যেতে বলবে, তা'হলে সে সরে যাবে; আর তোমার কাছে কিছুই তখন অসম্ভব হবে না। —'If you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, 'Remove hence to yonder place', and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.'

—বিশ্বাসের উপর কত জোর দিয়েছে দেখছিস্‌!"

১৭ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৩৬ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কিরে, তুই ভক্ত হবি, না সংশয়বাদী হবি!"

সেবক-শিষ্য—"আমি ভক্ত হব, সংশয়বাদী হব না।"

স্বামীজী মহারাজ—"যে নাস্তিক হবে তাকে ধরে মারবো। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি, ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর যে আমার ভক্ত সে কখন বিনষ্ট হয় না। তুই কখন নাস্তিক হোস্ না, বুঝলি! এইটি জীবনে স্মরণ করে রাখবি। নাস্তিকদের ইহকালে, পরকালে, কোন কালেই সুখ নেই, অশান্তি পায়।"

তারপর স্বামীজী মহারাজ গাহিতে লাগিলেন,—

"গঙ্গাধর মহাদেব শুন ফুকারো মেরি।
দিজে বর বেগী নাথ কাহা করত বেরি॥
চন্দ্রভাল কৃপা নেহাল,
মেটো ভ্রম মোহজাল, কাশীমে বসাও নাথ কৃপাদৃষ্টি হেরি॥

—হে গঙ্গাধর, মহাদেব, তুমি আমার কাতর প্রার্থনা শুন। কেন তুমি দেরী করছ? আমাকে শীঘ্র বর দাও। হে চন্দ্রভাল, (চন্দ্র যাহার কপালে আছে) আমাকে কৃপাচক্ষুতে দেখ। আমার ভ্রম, মোহজালসমূহ দূর করে দাও, কৃপাদৃষ্টি করে আমাকে কাশীতে বাস করতে দাও।

—কেমন সুন্দর ভাব, বল দেখি! আমেরিকা যাবার পূর্বে যখন কাশীতে ছিলাম, তখন এই গান গাইতাম। এখনও স্মরণ আছে। দুর্গাবাড়ীর কাছে এক বাগানে থাকতাম। সে সময় প্রমদা মিত্র আমাদের কাছে মাঝে মাঝে এসে এসব গান গাইত। আমরা তারই কাছে শিখেছিলাম।"

১৮ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৬ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ ভগবান বুদ্ধদেবের কথা কহিতে কহিতে সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—"বুদ্ধদেব প্রত্যেক দিন রাত্রে তাঁর বিহার 'সংক্রমণ' করতেন,—কে, কোথায়, কেমন আছে, অতিথি আর রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা ঠিক হচ্ছে কিনা,—এ তিনি রোজই খবর নিতেন।…একদিন গিয়ে দেখেন, এক রোগীর ভেদবমি হচ্ছে। সে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে, কখন সে বিছানা

ছেড়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছে, আর উঠতে পারে নি। সেখানেই মলমূত্রমাখা হয়ে পড়ে রয়েছে অন্ধকারে। তখনই তিনি আনন্দকে ডেকে আলো আনতে বললেন। নিজেই রোগীকে সেবাযত্ন করতে লাগলেন। শেষে তিনি রোগীকে কোলে করে তুলে তার বিছানায় শুইয়ে রেখে আসলেন।

সে-রাত্রে বুদ্ধদেবের আর ঘুম হল না। তিনি রাত্রিতে আরো দু' তিনবার দেখে গেলেন। পরদিন সকালবেলা তাঁর শিষ্যেরা যখন তাঁকে প্রণাম করতে এসেছিল, তিনি তখন সকলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,—"তোমরা কেউ কি তার অবস্থা জানতে?"

সব্বাই মাথা হেঁট করে রইলে। তখন ধীরে শান্তস্বরে বুদ্ধদেব বললেন,—"দেখ, তোমরা মা-বাপ, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, সুখ-সংসার ছেড়ে আমার কাছে এসেছ। তোমরা যদি পরস্পর পরস্পরকে না ভালবাস, আপদে-বিপদে কার কাছে দাঁড়াবে? আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি ভালবাসা না জাগে, তোমরা যদি কেউ কারুর দুঃখ না বোঝ, তবে আমাকে যে তোমরা ভালবাস, তাই-বা আমি কি করে বুঝব?"

সঙ্ঘ চালাতে গেলে ভ্রাতৃভাব থাকা দরকার। মাতৃগর্ভের ভাইয়ের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ,—blood relation, আর গুরু ভাইয়ের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ,—soul relation. —আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে খুব নৈকট্য। কেননা আত্মা ইহলোকেও থাকে, পরলোকেও থাকে।

আমরা যখন তপস্যা করতাম তখন বুদ্ধদেবের চরিত্র ধ্যান করতাম আর তাঁর কঠোরতার বিষয় ভাবতাম। আমরাও চেষ্টা করতাম, যতটা পারি কঠোরতা করতে। ঠাকুরতো আমাদের কঠোরতা করতে বলতেন না! স্বামীজী, আমি আর শিবানন্দ স্বামী,—আমরা বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলাম। বুদ্ধদেব যেখানে বসে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, সেই আসনে বসে আমরা রাত্রিতে ধ্যান করেছিলাম।"

তারপর স্বামীজী মহারাজ বুদ্ধদেবের বিষয়ে অনেক কথাবার্তার পর সেবক-শিষ্যকে বলিলেন, "বুদ্ধদেবের বিষয় আর কি বলব! বুদ্ধদেবের মত মহাপুরুষ জগতে বড় দেখা যায় না!"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া সেবক-শিষ্যকে বলিলেন, "তুই বুঝি বুদ্ধদেবের কথা শুনতে ভালবাসিস্!"

সেবক-শিষ্যও হাসিয়া উত্তর দিল,—হ্যাঁ, আমি ছেলেবেলা থেকেই যত

মহাপুরুষ আছেন, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেবকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসি আর ভক্তি করি। তাঁর কথা শুনতে, তাঁর কথা পড়তে আমি ভালবাসি।"

স্বামীজী মহারাজ পুনরায় হাসিয়া বলিলেন,—"তা' বেশ! বেশ!"

২৩শে চৈত্র, রবিবার, ১৩৩৬ সন।

জনৈক ভক্তের সহিত কথোপকথনের পর স্বামীজী মহারাজ তাহাকে বলিলেন,—"সেই আত্মাকে লাভ করতে হলে তপস্যা চাই! তপস্যা করতে হবে! সত্য পালন করতে হবে। আর ব্রহ্মচর্য চাই। ব্রহ্মচর্য হচ্ছে স্ত্রীসঙ্গ না করা, বীর্য ধারণ! বীর্যই মস্তিষ্কের খাদ্য। বীর্যবান্ ব্যক্তিই আত্মাকে লাভ করতে সমর্থ হয়। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। বীর্যহীন ব্যক্তির সমাধি হবে কি! ধ্যানই করতে পারবে না। ধ্যান করতে গেলে মূর্ছা হয়ে পড়ে যাবে।"

তারপর স্বামীজী মহারাজের সহিত তাঁহার আহার সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইবার পর স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন, "দুর্বাসা গোপীদের নিকট হতে ভূরিভোজন করেও যমুনা নদীকে বলেছিল, 'আমি যদি চিরদিন নিরম্বু উপবাস থাকি, তা'হলে, হে যমুনে, সেই পুণ্যবলে গোপীদের পার হতে পথ দাও!' যমুনা তখন পথ করে দিল, গোপীরা পার হয়ে গেল। তারা ভাবল, এ কি অলৌকিক ব্যাপার! সমস্ত দ্রব্য খেয়ে বলে কি না, 'আমি কিছু খাই নি, উপবাসী!' শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করেও ব্রহ্মচারী! —এই হচ্ছে ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা! সবকিছু করেও সে জানে, আমি কিছু করছি না। সবই ব্রহ্মেতে অর্পণ করছে। ব্রহ্মই হবিঃ, ব্রহ্মই হোতা!

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা॥

—ঠাকুর বলতেন, 'তিনিই বলি, তিনিই হাড়কাঠ, তিনিই কামার।'—এইরূপ যাঁর জ্ঞান হয়েছে, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারেন।"

সেবক-শিষ্য—"দুর্বাসা মুনির খুব ক্রোধও ছিল।"

স্বামীজী মহারাজ—"তাতে আর কি হয়েছে! সৎ-এর রাগ, জলের দাগ। যেখানে অন্যায় অত্যাচার দেখেছেন, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।"

২৫শে চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৬ সন।

স্বামীজী মহারাজের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল।

সেবক-শিষ্য স্বামীজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তা'হলে বিবাহিত জীবনে কি সত্য লাভ হয় না? বিবাহ করা কি উচিত নয়?"

স্বামীজী মহারাজ—"কেন হবে না! বিবাহিত জীবনেও সত্য লাভ হতে পারে, যদি স্বামী-স্ত্রী ত্ব'জনেই সত্যকে লাভ করতে ইচ্ছুক হয়! শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, পরমহংসদেব, তাঁরা সকলেই বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের কি সত্য লাভ হয়নি? পরমহংসদেব বিবাহ করেছিলেন, স্ত্রীত্যাগ করলেন না। স্ত্রীকে স্ত্রী-বুদ্ধি না করে সাক্ষাৎ জগন্মাতা বলে জানতেন! এ কয়জনে পারে? বল! তিনি যা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, এ জগতের ইতিহাসে এক নূতন, অদ্ভুত! তবে বিবাহ করে ত্বটি বা একটি সন্তান হলে ভাই-ভগ্নীর মত থাকতে পারে। বুদ্ধদেবের একটি পুত্রসন্তান হতেই তিনি সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন সত্যকে জানবার জন্যে! —এই সত্যকে জেনে বুদ্ধদেব পুনরায় পিতৃরাজ্যে আসলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর শিশুপুত্র রাহুলকে পাঠিয়ে দিলেন,—"যাও, ঐ দেখ, তোমার পিতা আসছেন! তাঁর কাছে পিতৃধন চেয়ে লও।"

বুদ্ধদেব আসছেন দেখতে পেয়ে রাহুল ছুটে গিয়ে তাঁর পিতার কাছে উপস্থিত হল; বলল,—"বাবা, আমাকে পিতৃধন দিন্।" বুদ্ধদেব বললেন,—"বাবা, আমার কাছে তোমার কি পিতৃধন আছে?" —এই বলে তিনি একখানি গেরুয়াবস্ত্র তাঁকে দিয়ে বললেন,—"বাবা, এই তোমায় পিতৃধন দিলাম।" রাহুল সাত বছরের ছেলে, সন্ন্যাসী হ'ল! দেখ, কি অদ্ভুত দৃশ্য! কি আদর্শ বাপ-মা!

পরে বুদ্ধদেবের স্ত্রী-ও এ সুযোগ ছাড়লেন না। তিনিও বুদ্ধদেবের চরণতলে আশ্রয় নিলেন। তিনি তাঁকে জ্ঞান দিলেন আর নিজের শিষ্যা করে নিলেন। তাঁর স্ত্রী-ই হচ্ছে তাঁর প্রথম শিষ্যা। বুদ্ধদেবের স্ত্রী-ই ছিল মেয়েদের মঠের কর্ত্রী।

স্বামী-স্ত্রীর উচিত আপন আপন মুক্তিপথ সন্ধান করতে পরস্পরকে সহায়তা করা,—পূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভ করা। স্বামী যদি স্ত্রীকে আত্মোপলব্ধির পথে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে স্বামীই হল তার মুক্তিদাতা বন্ধু, আর স্ত্রী যদি স্বামীকে আত্মোপলব্ধির পথে উদ্বুদ্ধ করে, তা'হলে স্ত্রী-ই হ'ল তার মুক্তিদাতা বন্ধু। স্বামী-স্ত্রী, উভয়ে উভয়কে কেন ভালবাসে?

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো
ভবত্যাত্মানস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।

ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া
ভবত্যাত্মনাস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ॥

—অর্থাৎ, পতির জন্যে পতি প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যে পতি প্রিয় হয়। জায়ার জন্যে জায়া প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যে জায়া প্রিয় হয়।

সাধারণতঃ আজকাল লোকে বিবাহ করে স্ত্রীকে দাসী করে রাখে। বিনা পয়সায় ঝি রাখা! স্বামী চায় স্ত্রী তার দাসী হয়ে থাকুক আর স্ত্রী-ও চায় তার স্বামীটি তার গোলাম হয়ে থাকুক। এ চায় তাকে বশ করতে, ও চায় একে বশ করতে। স্বামী, স্ত্রী উভয়েরই উচিত প্রত্যেককে প্রত্যেকের স্বপ্রতিষ্ঠ করা। স্বামীর যতটুকু জ্ঞান আছে স্ত্রীকে দিক, স্ত্রীর যতটুকু জ্ঞান আছে স্বামীকে দিক।

স্বামী বা স্ত্রীর কর্তব্য তখনই পালন হচ্ছে জানবে, যখন উভয়ে উভয়কে আরও শুচি-সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করছে। এই জন্যেই শাস্ত্রে স্ত্রীকে সহধর্মিনী বলে। আজকাল আর ক'জন এমনি করে বিবাহিত জীবন কাটায়, বল! খুব কমই দেখা যায়! পূর্বে ঋষিরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একত্রে বাস করত, ভগবানের নাম করত, সাধন-ভজন করে জীবন অতিবাহিত করত। যথার্থ স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা কামগন্ধহীন!"

১৬ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

সকালবেলা স্বামীজী মহারাজ আমেরিকা প্রত্যাগত দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ আর. আমেদের সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার আমেদ বেশ ভদ্রলোক! মুসলমান হয়েও হিন্দুভাবাপন্ন! আমাকে প্রণাম করে।"

সেবক-শিষ্য—"পায়ে প্রণাম করে কি?"

স্বামীজী মহারাজ—"পায়ে প্রণাম করবে কেন? আমিতো পায়ে প্রণাম পছন্দ করিনে!"

সেবক-শিষ্য—"ভূপেন দত্তও পায়ে প্রণাম করা পছন্দ করে না। সে বলে, 'অপরের পায়ে কেন তুমি মাথা নত করবে? তুমিও মানুষ, সে-ও মানুষ! হাত জোড় করে প্রণাম করলেই যথেষ্ট মান্য করা হয়। পায়ে প্রণাম করা থেকেই আমাদের দেশে গোলামী-ভাব ঢুকেছে! এ-তো slave mentality-র লক্ষণ!"

স্বামীজী মহারাজ—"তাইতো ঠিক! আমিও আগে ঐ রকম বলতাম।

বলে বলে হয়রান হয়ে গিয়েছি! এখন আর কিছু বলিনে। দেশাচার কি না!"

সেবক-শিষ্য—"আপনি একদিন ক্লাসে হিন্দুদের প্রণাম করা সম্বন্ধে বলেছিলেন,—হিন্দুরা যে উদ্দেশ্যে প্রণাম করে, তা অতি উদার ভাব। এ ভাবটি জগতের কোন দেশে নাই। এই যে পরস্পর পরস্পরকে দেখলেই প্রণাম করে, তা' কেন? তার পঞ্চভূতের শরীরকে প্রণাম করে না, তার দেহাবস্থিত আত্মাকেই নারায়ণ-বুদ্ধি করে প্রণাম করে। মূলতঃ আত্মা আত্মাকেই প্রণাম করছে,—বেদান্তের ভাব। আর পাশ্চাত্যবাসীদের প্রণামের কথা বলেছিলেন যে, পূর্বে ওরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কলহ করত, মারামারি করত। কেউ কাউকে বিশ্বাস করত না। প্রত্যেকের কাছেই তলোয়ার থাকত। কোমরের বাম দিকে তলোয়ার ঝুলত। ডান হাত সেই তলোয়ারের বাটে লাগানো থাকত। কখন শত্রু এসে আক্রমণ করবে, সেই ভয়ে! কিন্তু কাউকে মিত্র বলে বুঝতে পারলে ডান হাত দিয়ে shake hand করতো। Hand shake হচ্ছে মিত্রতা স্থাপন করা!

মুসলমানরা কাউকে পায়ে প্রণাম করে না! "শ্লামালেকম্! আদাপ্, আদাপ্" বলে। ঈশ্বরের নিকট ছাড়া কারও কাছে মাথা নোয়ায় না। নামাজের সময় ওরা শির নোয়ায়! ওরাও পায়ে প্রণাম করে! যীশুখ্রীস্টের একটা ছবিতে দেখেছি, একটি মেয়ে যীশুখ্রীস্টকে পায়ে প্রণাম করছে!"

স্বামীজী মহারাজ—"I kiss the dust of thy feet.—আমি আপনার পদধূলি চুম্বন করি।"—একথা ইংরেজীতে আছে।

রোমে Saint Peter Cathedral-এ দেখেছি, গির্জায় ঢুকতে দরজার সামনেই Saint Peter-এর একটি প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্তি আছে। তা'র পা' আর পায়ের আঙুলগুলি বৃহৎ। গির্জায় ঢুকতে প্রথমেই মেয়ে-মদ্দ সকলেই সেই বুড়ো আঙুলটির ওপর চুমো খায়। চুমো খেতে খেতে বুড়ো আঙুলটি একেবারে ক্ষয়ে গিয়েছে।

Martha আর Mary নামে দুই বোন যীশুখ্রীস্টের মেয়ে ভক্ত ছিলেন। যীশুখ্রীস্ট যখন তাদের বাড়ী এসেছিলেন, মেরী তখন তাঁর পা' ধুইয়ে নিজের আলুলায়িত কেশ দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তো খালি পায়ে হাঁটতেন কি না!

Mary Magdolen নামে একজন কুলটা স্ত্রীলোক যীশুখ্রীস্টের ভক্ত ছিল।

সে মেয়েটা ছিল বড়ো ইহুদীরা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে-মেরে ফেলবে। সকলে ঘেরাও করে তাঁকে পাথর দিয়ে মারতে উদ্যত হয়েছিল। এমন সময় তা' দেখতে পেয়ে যীশুখ্রীস্ট তাদেরকে বলেছিলেন,—"তোমাদের মধ্যে যে কখনও জীবনে একটিও পাপকার্য করেনি, সে-ই ওকে প্রথমে পাথর ছুড়ে মারুক। তখন সকলে পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করছে। শেষে কেউ আর পাথর দিয়ে মারতে সাহস করলে না। শেষে যীশুখ্রীস্ট ঐ মেয়েটিকে শিক্ষা করে নিলেন। ঘৃণার দ্বারা কারও হৃদয় জয় করা যায় না। ভালবাসাই হৃদয়কে জয় করে। ভালবাসা দ্বারা বনের পশু পোষ মানে। God is Love, যেখানে ভালবাসা, সেখানেই ভগবান। বালকদের হৃদয়েই ভগবান বাস করেন। Children love each other.—দেখ্‌লি, যীশুখ্রীস্টের কি নিঃস্বার্থ প্রেম!"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ Roman Catholic ও Protestant-দের মতামত এবং Luther-এর জীবনাদর্শ বলিয়া লেখক-শিষ্যকে বলিলেন, "Roman Catholic-দের মধ্যে ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণী, সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী আছে। আমাদের মত তারাও সব ত্যাগী। তারা বলে, 'আমরা কেন বিবাহ করব? তিনি তো বিবাহ করেন নি! তিনি যেমনটি আচরণ করেছেন, আমরা তা' করবার চেষ্টা করব! তিনি যা' করেছিলেন, তা-ই আমাদের আদর্শ!' Protestant-রা বিবাহ করে। তারা বলে, 'তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। তিনি যা' করেছিলেন তা' কি আমাদের করা সম্ভব? তিনি আমাদের আদর্শ।' এ ছাড়া আর কোন কথা বললে শুনবে না। Roman Catholic-দের মধ্যেও ভাল লোক আছে, Protestant-দের মধ্যেও ভাল লোক আছে। ভালমন্দ সকলের মধ্যেই আছে।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর আমাদের যেমন রাম দত্তেরা বললে, 'পরমহংসদেব বিবাহ করেছিলেন, আমরাও বিবাহ করব। তবে তিনি স্ত্রীসঙ্গ করেন নি! তিনি আমাদের দেবতা ছিলেন। তিনি আমাদের আদর্শ।' আমরা বলি, 'তিনি বিবাহ করেও সন্ন্যাসী ছিলেন, পরমহংস! নিজের স্ত্রী আর সকল স্ত্রীলোককেই তিনি সাক্ষাৎ জগদম্বা বলে জানতেন। তিনি যা' করেছিলেন, তা-ই আমাদের আদর্শ।' এই আর কি! বুঝলি? আমরাও সে-ই আদর্শ নিয়ে সকল স্ত্রীলোককে মাতৃবুদ্ধিতে দেখতে চাই।"

১০

২৩শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজ তাঁহার জনৈক ত্যাগী সন্তান সম্পর্কে বলিলেন, "আমি তাকে প্রাণ থেকে ভালবাসি! লেখাপড়া না-ই বা জানলে। বিদ্যাবুদ্ধি না-ই বা থাকল! এ পাণ্ডিত্যের দ্বারা হয় না, B. A. পাশ করলে হয় না। লাটু ভাইতো মূর্খ ছিলেন। শেষে ঠাকুরের কৃপায় তিনি মহাজ্ঞানী হয়ে গেলেন। দিনরাত ভগবানের ধ্যানজপ করতেন। তাঁর কাছে মহা-মহাপণ্ডিত ঘোল খেয়ে যেত। আসল কথা কি জানিস্? Sincerity চাই। সরলতা! কপটতা নয়। নিরহঙ্কারিতা হবে। আজ্ঞাবহ হবে। যা' আজ্ঞা করবে, তা-ই পালন করবে কায়মনোবাক্যে! তা' হলেই হল।"

তারপর স্বামীজী মহারাজ আরুণির গুরুভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সেবক-শিষ্যকে কহিলেন, "আরুণির গুরুভক্তি দেখে তাঁর গুরু উদ্দালক ঋষি অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। কি গুরুভক্তি!"

২৫শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"ও অহিংসা-টহিংসা আমি পছন্দ করিনে। যুদ্ধ! লড়াই কর। হয় জয় লাভ, না হয় মৃত্যু! পরাধীন জীবন কি সুখের? গোলামের জীবনের মূল্য কি? স্বাধীনতার আনন্দ সে কি কখনো অনুভব করতে পারে?"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া কহিলেন,—"যুদ্ধং দেহি। আমি শ্রীকৃষ্ণের মত যুদ্ধ ভালবাসি। আমাকে একজন মাড়োয়ারী শিলং-এ জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি আমেরিকাতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, গোপীদের বস্ত্রহরণ সব তাদের কাছে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন?' তার উত্তরে আমি বলেছিলাম,

'আমি তাদের কাছে গীতার ব্যাখ্যা করতাম। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, ও-সবতো ব্যাখ্যা করতাম না। অর্জুনকে ভগবান যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা-ই ব্যাখ্যা করতাম। আমার কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি, যিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সারথি হয়েছিলেন। আমার কৃষ্ণ মহাযোগী, মহাত্যাগী, বিশ্বপ্রেমিক! ঐ জন্যেই তো আমি গীতার class করতে ভালবাসি, গীতা পাঠ করি।"

৩০শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে সেবক-শিষ্যকে কহিলেন, "মানুষ যত দিন দিন সভ্য হচ্ছে, তার মানে, তার মুখে এক, মনেতে অন্যভাব! জোচ্চোর হচ্ছে! এই সভ্যতা বিস্তারে মানুষ ধ্বংসের পথেই যাচ্ছে, উন্নতির পথে নয়। এর ফল বিষময়। এতে মানুষ প্রকৃত সুখের সন্ধান পায় না, শান্তি পায় না, পরিণামে অশান্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে মরে। গত যুদ্ধের সময় আমেরিকার রাষ্ট্রসচিব যখন যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, তখন আমেরিকার এক পাদ্রি, নাম তার Russel, তিনি যুদ্ধের বিরোধী। তিনি শান্তি-ভ্রাতৃভাবের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর শিষ্য George Rutherford নগরে নগরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আর শান্তির জন্যে ঘোষণা করতে লাগলেন। তিনি বললেন,—'যীশুখ্রীস্ট যুদ্ধ শেখাতে আসেন নি, তিনি এসেছিলেন সকলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে।' —কিন্তু যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘোষণা করায় American Government তাঁকে কুড়ি বছরের জন্য কারারুদ্ধ করলে। তারপর অবশ্য যুদ্ধের শেষে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিল।

প্রত্যেক nation-ই পরস্পর পরস্পরের প্রতি সন্দিহান হয়ে আপন আপন শক্তি বৃদ্ধি করছে। এদিকে মুখে সকলেই বলছে, 'আমাদের নৌ-বল হ্রাস করা উচিত। বর্তমান diplomacy-র দিনে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না। বলি, এই তো সভ্য যুগ!"

৯ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৩৭ সন। দার্জিলিং।

বৈকালে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ইটালি দেশের একজন সংস্কৃতের অধ্যাপক, প্রফেসার টুচি (Prof. Tucci) এবং তাঁহার স্ত্রী স্বামীজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। অধ্যাপক টুচি বর্তমান-তিব্বত সম্পর্কে authority. তাঁহারা বহুক্ষণ শাস্ত্রালাপ করিয়া চলিয়া যাইবার পর সেবক-শিষ্য স্বামীজী মহারাজকে কহিলেন,—"বেশ তো সরল! বিশুদ্ধ লোক।"

ইহার উত্তরে স্বামীজী মহারাজ কহিলেন, "পণ্ডিত লোক সরল হবে না তো কি হবে! ছাখ্, সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসেছে এদেশে আগম, শাস্ত্র, তন্ত্র, বেদ-বেদান্ত শিখতে। তোদের মত B. A. পাশ করবে note মুখস্থ করে? এদেশে সে পাঁচ বছর এসেছে, এর মধ্যে নেপালী, তিব্বতী, হিন্দী, সংস্কৃত,—এতগুলো ভাষা আয়ত্ত করেছে। বাংলাও পড়তে পারে, কথা কইতে পারে। বৌদ্ধতন্ত্র সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। আবার চীনা, জাপানী, তামিল, পালি ভাষাও জানে। সে ষোলটা ভাষা জানে। গেরস্ত হয়েও কি উদ্যম, কি energy!

ওদের দেশেও একজন সাধু হয়ে গিয়েছেন। তাঁর নাম Saint Francis. তিনি যীশুখ্রীস্টের চিন্তা করতে করতে, তাঁর হাতে-পায়ে পেরেকের দাগ হয়েছিল। তিনি যেখানে তপস্যা করতেন, সেখানে আমি গিয়েছিলাম,—Asseci (এসেসি)-তে। তিনি সর্বদা 'মেরী, মেরী' উচ্চারণ করতেন। একবার একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনার মেরীর ইচ্ছেয় কি শীতকালে গোলাপ ফুটতে পারে?' তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তাঁর ইচ্ছেয় সম্ভব হতে পারে। আশ্চর্য কি!' তারপর গোলাপ ফুটেছিল। সেই থেকে এখনও সেখানে বারো মাস গোলাপ ফোটে। চৈতন্যদেবের মত তাঁর ভাব হতো। তাইতে সাহেবটা বলছিল, 'আপনাদের চৈতন্যদেবের মত আমাদের Saint Francis মহাপুরুষ ছিলেন।"

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৩৭ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ জনৈক ভদ্রলোকের কথা কহিয়া কহিলেন, "দুঃখকষ্ট আসা ভাল। দুঃখকষ্ট না আসলে মানুষ শিক্ষা পায় না। মানুষ যত ধাক্কা খাবে, ততই শিক্ষা পাবে। জীবনে ধাক্কা খাওয়াই হচ্ছে ভগবানের আশীর্বাদ। মানুষ যখন সংসারে দুঃখকষ্ট পায় বা সর্বস্বান্ত হয়ে যায় তখনই সে ভগবানকে বলে, 'আমায় রক্ষা কর।' এর আগে সম্পদে সে ভুলে থাকে কি না! বাস্তবিকই জগতে দুঃখ নেই। সাংসারিক হিসাবে স্বার্থের ওপর আঘাত লাগলেই কষ্ট হয় বা অশান্তি পায়। অশান্তি না আসলে তো মানুষ শান্তিকে চায় না কিনা! এ হিসেবে অশান্তি আসা ভালই। অশান্তিতে মানুষ শান্তি পেতে ইচ্ছে করে।"

৭ই আষাঢ়, রবিবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে সুরেনবাবুর স্ত্রী দেশের সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া স্বামীজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনার কাছে পাঁচ হাজার যুবক যদি আজ উপদেশ নিতে আসে, তাহলে আপনি তাদেরকে কি বলবেন?"

ইহাতে স্বামীজী মহারাজ কহিলেন, "আমি তাদেরকে দেশ উদ্ধার করতে বলব। দেশকে যে ভালবাসতে পারে সে-তো ত্যাগী! দেশের কল্যাণের জন্য যে আত্ম-বলিদান দিতে পারে, সকল স্বার্থ ত্যাগ করে,—সে তো প্রেমিক।"

১০ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৩৭ সন। দার্জিলিং।

রাত্রি বার ঘটিকার সময় সেবক-শিষ্যের ঘুম পাইয়াছে দেখিয়া স্বামীজী মহারাজ তাহাকে বলিলেন,—"কিরে! ঘুমোচ্ছিস্ কেন? ঠাকুর বারো বছর ঘুমুলেন না, তপস্যা করেছিলেন। আর তোরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জীবন নষ্ট কচ্ছিস্! এই তো সাধন করবার সময়! বুড়ো হলে কি আর সে তপস্যা করতে পারবি? এই বয়সে যত ত্যাগ-তপস্যা করবি, বুড়ো হলে তত আনন্দ পাবি। তা' না হলে শেষে মনে করবি, জীবনটা বৃথাই গেল! নিজেকে ফাঁকি দিলে নিজেরই ফাঁকি দেওয়া হবে। না খাটলে কি কিছু হয়? নিজেকে খেটে নিতে হবে। কেউ কাউকে জোর করে কিছু করে দিতে পারে না। আমি খেলে কি তোর পেট ভরবে?

ঠাকুরই তোদের আদর্শ। আমরা তোদের আদর্শ নই! ঠাকুরের কথা বাদ দিয়ে বিবেকানন্দকে ধরলে কি হবে? বিবেকানন্দতো আদর্শ নয়! তাঁর শক্তিতেই তো স্বামীজী পৃথিবী জয় করেছিলেন। এখন থেকে কাম, ক্রোধ, লোভ জয় করবার চেষ্টা কর। ঠাকুর যে আদর্শ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, সেটাকেই আঁকড়িয়ে ধর। তা'হলে জীবনে শান্তি পাবি। আমি যখন তপস্যা করতাম তখন কি আর রাত্রিতে ঘুমোতাম? সমস্ত রাত্রি ধ্যান করে কাটাতাম। প্রথম প্রথম অবশ্য ঘুম আসত। তখন চোখ রগড়াতাম। ঘুমকে বলতাম, 'ঘুম, চলে যাও!' চোখে সরষের তেল দিয়ে ঘুম তাড়াতাম, বুঝলি! আমি চার ঘণ্টার বেশী তো ঘুমোই না! আমেরিকাতেও ঐ। একটার সময় শুতাম আর সাড়ে চারটার সময় উঠতাম। কলকাতায় বেশী ঘুম হয় না,—আড়াই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা ঘুমাই। এখানে বেশ ঘুম হয়।"

তারপর স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া কহিলেন, "এখন খাব আর ঘুমোব, এই আমার কাজ! এতকাল তো খাটলাম, এখন বিশ্রাম।"

৬ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৪৫ সন।

প্রাতঃকালে এগার ঘটিকায় পর স্বামীজী মহারাজ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়কে প্রাণ সম্বন্ধে কহিলেন, "এ জগতে যা কিছু দেখছেন, সবই প্রাণের স্পন্দন,—প্রাণেরই বিকাশ। এই প্রাণকেই জীবনীশক্তি বলে। এই প্রাণের ধ্বংস নেই!—ধ্বংসাতীত, অবিনশ্বর। এই প্রাণ বহু নয়,—একমেবাদ্বিতীয়ম্। যে প্রাণ বা জীবনীশক্তি আপনার ভেতর রয়েছে, সেই প্রাণ বা জীবনীশক্তিই আমার মধ্যে রয়েছে। সর্বত্রই এই একই প্রাণ রয়েছে।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ ঋগ্বেদ হইতে প্রাণ সম্বন্ধে আবৃত্তি করিয়া কবিরাজ মহাশয়কে শুনাইলেন,—

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো ন ব্যোমাপরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাসঃ॥
তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব মা ইদং।
তিরশ্চিনো বিততোরশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ॥
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ।
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ॥
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনে না থা কো বেদ যত আ বভূব।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥

—Before the manifestation of the phenomenal universe there was neither non-entity nor entity, neither atmosphere nor sky beyond. Death was not, nor therefore immortality, nor day and night. প্রাণের স্পন্দন রয়েছে, অথচ বায়ু নেই। That one breathed breathless by itself in essence. There was nothing different from it nor beyond it. From this germ burst forth mighty productive powers, nature below and energy above.

(Rig Veda X. Hymn 129)

১০ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪৫ সন।

রাত্রিতে আহারের পর শম্ভু মহারাজ ও ডাক্তারবাবু উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীজী মহারাজ—"পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন দার্শনিকদের দর্শনশাস্ত্র আর এদেশের ছয়টা দর্শন শাস্ত্র পড়ে তুমি কোন্ মতটা গ্রহণ করবে? বিভিন্ন দর্শন-শাস্ত্রের বিভিন্ন মত। কারো সঙ্গে কারো মতের মিল নেই। কোন্ মতটা তোমার আদর্শ হবে? তোমার সব গুলিয়ে যাবে। তখন কোন্ মতটা ঠিক, তা' ধরতেই পারবে না। এ অবস্থায় তখন পড়া বন্ধ করে নিজে স্বাধীন চিন্তা কর। চিন্তা করে যা বুঝতে পারবে, সেই ঠিক মত বা আদর্শ। আমি যখন নানা শাস্ত্র পড়ছিলাম তখন আমারও এই অবস্থা হয়েছিল। আমি দেখলাম, কোন শাস্ত্রের মতের সঙ্গে অন্য কোন শাস্ত্রের মতের মিল নেই। তখন বই বন্ধ করে দিলাম। নিজে চিন্তা করতে লাগলাম। নিজের স্বাধীন চিন্তা দ্বারাই তত্ত্ব উপলব্ধি হল, বুঝলে!"

১০ই পৌষ, সোমবার, ১৩৪৫ সন। দার্জিলিং।

নরেন ভাই, ডাক্তার বাবু, দার্জিলিং-এর ডাক্তার মহারাজ, দেবেন দা, উমানন্দ মহারাজ, বিশুদ্ধ মহারাজদের আগামীকল্য সন্ন্যাস হইবে; তাহাতে স্বামীজী মহারাজ গভীর রাত্রিতে তাহাদিগকে কহিলেন,—"তোমাদের ভাবতে হবে তোমরা মরা! তোমাদের ত্রিজগতে কেউ নেই। নিজের শরীর-জ্ঞান ভুলে যেতে হবে।—তারপর তোমরা ধ্যান করবে, তোমরা ব্রহ্মস্বরূপ! এই হচ্ছে বৈদিক সন্ন্যাস। এ যে ঠিক ঠিক করতে পারে, সে তখনই মুক্ত হয়ে যায়।"

২৯শে মাঘ, রবিবার, ১৩৪৫ সন।

স্বামীজী মহারাজ—"তুমি যা জান, তাই লোককে শিক্ষা দিবে। নির্ভীক চিত্তে বলবে। ভয় কি? তোমার ভেতর অনন্ত শক্তি রয়েছে।"

৩রা ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৪৫ সন।

সন্ধ্যার সময় স্বামীজী মহারাজ সিস্টার শিবানী, ধীরেনবাবু, পশুপতিবাবু, সুরেশ, যোগেন দা, ধীরেন পাল ও অন্যান্য ভক্তদিগকে কহিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর ত্র্যহস্পর্শ, অশ্লেষা, মঘা, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, বৃহস্পতির বারবেলা. মাস পয়লা, অগস্ত্যযাত্রা মানতেন, আর ভাদ্রের, পৌষের, চৈত্রের সংক্রান্তিও মানতেন।"

১৩ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৪৫ সন।

রাত্রিতে আহারের পর স্বামীজী মহারাজ বলিলেন,—"এই জগৎটা হচ্ছে শিক্ষাকেন্দ্র,—schooling. সংসারে সুখ নেই,—এক আনন্দ ব্রহ্মজ্ঞানে।"

১৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৫ সন।

রাত্রিতে আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন, "আমার কোন বাসনা নাই। এই আশ্রম শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে দেবোত্তর করে দিয়েছি। এখন সব তাঁর। আমার আর কোন আশ্রম করা, কি অন্য কোন কাজ করা,—সে বাসনা নাই। বাসনা থাকলেই জন্মাতে হবে। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের যদি এ শরীরকে দিয়ে তাঁর কাজ করাবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন, আর তা' না হ'লে মেরে ফেলবেন। তিনি যা করবেন, তাই হবে। আমার নিজের কোন ইচ্ছা নাই। এখন আমার ভাব হচ্ছে,—"প্রভু, মৈঁ গোলাম, মৈঁ গোলাম, মৈঁ গোলাম তেরা।"

১লা বৈশাখ, শনিবার, ১৩৪৬ সন।

সেবক-শিষ্যের গর্ভধারিণী জননী দক্ষিণাকালী বসু নববর্ষ উপলক্ষে দ্বিপ্রহরে বেদান্ত মঠে প্রসাদ পাইবার পর স্বামীজী মহারাজের অফিস-ঘরের বারান্দায় আসিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। স্বামীজী মহারাজ তখন খাইতে বসিবেন, এমন সময় দক্ষিণাকালী দেবী স্বপ্ন দেখিলেন,—শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী সরু পাড়ের কাপড় পরিয়া বসিয়া আছেন। খুব জ্যোতির্ময় মূর্তি। জ্যোতি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। দক্ষিণাকালী দেবীকে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী বলিতেছেন,—"ওঠ্, এখন ঘুমোস্ নি।"

দক্ষিণাকালী দেবী খুব ঘুমাইয়াছেন,—উঠিতে চাহেন না। তখন শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী আবার বলিতেছেন,—"ওঠ্, ওঠ্, এখন আর ঘুমোতে হবে নি! জানিস্‌নে—ওর (স্বামীজী মহারাজের) এখন খাবার সময় হয়েছে! খাবার সময় ঘুমোতে নেই।"

তখন দক্ষিণাকালী দেবী উঠিয়া বসিলেন এবং শুনিতে পাইলেন যে স্বামীজী মহারাজ বঙ্কিম মহারাজকে ডাকিতেছেন।

স্বামীজী মহারাজ এই স্বপ্ন সম্পর্কে পর দিবস, ২রা বৈশাখ, রবিবার,

১৩৪৬ সন, প্রাতঃকালে সেবক-শিষ্যকে বলিলেন, "তোমরা তো বেশ! কাল অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেছে! আশ্চর্য! এর অর্থ কি?"

২৬শে এপ্রিল, ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ ; সন্ধ্যা।

স্বামীজী মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "Congress-এ এখন young blood চাই। সুভাষ বাবুতো যোগী, সন্ন্যাসী, ত্যাগী। Gandhi-র এখন মানে মানে retire করা উচিত।"

১৯শে বৈশাখ, বুধবার, ১৩৪৬ সন।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। ভগবান তথাগতের পূজার পূর্বে সেবক-শিষ্য তাহার পরম দেবতার পূজা করেন। প্রথমে সেবক-শিষ্য স্বামীজী মহারাজের গলায় বহুবিধ মাল্য প্রদান করেন এবং পরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পদ্ম ও অন্যান্য পুষ্প, বিল্বপত্র দিয়া অঞ্জলি প্রদান করেন। সেবক-শিষ্যের অঞ্জলি প্রদানের সময় স্বামীজী মহারাজ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমিই বুদ্ধ, আর তুই সম্বুদ্ধ।" অতঃপর তিনি হাসিয়া সেবক-শিষ্যকে কহিলেন, "আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। এই শুভ দিনে আমি আশীর্বাদ করছি,—তোর জ্ঞান লাভ হোক্, বোধি লাভ হোক্, ভক্তি-বিশ্বাস হোক্, তুই মনের আনন্দে থাক্।"

তারপর স্বামীজী মহারাজ আশুদাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আশু, ছাখো, রবি আমাকে কেমন সুন্দর পূজা করেছে।" তৎপর আশুদা, চণ্ডীদা, নগেনদা, বঙ্কিম মহারাজ, সুরেশ, জগন্নাথ ও কালীপদ একে একে পদ্মফুল দিয়া স্বামীজী মহারাজের চরণে অঞ্জলি প্রদান করিলেন এবং সকলে সমবেত কণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরুস্তব পাঠ করিলেন।

২০শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৬ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—"তোর বুদ্ধের উৎসব বেশ সুন্দর হ'ল। তুই এত পরিশ্রম করে করলি, এতে আমি খুব সন্তুষ্ট। তুই ধন্য! আমি কর্মযোগী। জীবনে কত কাজ করেছি। কাজ করতে ভালবাসি। এই অসুখ অবস্থায় তো দেখ্ছিস, কত কাজ করছি। যে কাজ করে, তাকে আমি ভালবাসি। যে কাজ করতে ভয় পায়, ফাঁকি করে, তাকে আমি ভালবাসিনে।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ আনন্দের সহিত হাসিয়া কহিলেন, "এই বুদ্ধের উৎসব করে তুই একটা কীর্তি রাখলি।"

৩০শে বৈশাখ, রবিবার, ১৩৪৬ সন।

রাত্রিতে আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ বলিলেন, "মানব, পশু-পক্ষী, জীবজন্তু,—এদের পাশব প্রবৃত্তি বিচিত্র। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সমাজের আচার পদ্ধতিও বিভিন্ন।

কাকের একটা গুণ আছে যে, নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে সে সহবাস করবে না। কাক নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে। নিজের স্ত্রীর কাছে শোবে, নিজের বাসায় থাকবে,—অন্য স্ত্রী-কাকের বাসায় থাকবে না।"

সেবক-শিষ্য—"বাঃ! সুন্দর গুণ তো!"

স্বামীজী মহারাজ—"গুণ বৈকি! পায়রার এ গুণ নেই। মদ্দা পায়রা স্ত্রী পায়রা দেখলেই ধর্ষণ করবে। ঐ জন্যেই মদ্দা পায়রা সর্বদা বক্ বকম্ করে ডাকে। ছাগলের মধ্যেও দ্যাখো, যে বাচ্চা সে মাকেই রমণ করছে! গরুর মধ্যেও এ ভাব! মানুষের মধ্যে দ্যাখো, আরব দেশে পূর্বে ছেলে তার মাকে রমণ করতো! পার্লামেন্টের মেম্বার, ঘরে তাদের সুন্দরী স্ত্রী আছে! তবু তারা Boy hunter,—বিপথগামী!

সমাজ-তো আর আপনা-আপনি হয়নি। মানুষই সমাজ গড়েছে। এখানেই মানুষ বিবাহের ব্যবস্থা করল। পুরুষ বিবাহ করে এক স্ত্রীতেই রমণ করবে, স্ত্রীলোকও এক পুরুষকে সেবা করবে,—ব্যভিচার বন্ধ করে দিলে! একেই বলে সমাজবন্ধন। —এমনি করে সমাজ সৃষ্টি হল! আসলে সকল প্রাণীর ভিতরই এই পশুভাব রয়েছে—unlimited cohabitation. বিবাহ করা মানে, ফুল ফেলে দিয়ে সেই ফুলকে শুদ্ধ করে নেওয়া বই-ত নয়! এক হিসেবে বিচার করলে, বেশ্যাবাড়ী যাওয়া আর বিবাহিত স্ত্রীর কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য একই! কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থ করা।"

সেবক-শিষ্য—"তাহলে morality বলে কি কিছু নাই?"

স্বামীজী মহারাজ—"থাকবে না কেন? যে দেবপ্রকৃতির লোক, তাঁরই ভেতর morality আছে। তবে এই দেবপ্রকৃতি,—divine nature-তো আর এক জীবনে ফুটে ওঠে না! পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারে হয়। জীব তার নিজ কর্মানুযায়ী ভাব পায়। এ এক জীবনে হয় না। অনেক জীবন পোড় খেতে হয়।"

১২ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৪৬ সন।

রাত্রি প্রায় এক ঘটিকার পর স্বামীজী মহারাজ শম্ভু মহারাজ, আশুদা ও সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—"গেরস্তের দুয়ারে সকলকে যেতে হয়, হাত পাততে হয়। সেজন্যেই গার্হস্থ্য আশ্রম সকলের শ্রেষ্ঠ। গেরুয়া নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে কেউ কেউ নিজেকে ভাবে, আমি শ্রেষ্ঠ হয়েছি! এ অহঙ্কার ভাল নয়। সাধু হয়ে তুমি কি গেরস্তের মাথা কিনেছ যে, তোমাকে সকলে সম্মান করবে! আধুনিক সন্ন্যাসীদের চেয়ে অনেক গেরস্তও ঢের বড়।"

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৪৬ সন।

স্বামীজী মহারাজ—"লোকে তিন ভাবে শেখে,—ঠেকে, দেখে আর শুনে। শুনে শেখা সবচেয়ে ভাল, তারপর দেখে শেখা!

সংসারে মানুষের মন ভোগের দিকেই যায়। একবার ইন্দ্রিয় সুখের আস্বাদ পেলে তা' ছাড়তে পারে না। অভ্যাসের দাস হয়ে যায় কি না!

ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করে, তারপর কত দুঃখ-কষ্টে পড়ে হায় হায় করতে হয়, হাবুডুবু খেতে হয়, লেজে-গোবরে পড়ে যায়! তখন কিছু করতেও পারে না। উপায় নেই! —একেই বলে সংসার! সংসারে কিছু সুখ নেই। এই সংসারের সুখের নেশায় লোকে ছুটে বেড়াচ্ছে!"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া কহিলেন,—"তাহলে শৈলেশের বিয়ে হয়ে গেল! এখন আমড়ার আঁটি চুষুক! আমড়ার আঁটিতে আছে কী? ওর বাবা আমাকে আশীর্বাদ করতে লিখেছে। আশীর্বাদ কি করবো? এক আত্মাকে বন্ধনে জড়িয়ে দেব, এই কি আমাদের ইচ্ছে? আমরা বন্ধন কাটতে এসেছি। বন্ধন মুক্ত করে দেব!"

১২ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৪৬ সন।

স্বামীজী মহারাজ—"জীবকোটী ঈশ্বরকোটী হতে পারে যদি সে শক্তির নিকট প্রার্থনা করে।"

সেবক-শিষ্য—"শক্তির কাছে প্রার্থনা না করেই জীবকোটী যদি সঙ্কল্প করে, তাহলেও তো সে ঈশ্বরকোটী হতে পারে! তাঁর সঙ্কল্পেই হবে!"

স্বামীজী মহারাজ "হাঁ, তা' পারে। সত্য সঙ্কল্পেই সত্যকাম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা তখন কি আমরা বুঝতে পেরেছিলাম? তিনি যা

বলেছেন, তাই সত্য! তাঁর কথা ব্যখ্যা করা উচিত নয়। তিনি যাকে যা বলেছেন, তাই সত্য।"

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৪৬ সন।

স্বামীজী মহারাজ—"সংসারে দেখি কেউ হেসে, স্ফূর্তি করে দুটো কথাও বলতে পারে না! আমি সারা জীবনটা হেসে আনন্দে স্ফূর্তি করে কাটাচ্ছি। হা-হুতাশ করে কি হবে! এই প্রায় দুই বচ্ছর অসুখে ভুগছি, তাতেও হাসছি। আমার কি কষ্ট হচ্ছে না? নিজের দুঃখকষ্ট অপরকে জানিয়ে কি হবে? সব সয়ে যেত হবে। অসুখ হেসে উড়িয়ে দিচ্ছি! এ অসুখ হলে কি কেউ বাঁচে? কঠিন ব্যাধি!"

১১

১২ই পৌষ, সোমবার, ১৩৩৯ সন।

স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"আমাকে অনেকে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে বলে। প্রবন্ধ লিখে কি করব! লেখালেখি আর ভাল লাগে না। শাস্ত্র থেকে সকলেই শ্লোক উদ্ধৃত করে। Devil even quotes from the Bible. শয়তানও বাইবেল থেকে quote করে আপন মত সমর্থন করবার জন্যে! সনাতনীরা যে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে নিজেদের মত সমর্থন করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! ভগবানের কাছে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নেই! তিনি সকলকে সমানভাবে দেখেন।

Sanatan Hindu Dharma always advocates Suddhi or conversion of non-Hindus into Hinduism and friendliness among all castes. Some of the narrow-minded, conservative, orthodox Hindus might object to such ideas and might not allow the new converts to associate with them freely. But time has come when those who wish to enter into Hindu Community should find open door there and should be encouraged in every possible way. All men and women irrespective of caste, creed or nationality should be regarded as children of Immortal Bliss, as *Narayana* and if this idea is preached among the masses, then *Maitri* or friendliness will be established among members of all castes, and it will give a death blow to communal troubles.

We are glad to know that the Hindu Mission has undertaken this task and hope that by the will of the Almighty its noble efforts will be crowned with success.

Swami Abhedananda.

১২ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

জনৈক গুরুভ্রাতার ঈশ্বর দর্শন হয় না, তাহাতে তাহার মনে দুঃখ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া স্বামীজী মহারাজ বলিলেন,—"ঈশ্বর দর্শন কি একটা পুতুল খেলা! তাঁর দর্শন পাওয়া সোজা কথা নয়! সত্য, সরলতা, বিশ্বাস চাই। তার দর্শন হলো না, সেজন্যে কি আমি দায়ী? নিজের বিশ্বাস, ভক্তি নেই, কেমন করে দর্শন হবে! কেউ কাউকে দর্শন করিয়ে দিতে পারে না। নিজেকে চেষ্টা করে নিতে হবে। অধিকারী হলে আপনিই ঈশ্বর লাভ হবে।

ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতে হবে! সেই ব্যাকুলতা তার কই! ভগবানের দর্শনের জন্যে তীব্র ইচ্ছেকেই ব্যাকুলতা বলে। ব্যাকুলতাকেই তপস্যা বলে। তপস্যা মানে এই নয় যে, সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে ছত্রে ভিক্ষে করে খেলাম! ব্যাকুলভাবে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে অভ্যাসকেই তপস্যা বলে। সাধন-ভজন করা কি সোজা রে? তিনটে জিনিস চাই,—সেবা, বন্দি আউর অধীনতা! সেবা করতে হবে প্রিয়তমকে, নিজেকে ভুলে; বন্দি—তাঁর বন্দনা করতে হবে; আর অধীনতা—গুরুর আজ্ঞা পালন করতে হবে মনপ্রাণ দিয়ে। আর, কাজ করবে না! কর্ম না করলে কি চিত্ত শুদ্ধ হয়? "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"—নিষ্কাম কর্ম! চালাকি করে ধর্ম হয় না!"

তারপর স্বামীজী মহারাজ গান গাহিতে লাগিলেন,—

"হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাকি হে তোমারে॥
আমি আগে এসে ঘাটে রইলাম বসে;
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে।
শুনি কড়ি নাই যার, তুমি তারেও কর পার,
আমি দীন ভিখারী নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে!

—এ মহাজনী গান। কেমন সুন্দর উচ্চ তানে খেদ করে গাইছে।

১২ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৩১ সন।

সন্ধ্যার পর স্বামীজী মহারাজ তপস্যা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। অতঃপর হাসিয়া হাসিয়া সানন্দে নারদ পঞ্চরাত্রের কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
বিরম বিরম ব্রহ্মন কিং তপস্যাসু বৎস।
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুং॥
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাং।
ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তরীঞ্চ॥"

—আবৃত্তিশেষে স্বামীজী মহারাজ প্রজ্ঞানানন্দজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তপস্যা করবি কি? নারদ তপস্যা করছিলেন, এমন সময় দৈববাণী হল, 'হরিকে যদি আরাধনা করা যায়, তাহলে তপস্যার কি প্রয়োজন? আর হরিকে যদি না আরাধনা করা হয়, তাহলেই-বা তপস্যার কি প্রয়োজন? হরি যদি অন্তরে বাহিরে থাকেন, তাহলেই-বা তপস্যার কি প্রয়োজন? আর হরি যদি অন্তরে বাহিরে না থাকেন তাহলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? অতএব, হে ব্রহ্মন, বিরত হও। বৎস, তপস্যায় কি প্রয়োজন? জ্ঞানসিন্ধু শঙ্করের কাছে গমন কর। বৈষ্ণবেরা যে হরিভক্তির কথা বলেছেন, সেই সুপক্কা হরিভক্তি লাভ কর, লাভ কর। এই ভক্তি,—এই ভক্তি দ্বারা ভব-নিগড় ছেদন হবে,—ভক্তি-কাটারি দিয়ে ছেদন হবে। হরিভক্তি না হলে কিছুই হবে না।"

সুধন্যদাদা, পূর্ণানন্দজী এবং অন্যান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সুধন্যদাদা স্বামীজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ধর্মরাজ্যের চাবি কি?"

স্বামীজী মহারাজ—"Faith. একমাত্র বিশ্বাস। মনেতে কোন সন্দেহ উঠবে না। Doubt is destructive, faith is constructive. ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।' তবে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন যে, "আমার কাছে চাবিকাঠি রইল। এই কথা তিনি যখন স্বামীজীকে বলেছিলেন, তখন আমি নিকটেই ছিলাম। —ও কথার মানে এই,

—স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধিতে থাকতে চেয়েছিলেন, কোন কর্ম করবেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন, 'তোকে আমার কাজ করতে হবে। আমার কাছে চাবিকাটি রইল।' শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাজের জন্যেই স্বামীজীকে জগতে এনেছিলেন।

আমায় কেউ কেউ বলে, 'আমার কিছু হল না! আমার দীক্ষা হল, ব্রহ্মচর্য হল, সন্ন্যাস হল, আমি যেই-কে সেই! মনেতে শান্তি পাচ্ছি না!' —আমি কি লোক ঠকাতে বসেছি? ব্যবসা কচ্ছি? দীক্ষার সময়ইতো আত্মসমর্পণ করিয়ে দেই। আমি যেইটি কচ্ছি, তোমাদেরও সেইটি শিখিয়ে দিচ্ছি, তোমরাও কর,—শান্তি পাবে। আর, যদি নাক টিপে জ্যোতি-দর্শন করতে চাও, তাও শিখিয়ে দিতে পারি। আমি তো সবই সাধনা করেছি। এই আত্মসমর্পণের চেয়ে বড় আর কিছু নাই। তোমরাও আমার মত কর, শান্তি পাবে। যদি না-পাও, তা'হলে আমায় তখন বলো! এইটি রোজ অভ্যাস কর,—আমি দেহ, তুমি দেহী; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী! হাততালি দিয়ে হরিনাম কর। যেমন গাছেতে পাখী বসে আছে, হাততালি দিলে পালিয়ে যায়,—এই দেহরূপ বৃক্ষে পাপরূপ পাখী বাস করছে; হরিনাম কর, পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু! আমি না, আমি না,—তুমি, তুমি! ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান্! এইরূপ নাম কর। শ্রীশ্রীঠাকুরও এইরূপ করতেন। আর, সব কাজই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ মনে করে করবে। কাজ করবে, কিন্তু মনেতে একটা ভাব রাখবে,—under current, ফল্গুধারার মত। আমি ভগবানের সন্তান, তাঁর দাস। আর যারা জ্ঞানী, তারা সোঽহং সোঽহং ভাববে। আমিই সেই, আমিই সেই! একদিন হয়ত মন খুব উঁচুতে উঠেছে, আর একদিন হয়ত নীচে নেমে গেল,—তখন নিজে মনে জোর এনে নিজেকেই উদ্ধার করতে হবে,—"উর্ধ্বরেতাত্মনাত্মনং অবসাদয়েৎ"। এই হচ্ছে সহজ সরল পথ।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ গাহিতে লাগিলেন,—

"অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে তারে সুধান কষাই।
শুগা পরাইয়ে গণিকা তারে তারে মীরাবাঈ॥
হরিসে লাগি রহ রে ভাই,
তেরা বনত বনত বনি যাই।
তেরা ঘসর পসর মিটি যাই,
তেরা বিগড়ি বাত্ বনি যাই

এইসি ভক্তি কর ঘট ভিতর
ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা, বন্দি আউর অধীনতা,
সহজ মিলি রঘুরাই।"

—অবশেষে কহিলেন, "কপটতা ছাড়তে হবে, সরলভাবে ঈশ্বরকে ভজনা করতে হবে, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর এগানটা গাইতেন। লাটু মহারাজও এই গানটা গাইতেন।"

সেবক-শিষ্য—"আমরা সান্ন্যাল মশায়ের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে একটি ঘটনা বললেন,—বোধহয় আপনিও জানেন। আমরা যখন সান্ন্যাল মশায়ের কাছ হতে চলে আসছি, তখন আমি তাঁর বিছানা ঝেড়ে আসছিলাম। আমার পায়ের ধূলা তাঁর বিছানায় পড়েছিল। আমি বিছানা ঝাড়ছিলাম,—তাই দেখে তিনি বললেন,—'ও কি বাবা! বিছানা ঝাড়ছ কেন? তোমরা আমার ঘরে এসেছ, আমি ধন্য হয়েছি। তোমাদের চরণ-ধূলো পড়েছে, তাতে আর কি হয়েছে? একটি গল্প বলছি, শোন! কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীঠাকুরের তখন অসুখ! সেই সময় কালীভাই, আমি আর গিরিশবাবু উপস্থিত ছিলাম। এ ঘটনা আর কেউ জানে না! শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশবাবুকে উপদেশ দিচ্ছেন,—'তোমরা এখানে আসছ, তোমরা ভগবানের নাম কি করলে? নারদ ব্রহ্মসমুদ্রে না পৌছাতেই দূর থেকে তার শব্দ শুনেই সে ঈশ্বরের নামে, হরিনামে মেতে রয়েছে। শুকদেবও সেখানে পৌছাতে পারে নি। সে-ও জ্ঞানী হল। আর শিব ব্রহ্মসমুদ্রের তিন গণ্ডুষ জল পান করে আত্মস্থ হয়েছেন!' এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখ দিয়ে একটু রক্ত পড়ল, কাশের উদ্রেক হল। তখন গিরিশবাবু জোড়হাত করে বললেন,—"ক্ষ্যান্ত থাকুন মশাই, ক্ষ্যান্ত থাকুন! আপনি আর কথা কইবেন না।"

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "তোমাদের একজনেরও যদি আমার উপদেশে উপকার হয়, তাহলে এমন বিশ হাজার শরীর দিতে পারি।"

তখন গিরিশবাবু বললেন, 'আমার মাথায় অত জ্ঞানের উপদেশ ঢুকবে না। পরাভক্তি কাকে বলে, আমায় তাই বলুন।"

শ্রীশ্রীঠাকুর অমনি, আমরা যেখানে বসেছিলাম, সেখানকার ধূলা মাথায় নিয়ে ভগবানের নামে সমাধিস্থ হলেন। তারপর অর্ধভাবাবস্থায় বললেন, —'ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান্ এক!—একেই বলে পরাভক্তি।"

১৬ই পৌষ, শনিবার, ১৩৩৯ সন।

প্রাতঃকালে ফরিদপুরের শিশির দাদা, তাঁহার স্ত্রী ও ভাই এবং তাঁহার ভাগিনেয় স্বামীজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। শিশির দাদা এবং তাঁহার ভাগিনেয় 'ঈশ্বর কি', এই সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতেছেন। স্বামীজী মহারাজ চুপ করিয়া সব শুনিতেছেন।

স্বামীজী মহারাজ শিশির দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঈশ্বর বল্‌তে কি বোঝ? Conception কি? G, O, D,—God কোন পদার্থ আছে? আছে, কি না-আছে, বিচার করে লাভ কি? একটা কিছু আছে, মনে করে নাও। এই ব্যষ্টিই সমষ্টি হয়েছে, একেই বলে ঈশ্বর। জীব ব্রহ্ম হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর হতে পারে না। ঈশ্বর যে শক্তির সঙ্গে খেলা করছেন, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হচ্ছে, ঐ শক্তি ঈশ্বরের অধীন; তবে জীবের পিছনে সেই অনন্ত শক্তি আছে। ব্রহ্ম,—দেশ-কাল-নিমিত্তের পারে! মানুষের মন সীমাবদ্ধ, অসীমের (Infinite) চিন্তা করতে পারে না। সেইজন্যই দ্বৈতভাব নিতে হয়। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। নারদসূত্রে আছে, ঈশ্বর প্রেমের স্বরূপ। God is Love. Children love each other. বুদ্ধের কি প্রেম দেখ! জগতে বুদ্ধের মত প্রেম দেখা যায় না। যীশুখ্রীস্টের চেয়ে তার প্রেম বড় ছিল,—ছাগলের জন্য নিজের জীবন বলি দিতে গিয়েছিলেন। অদ্ভুত! শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেম আরও বড় ছিল। ঘাসকে পর্যন্ত তিনি ভালবেসেছেন। ঘাসের উপর দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে তিনি বুকে ব্যথা পেতেন। ঘাসের তো প্রাণ আছে!—জগতের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, এক প্রাণ, এক আত্মা!"

শিশিরদা—"কেউ কেউ এসব বিশ্বাস করে না!—বলে, Pious Fraud."

স্বামীজী মহারাজ—"সে বিশ্বাস করুক, বা না-ই করুক, এ-ই সত্য! বিদ্যার অহঙ্কার থাকতে এসব বুঝতে পারবে না! অহং-জ্ঞান রয়েছে কিনা! গীতার এই শ্লোকের মানে কি, তাকে জিজ্ঞেস করো।—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

—সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করা, আত্মায় সর্বভূত দর্শন করা এবং সমদর্শী হওয়া চাই।

—তপস্যা করতে বলো! তপস্যা না করলে এসব বুঝতে পারবে না।"

শিশিরদা স্বামীজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর যে মা-কালীর

ভোগ খেয়েছিলেন আর খাটে শুয়েছিলেন, বিড়ালের সঙ্গে মা-কালীর ভোগ খেয়েছিলেন,—এটা কোন্ অবস্থা ?''

স্বামীজী মহারাজ—"অভেদ ভাব। এই অবস্থায় মা-কালীর খাটে শুয়ে থাকা আর শিবলিঙ্গের উপর পা দেওয়া সমান। অন্তঃ-বহিঃ হরি দর্শন করে কি না!"

স্বামীজী মহারাজ অতঃপর শিশিরদাদাকে বলিলেন,—"আমিও তোমার মত কিছু বিশ্বাস করতাম না। এখন আমি কিছুই উড়িয়ে দিতে পারি না। আমিও শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলেছিলাম,—'আমি অন্ধবিশ্বাস চাইনা।' তিনি আমায় বলেছিলেন,—'তুই সব জান্‌বি!' তাঁর কৃপায় আমার বিশ্বাস হয়েছে, কোন কিছু অবিশ্বাসের নাই। এ দেহকে তিনি যথেষ্ট জ্ঞান দিয়েছেন। মানুষের জ্ঞান একটু, অল্পবুদ্ধি! সেই মাপকাঠি দিয়ে সব মাপতে যায় কি না!"

তারপর স্বামীজী মহারাজ বলিলেন,—"আমরা যে সময় এসেছি, সেই যুগে অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, পওহারী বাবা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেশব সেন, স্বামীজী,—এঁদের সকলকেই দর্শন করেছি। এঁদের সঙ্গ করে আমাদের জীবন সার্থক হয়ে গেল।"

সন্ধ্যার সময় শিশির দাদার মা স্বামীজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি স্বামীজী মহারাজকে দেখিয়া ভক্তি-গদগদভাবে বলিলেন, "আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।"

স্বামীজী মহারাজ তাহা শুনিয়া বলিলেন,—"আপনি আমাকে দর্শন করতে এসেছেন! সে কি! আপনি যে জগন্মাতা! আমি যে আপনার সন্তান! আপনি শিশিরের মা,—আমারও মা!"

সন্ধ্যার পর সেবক-শিষ্যের মা, দক্ষিণাকালী বসু মহাশয়া স্বামীজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "সংসার মানেই তো যাতনা। কর্মফল সকলকে ভোগ করতে হবে! আশীর্বাদ করছি,—সুখে থাক, মনেতে আনন্দ পাও, মনের শান্তিতে থাক। মৃত্যুকামনা করা উচিত নয়!"

রাত্রিতে আহারের পর স্বামীজী মহারাজ এক কাঠিদাস বাবাজির কথা বলিলেন,—

—"যদবধি নিজ দেহে না দেখিবে ভাই,
কাশী যাও, মক্কা যাও, কিছু হবে নাই।
চারদিকে চার হীরের ঝুরি, মধ্যিখানে লাল,
আজগুবি তায় দুনিয়াদারী, আজগুবি তার ফল।
হরিবোল, হরিবোল।"—

এই বলে দুইটি কাঠি বাজিয়ে তিনি গান গাইতেন। আমরা তখন বরানগর মঠে থাকতাম। স্বামীজীর কাছে তাঁর কথা শুনেছিলাম। তিনি শ্যামবাজারে থাকতেন। তাঁকে অনেক লোক দেখ্‌তে যেত। আমরাও একদিন তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। তিনি নিজের বিষ্ঠা-মূত্র খেতেন।"

১৪ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৯ সন।

প্রাতঃকালে শ্রীচারুচন্দ্র বসু মহাশয় স্বামীজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজের সহিত চারুবাবুর বৌদ্ধদর্শন ও বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। পরিশেষে স্বামীজী মহারাজ তাহাকে কহিলেন,—"একমাত্র শঙ্করাচার্যই বৌদ্ধদর্শনকে খণ্ডন করেছেন। বৌদ্ধদের ক্ষণিকবাদ টেঁকে না। বেদান্ত খণ্ডন করেছে। বৌদ্ধদর্শনকে এই জায়গাতেই আক্রমণ করেছে। শূন্য শূন্যকে কেমন জানে? শূন্যকেই বা কে জানছে? জ্ঞাতা কে? একজন যখন জান্‌ছে তখন শূন্য বলি কি করে? বৌদ্ধদর্শনের চেয়ে বেদান্ত deeper. বেদান্তে যুক্তি আছে। বেদান্তই সার্বজনীন ধর্ম।"

চারুবাবু—"আচ্ছা, বুদ্ধদেব নিজে বুঝেন নি,—সেই? না,—প্রকাশ করলেন না!"

স্বামীজী মহারাজ—"বুদ্ধদেব শিষ্যদের কিছু বলেননি আত্মা সম্বন্ধে। তিনি শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন, 'আর্যসত্য পালন কর, তৃষ্ণা বা বাসনার নাশ কর, তাহলে নির্বাণ লাভ করবে।' তিনি নির্বাণ লাভ করেছিলেন। নির্বাণ অবস্থায় কি আর বলবেন,—আছে বলতে পারি না, নাই-ও বলতে পারি না। —তা' তিনি বলেছিলেন। আমাদের উপনিষদে রয়েছে, যে বলে আমার হয়েছে, তার হয়নি; যে বলে, আমার হয়নি, তার জ্ঞানলাভ হয়েছে! বুদ্ধদেব নির্বাণের আনন্দ উনপঞ্চাশ দিন অনুভব করেছিলেন। এই উনপঞ্চাশ দিন আহার করেন নি, নিদ্রা যান নি। কম কথা! কেবল আনন্দ! আমাদেরও এই

সমাধিতে আনন্দ ! এই অবস্থার কথা কি মুখে প্রকাশ করা যায় ? বাক্যমনের অতীত ! তা' নির্বাণ আর সমাধি একই !"

স্বামীজী মহারাজ রাত্রিতে সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,— "তুই ঠিক বলেছিস্। ভাস্করানন্দ স্বামী যাকে-তাকে সন্ন্যাস দেন নি। দুই-একজনকে দিয়েছেন। কেউ অধিকারী নয়, তবু আমি এদের ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস দিই যদি কল্যাণ হয়,— এই উদ্দেশ্যেই দিই। যদি ভাল না হয়, সে দোষ কি আমার ?"

সেবক-শিষ্য—"বুদ্ধদেবের এক শিষ্য তাঁকে দেহ, আত্মা আর জগতের নিত্যানিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। বুদ্ধদেব কোন উত্তর দেন নাই। সেই শিষ্য একদিন উত্তেজিত হয়ে বললেন. 'আপনি যদি প্রশ্নের মীমাংসার বিষয় না জানেন, তবে আপনি আমায় খুলে বললেই হয় যে, আমি এসব বিষয় জানিনা !' বুদ্ধদেব তখন শান্তভাবে তাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে বলেছি যে তুমি আমার শিষ্য হও ! আমি কি কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে !" এই কথা বলাতে সে চুপ হল। তার মন অন্তরের দিকে যেতে লাগল, সে সমাহিত হল। বুদ্ধদেব তাকে বললেন, 'তুমি আহত হয়েছ, আমার কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছ, আমি তোমায় আরোগ্যের উপযুক্ত ঔষধ বলে দিয়েছি। আমি যা প্রকাশ করিনি, তা' অপ্রকাশিত থাকুক —যা ব্যক্ত করেছি, তা প্রকাশিত হোক্।

একটি লোকের পায়ে বিষাক্ত বাণ বিদ্ধ হয়েছে। তার আত্মীয়েরা ভাল চিকিৎসক এনেছে। যদি সেই আহত লোকটি বলত,—"আগে আমাকে বল, কার বাণে আমি আহত হয়েছি ! যে বাণ মেরেছে সে লোকটা কে ? তার কি জাত ? কি নাম ? নিবাস কোথায় ? বাণটাই-বা কোন্ রকমের বাণ ?"— এই সব প্রশ্নের উত্তরে কোন লাভ আছে ? ফলে এই হ'ত যে, কথা কইতে না-কইতে সেই লোকটি মারা যেত !'—এই সব কথা বুদ্ধদেব তাকে শান্তভাবে, সস্নেহে বলাতে তার সংশয় দূর হল। সেই শিষ্যটি শান্ত হল।"

স্বামীজী মহারাজ—"যোগবাশিষ্ঠে আছে, শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞেস করলেন,—'মায়া কি ?' তিনি বললেন, 'আগে মায়াকে কাট। তারপর জানতে পারবে মায়া কি ? সাপে কামড়িয়েছে, আগে বিষ বার করতে হবে তো ? তা' না করে যদি বল,—সাপটা কোথা হতে এলো, কি জাতের সাপ ? —এদিকে বিষ মাথায় উঠে গেলে যে কালগ্রাসে পতিত হবে ! সাপে কামড়িয়েছে, তৎক্ষণাৎ বিষ বার করতে হবে, তবে তো বাঁচবে। সেই রকম

গুরু আর বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস রেখে সাধন করতে হবে। অবিদ্যা দূর হলেই জ্ঞানসূর্যের উদয় হবে।"

রাত্রিতে আহারের পর স্বামীজী মহারাজ আপন মনে গান গাহিতে লাগিলেন,—

"কপালে যা আছে কালী,
তাই যদি হবে।
শ্রীদুর্গা, জয়দুর্গা বলে
কেন ডাকি তবে॥
কপালে যা লিখেছে বিধি
তাই বল বল যদি
শিব তবে সত্যবাদী!
কেমনে সম্ভবে॥"

স্বামীজী মহারাজ আবার গাহিতেছেন,—

"রণেতে নাচিতে মায়ের
রাঙ্গা পায়ে বেজেছে গো!
ব্যথার ব্যথী কেউ নাই হে যে,
মহেশ হৃদে ধরেছে গো!
কি জানি কি ঘটেছিল,
এ দাস ভেবে সারা হল,
মায়ের কাঁচা সোণার বরণ ছিল,
এবার কালি হয়েছে গো॥"

গান শেষে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—"এ গানটা যখন দুর্গাবাবু গাইছিলেন, আমার তখন মনে হচ্ছিল, যেন আমাকে লক্ষ্য করেই তিনি গাইছেন।"

৩রা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ একটি মেয়ের বিষয়ে অনেক কথা কহিয়া, নারীচরিত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "তোরা কখনো মেয়েদের সঙ্গে যেচে আলাপ করবি না। সাধু-ব্রহ্মচারীদের মেয়েদের সঙ্গে যেচে আলাপ করা ঠিক নয়। এতে তাদের দুর্ণাম হয়। মেয়েদের সঙ্গে যে বেশী

ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়েছে, তারই পতন হয়েছে। কামজিৎ হওয়াতো সোজা কথা নয়! মেয়েদের সাক্ষাৎ জগদম্বার অংশ বলে জানবি।

তোরা নিজেদের বাঁচাবার জন্য মেয়েদের সংস্পর্শ থেকে তফাৎ থাকবি। তাই বলে আমি মেয়েদের ঘেন্না করতে বলছি না। সংসারে ঘৃণিত বস্তু কি? কামিনী আর কণক। তা' না-হলে কি শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'দ্বারং কিমেকন্নরকস্য নারী?" নরক, পতনের একমাত্র দ্বার কি? রমণী। জীবগণের বন্ধনশৃঙ্খলস্বরূপ কে? রমণী। সংসারে কি জ্ঞাত হওয়া সকলের পক্ষেই কঠিন? রমণীর মন আর চরিত্র। তা' সাদা চামড়াই হোক, আর কালোই হোক। সব দেশেই মেয়েদের মন এক। সকল মানুষের প্রবৃত্তি এক। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'মেয়েদের সাত থাক মন। কখন কোনভাবে কথা বলে, তা বুঝা কঠিন। ভক্তিতে কেঁদে ধূলায় গড়াগড়ি গেলেও বিশ্বাস করতে নেই! কত মুনিঋষির পতন হয়েছে! মুনির মন পর্যন্ত টলে যায়। বিশ্বামিত্র, পরাশর, বড় বড় সব তপস্বী! তাঁদের মন টলেছে,—আর তোরা কোন ছার!

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ছোট হরিদাসকে ত্যাগ করলেন, মেয়ে মানুষের কাছ থেকে ভিক্ষে নিয়েছিলেন বলে! তিনি এত কড়াকড়ি করেছিলেন, তবুও দ্যাখ, বৈষ্ণব ধর্মের কি অবস্থা! শঙ্করাচার্যতো কোন মেয়ে শিষ্যা করেন নি!

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে
স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে
রমন্তি মূঢ়াঃ বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥
বিষ্ঠাদি নরকং ঘোরং ভগং চ পরিনির্মিতম্।
কিমু পশ্যসি রে চিত্ত কথং তত্রৈব ধাবসি ॥
ভগাদি কুচপর্যন্তং সংবিদ্ধি নরকার্ণবম্।
যে রমন্তি পুনস্তত্র তরন্তি নরকং কথম্ ॥

তুলসীদাস বলেছেন,—

জৈসী পুতলী কাঠকী, পুতলী মাংসময় নারী।
অস্থি-নাড়ী-মলমূত্রময় যন্ত্রিতা নিন্দিতা ভারী ॥

তিনি আরও বলেছেন,—

দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী পলক পলক লহু চুষৈ।
দুনিয়া সব বোওরা হো কর ঘর ঘর বাঘিনী পুষৈ ॥

—"পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তীভূতং জগৎ।"

মোহময়ী প্রমোদরূপ মদ্য পান করে এই অনন্ত জগৎ উন্মত্ত হয়ে রয়েছে। যে-কোন জীবই হোক্, তার পুরুষকে স্ত্রীজাতি মোহ আকর্ষণে টেনে রেখেছে।

এইসব আমরা আগে, আমাদের ছেলেবেলায় আওড়াতাম। এইসব আউড়িয়ে আমরা বেঁচে গেলাম, বুঝলি! কখনো মনে করবি না,—আমি কামজিৎ হয়েছি। তা'হলে সর্বনাশ হবে। সাধ্য কি তোদের একটা যুবতীর সামনে ঠিক থাকতে! ঐ দূর থেকে প্রণাম করবি মা বলে! ব্যাস্! যুবক-যুবতীর বেশী ঘনিষ্টতা হলেই তাদের মনে কামভাব জেগে উঠবেই। তোরা কোন মেয়েমানুষকে পায়ে হাত দিতে দিবিনে। স্ত্রীলোকের কাছ থেকে সর্বদা দূরে থাকবি। অগ্নিরূপিনী স্ত্রীর কাছে ঘৃতস্বরূপ পুরুষের অবস্থান মঙ্গলকর নয়।

অগ্নিকুণ্ডঃ সমা নারী ঘৃতকুণ্ডঃ সমোনরঃ।
সংসর্গেন বিলীয়স্তে তস্মান্নারীং পরিত্যজেৎ ॥

বুদ্ধদেবও কড়াকড়ি করেছিলেন। যখন বিহারে স্ত্রীলোক আসতে আরম্ভ করেছিল, তাইতে তিনি আনন্দকে বলেছিলেন, "সর্বনাশ হল! এই নবধর্মের পাঁচশত বৎসর আয়ু কমে গেল!" শেষেতো বৌদ্ধধর্ম নেড়া-নেড়ীর দলে পরিণত হল কিনা!

সাধু-ব্রহ্মচারীদের অষ্টপ্রকার মৈথুন পরিত্যাগ করা উচিত। এই অষ্টপ্রকার মৈথুন কি? শোন্।

শ্রবণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেব চ ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ ॥

—ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা হলে বীর্যলাভ হয়। "ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ।" বীর্যই brain-এর (মস্তিষ্কের) food (খাদ্য)। "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ। উর্ধ্বরেতা ভবেদ্ যস্ত স দেবো ন তু মানুষঃ।"

—রস হতে রক্ত, রক্ত হতে মাংস, মাংস হতে মেদ, মেদ হতে অস্থি, অস্থি হতে মজ্জা, মজ্জা হতে শুক্রের উৎপত্তি। রস হতে শুক্র পর্যন্ত সপ্ত ধাতুর তেজকে ওজঃ বলে। শুক্র নষ্ট হলে ওজঃ ধাতু নষ্ট হয়। সেইজন্য প্রার্থনা করতে হয়,—

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি,
বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি,
বলমসি বলং ময়ি ধেহি,
ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি ॥"

—"বীর্যধারণং ব্রহ্মচর্যম্।"—বীর্যধারণের নাম ব্রহ্মচর্য। বার বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করলে তার অদ্ভুত শক্তি হয়। সে অতুলানন্দ লাভ করে থাকে। ব্রহ্মচর্যই উত্তম তপস্যা, শ্রেষ্ঠ তপস্যা।"

২৬শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৩৫ সন।

রাত্রিতে আহারের পর স্বামীজী মহারাজ ভুবন দাদাকে বলিতেছেন,—"ছাখ্, আমরা সারা জীবনটা কণ্টকের মধ্য দিয়ে আসছি। লোকে মান্যি করবে, কি নিন্দা করবে, তাই বলে কি নিজের আদর্শ ছাড়তে হবে? এক হাত কেটে দিয়েছে, আরেক হাতে ফুলচন্দন মাখিয়ে দেবে। দুটাকেই সমজ্ঞান করতে হবে। চন্দন-বিষ্ঠাকে সমান জ্ঞান করতে হবে। সেই সাধু! আমরা নিজের জীবনে এই সব practical করেছি। আমি যে মান্য পেয়েছি, তা' বিবেকানন্দের পরে আর কেউ তেমন পায় নি। Next to Vivekananda, আবার আমার নামে কত কি নিন্দা করেছে, মিথ্যা দুর্ণাম রটাচ্ছে! তাতেও আমি অচল-অটল হয়ে রয়েছি সুমেরুবৎ।

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

—ত্যাগই জীবনের আদর্শ জানবি। "ত্যাগো হি পরমো ধর্মঃ। ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।"

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥

—এই শ্লোকটা তুই নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারলে মুক্তপুরুষ হয়ে যাবি।

গীতার যে কোন একটা শ্লোক নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারলে তুই অবতারতুল্য হয়ে যাবি।"

স্বামীজী মহারাজ ভুবনদাদাকে আবার বলিতেছেন,—"ঠাকুর কি বলতেন জানিস্?—'লোক না পোক।' লোকে ভাল বলতেও যতক্ষণ, মন্দ বলতেও

ততক্ষণ! নিজে sincere হয়ে কাজ করে চলে যেতে হয়,- কোন দিকে দৃক্‌পাত করতে নেই।"

৮ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৩৯ সন।

স্বামীজী মহারাজ তখন বিবেকানন্দ রোডে ডাক্তার পাঁজার ফ্ল্যাটে বাস করিতেছেন। এই দিন দ্বিপ্রহরে স্বামীজী মহারাজের আহার কালে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী আত্মবোধানন্দ স্বামীজী মহারাজের একখানি টেলিগ্রাম (আলোয়ারের মহারাজার) লইয়া তথায় উপস্থিত হন।

স্বামী আত্মবোধানন্দকে স্বামীজী মহারাজ কয়েকটি কথা কহিয়া শেষে বলিলেন,—"সত্যেন, তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমাকে এসব কথা বললাম। এতে তুমি মনে কিছু করো না। আর, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমাকে আর তাঁদের সন্তানদের ভক্তিশ্রদ্ধা করবে। তাতে তোমাদের কল্যাণ হবে!

এই মিসেস্ ওলিবুলকে যখন New York-এর সোসাইটি হতে তাড়িয়ে দিলাম, সে স্বামীজীকে (বিবেকানন্দ) চিঠি লিখলে Sanfrancisco-তে, আমার বিরুদ্ধে,—"স্বামী অভেদানন্দজীকে আপনি শাসন করুন।" স্বামীজী সেই চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন,—"ঠাকুরের সন্তানকে শাসন করবার অমি কে? ঠাকুরের সন্তান যা' করে, তাই ঠিক।" তিনি (স্বামীজী) কখনো গুরুভাইদের হুকুম করতেন না। তি'ন বলতেন,—'আমি তোদের দাস।' দ্যাখো, তিনি গুরুভাইদের কি সম্মান করতেন, কি ভালবাসতেন! নিজে মান না চেয়ে অপরকে মান দিতেন। এইটাই হচ্ছে সন্ন্যাসীর আদর্শ! মানের কাঙ্গাল হতে নেই! স্বামীজী নিজে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন, কিন্তু তিনি প্রেসিডেণ্ট হলেন না! এই সব বিষয় সম্পত্তি ক্ষণিক, তুচ্ছ, অনিত্য! এতে কি আর মন দিতে আছে!"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ সত্যেন্ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিনতো সাধু হয়েছ!—কিছু দর্শন হয়েছে কি?"

সত্যেন্ মহারাজ সসঙ্কোচে করজোড়ে কহিলেন,—"আজ্ঞে না, মহারাজ! কই আর হলো!"

তখন স্বামীজী মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "তপস্যা কর, তপস্যা কর। তপস্যা করে সত্য আনন্দ লাভ কর। বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ কর, আত্মসাক্ষাৎকার কর।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিভাষা ও সাহিত্যের অধ্যক্ষ (Head of the Department) ডক্টর বেনীমাধব বড়ুয়া মহাশয়ের বাড়ী হইতে বেড়াইয়া আসিয়া সেবক-শিষ্য স্বামীজী মহারাজকে একদিন বলিলেন,—"আজ ডক্টর বেনীমাধব বড়ুয়ার বাড়ী গিয়েছিলাম। তাঁর পাণ্ডিত্য তো সর্বজনবিদিত! কিন্তু তিনি আমাকে কি বললেন, জানেন? তিনি আমাকে বললেন,—"আমি একসময়ে আমার জীবনে খুব অশান্তি পাচ্ছিলাম। কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। ঐ সময় আমি ভুবনেশ্বরে যাই। সেখানে নিভৃতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করি। এই গ্রন্থপাঠে আমি জীবনে অপার শান্তি লাভ করি।"

ঘটনাটি বিবৃত করিয়া সেবক-শিষ্য স্বামীজী মহারাজকে প্রশ্নচ্ছলেই বলিলেন, "আচ্ছা, ডক্টর বড়ুয়া বৌদ্ধশাস্ত্রে এত সুপণ্ডিত, বুদ্ধদেবের এত উপদেশ পাঠেও তিনি শান্তি পেলেন না! শেষে শান্তি পেলেন ঠাকুরের কথামৃতে।"

সেবক-শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী মহারাজ বলিলেন,—"জ্ঞানী হলেই কি আর শান্তি পাওয়া যায় রে! যথার্থ শান্তি পেতে হলে তপস্যা চাই! তপস্যা! বুঝলি!"

১২ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৩৯ সন।

স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে উপদেশ দিলেন,—"দোষ করে কখনো ঢাকতে নেই, স্বীকার করা উচিত। যে নিজের দোষ স্বীকার করে, তার হৃদয় উদার হয়। নিজের দোষ ঢাকতে গেলে আরও অহং হয়,—অহঙ্কারই বৃদ্ধি হয়। অহং-ভাব দূর না হলে কিছু হয় না। সরল প্রাণ হতে হয়,—'হঁা, এই দোষ আমি করেছি, আমায় ক্ষমা করুন। গুরুর কাছে কিছু লুকাতে নেই, তাতে অকল্যাণ হয়।"

১২

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ।

(ভক্তকে চিঠির অংশ)

ব্রহ্মচর্য পালন করিলে ধীরে ধীরে কাম জয় করিতে পারিবে। শুদ্ধ মনে ধ্যান করা খুব ভাল। ইন্দ্রিয়াসক্ত মনকে শুদ্ধ মন জয় করিবে,—একথা আমার Spiritual Unfoldment-এর God Consciousness chapter-এর মধ্যে পাইবে। এই পুস্তকখানি বার বার পড়িবে এবং তোমার স্ত্রীকে "আত্মবিকাশ" পড়িতে বলিবে। যথাসাধ্য গীতাপাঠও করিবে। মাথায় যেখানে peculiar sensation feel কর, সেই স্থানে ধ্যান করিলে মন লয় হইয়া সমাধি আসিবে। তোমার উন্নতি হইতেছে জানিবে।

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী

—অভেদানন্দ

১২ই মার্চ, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ।

(ভক্তকে চিঠির অংশ)

"তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, সারদা দেবী কে? এবং কেন তাঁহার মন্ত্র দিয়াছি? ইত্যাদি, তাহার উত্তর শ্রীমার নিকট প্রার্থনা করিলে ধ্যানের সময় তিনি বুঝাইয়া দিবেন। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—"কে জানে কালী কেমন? ষড়্দর্শনে না পায় দরশন।" ইত্যাদি। তাঁহাকে বুঝিতে গিয়ে শিব পাগল হয়েছিল।

"সাকার সাধকে তুমি মা সাকারা,
নিরাকার উপাসকে নিরাকারা।

কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়
সে-ও তুমি তারা ত্রিকালবর্তিনী ॥
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সেই অবধি সে পরব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়,
সে-ও তুমি তারা ত্রিলোকব্যাপিনী।”

—ইহা বুঝিতে পারিলে সারদা দেবীকে চিনিতে পারিবে। কেবল intellect দিয়া বুঝিতে পারিবে না।

যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি অভিন্ন, সেইরূপ ব্রহ্ম ও মায়া, ঠাকুর ও সারদা দেবী অভিন্ন। “মায়া” সেই পরমেশ শক্তি, বিদ্যা ও অবিদ্যারূপিনী, অর্থাৎ শুদ্ধমন ও অশুদ্ধ মনরূপে আমাদের মধ্যে প্রকাশমান হয়। অবিদ্যার দুই শক্তি (আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি) আছে।

“ত্বমেকা প্রকৃতি ব্রহ্ম আচ্ছাদিনী, মহামায়ারূপে ত্রিজগত মনোমোহিনী।” —ইত্যাদি। সারদাদেবীর কৃপা না হলে সংসারের মায়া মোহ কাটে না এবং বিবেক-বৈরাগ্য আসে না, জ্ঞানচক্ষু খোলে না—সেইজন্য তাঁহার উপাসনা আবশ্যক। তাঁহার কৃপা হইলে তিনি ঠাকুরকে দেখাইয়া দিবেন, সেইজন্য তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করা আবশ্যক।

তুমি লিখিয়াছ যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের philosophy লেখা হইল, কিন্তু ঠাকুরের philosophy আজ পর্যন্ত লেখা হইল না কেন? এ সম্বন্ধে আমি বলি যে রবি ঠাকুরের philosophy আমি পড়ি নাই এবং পড়িবার ইচ্ছাও নাই। উহাতে কিছু নূতনত্ব নাই এবং উহা একঘেয়ে ও অতি ক্ষুদ্র যেমন গোষ্পদ। তাহার তুলনায় রামকৃষ্ণদেবের philosophy হচ্ছে অনন্ত ভাব-সমন্বিত অগাধ সমুদ্র। বিবেকানন্দ বলিয়াছিল যে রামকৃষ্ণকে বর্ণন করিতে যাইলে তাঁহাকে ছোট করা হয়। কারণ তিনি এত মহান্ ইত্যাদি। অরবিন্দ ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছে তাহা mark করিয়া এই সঙ্গে পাঠাইলাম। উহা পড়িয়া ফেরৎ পাঠাইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুঝিতে হইলে সমগ্র শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র, Eastern and Western philosophy-র জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যদিও আমার সে জ্ঞান আছে, তথাপি আমি তাঁহার philosophy লিখিতে সাহস করি না। সেইজন্য স্তবে বলিয়াছি,—

"তত্ত্বং দেব ন জানামি রামকৃষ্ণ তব প্রভো।
যদৃশোঽসি কৃপাসিন্ধো তদৃশায় নমো নমঃ॥"

তোমার দর্শনশাস্ত্রাদি পড়িবার ইচ্ছা হইয়াছে শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। খুব পড়িতে থাক। কিন্তু Eastern and Western philosophy পড়িতে যাইলে যদি তোমার অনুভূতি না থাকে,—তাহলে মাথা গুলিয়ে যাবে। নানা মতের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক, তাহা ধরিবে কি করিয়া? আমার প্রথমে ঐ সন্দেহ হইয়াছিল এবং আমি নাস্তিক হইয়া গিয়াছিলাম। তখন সব phiosophy বন্ধ করিয়া দিয়া অনুভূতি দ্বারা standard of Truth খুঁজিতে আরম্ভ করি। তৎপরে ঠাকুরের কৃপায় ঐ মাপকাঠি পাইয়া প্রত্যেক philosophy-কে যথাস্থানে স্থাপন করিবার পন্থা পাই। তখন সমস্ত সংশয় সন্দেহ মিটিয়া যায়। উপনিষদ বলেন,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

—অভেদানন্দ

১লা এপ্রিল, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ।

(ভক্তকে চিঠির অংশ)

Fourth dimension হচ্ছে চিত্তাকাশ, চিদাকাশ নহে। সূক্ষ্মদেহ বা জীবাত্মা সেই স্তরে থাকে। মন যদি শরীর সৃষ্টি না করিবে তো কে সৃষ্টি করে? "মনো হি জগতাং কর্তৃ, মনো হি পুরুষঃ স্মৃতঃ" ইত্যাদি (যোগবাশিষ্ঠ)। Individualised "I"-এর ক্ষমতা অত্যন্ত limited. ইহার পশ্চাতে আছেন "Cosmic I", যাঁহাকে ঈশ্বর বলে, তিনি সর্বশক্তিমান্, Infinite. Limitation হচ্ছে Time, Space and Causation দ্বারা। সুতরাং ইহা Finite and therefore bounded. Life is not totally evil. ইহাতে সুখও আছে। তবে সে সুখ ব্রহ্মানন্দের ছায়া-কণা মাত্র। উপনিষদ বলে, "এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রামুপজীবন্তি সর্বৈব প্রাণিনঃ।" The sum-total of finites is finite, cannot be Infinite; and every part of the Infinite is Infinite.

আমি কে? ঠাকুর কে? যখন ঠিক ঠিক বুঝিবে তখন তোমার সহিত ঠাকুরের কি relation, তাহা বুঝিবে। বই পড়িলে বুঝা যায় না। সেইজন্য উপনিষদ বলেছেন,—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

ইত্যাদি। আমার Relation of soul to God পড়িয়াছ কি? পড়িয়া দেখিবে। এবং Self knowledge পড়িবে।

—অভেদানন্দ

২৬শে জুন, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ।

(ভক্তকে চিঠির অংশ)

"Work is worship" এই ভাব মনে ধারণ করিয়া সমস্ত কার্যের ফল ঈশ্বরকে অর্পণ করিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন,—"মুক্তি হবে কবে? 'আমি যাবে যবে।' "আমি মলে ফুরায় জঞ্জাল।" তুমি তাঁহার সন্তান, এ বুদ্ধি ভাল। মন-মুখ এক করে প্রার্থনা করিলে ফল পাওয়া যায়। তিনি তোমার আত্মার আত্মা ও প্রাণের প্রাণ। We live and move and have our being in God. তিনি ভিন্ন অপর সকলই মিথ্যা ভ্রমমাত্র। "আমি", "আমার" (I, me, mine) বুদ্ধি ত্যাগ করে Thou, Thine, Thee, এই বুদ্ধি ধারণা করিবে। Whatever is mine, is Thine O Lord! এইভাবে সংসারে থাকিবে।

—শুঃ অভেদানন্দ

১৪ই জুলাই, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ।

(ভক্তকে চিঠির অংশ)

একটা গান আছে, "তুমি না জানালে পরে, কে তোমারে জান্‌তে পারে! বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত, ঘুরে বেড়ায় অন্ধকারে॥" শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন তখন তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। ভক্তিভাবে তাঁহার আরাধনা করিলে তিনি হৃদয় মাঝে উদয় হইয়া তোমার প্রাণে শান্তি ও আনন্দ ঢালিয়া দিবেন। আমি তোমাকে অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিতেছি যে তাঁহার কৃপা লাভ কর।

—শুঃ অভেদানন্দ

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ।

(ভক্তকে চিঠির অংশ)

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" শরীর ধারণ

করিলেই tax (রোগভোগরূপ) দিতে হয়। তজ্জন্য আর দুঃখ কি? ইহাই জাগতিক নিয়ম। এক সময়ে হৃষীকেশে তপস্যা করিতেছিলাম, তখন রোগ প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাহার ফলে জ্বর, রক্ত আমাশয় ও Bronchitis-এ তিনমাস শয্যাগত হইয়া ভুগিয়াছিলাম। প্রার্থনা করিয়াছিলাম নিজের আত্মজ্ঞানের পরীক্ষা করিবার জন্য। যদি অসুখের সময়ে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান ঠিক থাকে, তাহা হইলে আমার ঠিক ঠিক জ্ঞান হইয়াছে জানিব, এইরূপ ভাবনা করিয়াছিলাম। সোনা যেমন কষ্টিপাথরে ঘষিয়া খাঁটি কিনা জানা যায়, রোগ সকল কষ্টিপাথরের ন্যায়। তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সোনাকে ঘষিয়া পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিলাম।

—স্বঃ অভেদানন্দ

১৩

১লা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৩৯ সন।

প্রতঃকালে স্বামীজী মহারাজ বিনোদদাদাকে অনেক উপদেশ দিয়া কহিলেন,—"আমি অনেক বিচার করে দেখলাম, সন্ন্যাসী হওয়াই সবচেয়ে ভাল। একলা এসেছি, একলা চলে যাব, একলা থাকাই ভাল। মাঝে একটি মেয়েকে বিবাহ করে আপনার করে নিচ্ছ, ছেলে হলে তাকেও আপনার করে নিচ্ছ, এই 'আমি', 'আমার'-কেই মায়া বলে, মহামায়ার মায়া। জীব এই মায়াতে বদ্ধ হয়ে খাবি খাচ্ছে।"

৩রা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৩৯ সন।

স্বামীজী মহারাজ চণ্ডীদাদাকে বলিলেন,—"অহং ব্রহ্মাস্মি" বললেই কি "অহং ব্রহ্মাস্মি" হয়? তবে বলতে বলতেই হয়ে যায়। "অহং ব্রহ্মাস্মি, অহং ব্রহ্মাস্মি", "আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম" সর্বদা এইটি জপ করতে হয়।

চণ্ডীদা—"অহং ব্রহ্মাস্মি", আমি ব্রহ্ম না হয়েই, আগেই নিজেকে ব্রহ্ম বলব?"

স্বামীজী মহারাজ—"হাঁ, আগেই বলতে হবে। তুই কি ভাবছিস যে তুই ব্রহ্ম হয়ে তবে নিজেকে ব্রহ্ম বলবি? তা হয় না। সাধনা ও সিদ্ধি উভয়কে সমজ্ঞান করতে হবে। সাধনাকেই সিদ্ধি মনে করতে হবে। ঐ ব্রহ্ম-চিন্তা করতে করতেই তুই ব্রহ্ম হয়ে যাবি, বুঝ্লি!"

১৯শে পৌষ, বুধবার, ১৩৪০ সন।

স্বামীজী মহারাজ—শ্রীশ্রীঠাকুর কল্পতরু হয়েছিলেন। তাঁর সন্তান কি কল্পতরু হতে পারে না?

সেবক-শিষ্য—পারে।

স্বামীজী মহারাজ—তুইতো আমার কাছে অনেক শিখেছিস্! এখন তোর কি শেখ্বার বাকি আছে, বল! তোকে শেখাব।

সেবক-শিষ্য—আমি আর কিছু চাই না! আমার মন যেন সর্বদাই ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে থাকে,—এই আশীর্বাদ করুন।

স্বামীজী মহারাজ—তুই প্রার্থনা কর, তবেই হবে। এক্ষণি তুই যা প্রার্থনা করবি, তাই পাবি। এই জগৎটা হচ্ছে অখণ্ড-সচ্চিদানন্দের প্রাণের কম্পন। যা' কিছু দেখছিস্, সব কম্পনের খেলা। কম্পন দুই ভাবের আছে,—নীচ ভাবের আর উচ্চ ভাবের। এই যে লোকে মাগ-ছেলে পেয়েছে, সে ঐ ভাবের কম্পন করেছে, তাই পেয়েছে। তুই উচ্চ ভাবের কম্পন চালা, তোর মন ঐ ভাবে ভাবিত হয়ে যাবে। তুই মন-মুখ এক করে যা প্রার্থনা করবি, তাই পাবি। নিউইয়র্কে আমি যখন ধ্যানের ক্লাস করতাম তখন আমার মেরুদণ্ডে কম্পন হ'ত,—এমন কম্পন হ'ত যে ঘর কেঁপে যেত।

২০শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪০ সন।

সেবক-শিষ্য—শ্রীশ্রীঠাকুর কি কাউকে দীক্ষা দিবার সময় কানে মন্ত্র দিতেন?

স্বামীজী মহারাজ—না, তিনি শাস্ত্রমতে দীক্ষা দিতেন না। তিনি প্রাণে মন্ত্র দিতেন। তিনি আমার জিহ্বায় নিজের অঙ্গুলি দ্বারা মন্ত্র লিখে দিয়েছিলেন। আমাকে প্রথমেই বললেন,—

"শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি॥"

—একে দিব্যাচারের দীক্ষা বলে।

সেবক-শিষ্য—আপনারা কার ধ্যান করতেন?

স্বামীজী-মহারাজ—শ্রীশ্রীঠাকুরের। ঐ ত, তাঁর ধ্যান করেই আমার দেবদেবী ও বৈকুণ্ঠ দর্শন হল। তিনি নিজের শরীরকে দেখিয়ে বলতেন, এর ধ্যান করবি, করলে সব হয়ে যাবে।

২১শে পৌষ, শুক্রবার ১৩৪০ সন।

এই দেহটাকে যে তুই আসক্তিতে 'আমার, আমার' কচ্ছিস্ এবং শরীর

দিয়ে যা কিছু কর্ম করছিস্, তুই মনে কচ্ছিস্ 'আমি করছি; আমার বাবা আছে, মা আছে,'—এই সব অজ্ঞান। এই আমি পাখার বাতাস দিচ্ছি, আমি জানছি যে আমি বাতাস দিচ্ছি না,—তোর সঙ্গে কথা কইছি, এও জানছি যে আমি কথা কইছি না। এই সব ইন্দ্রিয়ের কার্য হয়ে যাচ্ছে। আমি আত্মা। আমি কি এই শরীর? আত্মা শরীরে আবদ্ধ নয়। এ শরীরের ভিতরেও আছে, বাইরেও আছে। ব্রহ্ম চিদাকাশে আছে, আত্মা চিত্তাকাশে, এই দেহ মহাকাশে, অর্থাৎ যেখানে এখন আমরা আছি, এই আকাশকেই মহাকাশ বলে।

সেবক-শিষ্য—তবে কেউ যদি খুন করে বলে যে আমি খুন করিনি, তাহলে কি হবে?

স্বামীজী মহারাজ—জ্ঞানীর কথা হচ্ছে। ও-ত অজ্ঞানী। জ্ঞানী পাপকার্য করে না। সে জানে যে তার দ্বারা পাপকার্য হয়নি। বাস্তবিক সে কোন পাপকার্য করে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, জ্ঞানীর পা কখন বেতালে পড়ে না। অজ্ঞানী লোক কোন ভাল কাজ করলে নিজে বাহবা লয়, আমি করেছি; মন্দ কাজ করলে বলে, ঈশ্বর করিয়েছেন, তাই করেছি। জ্ঞানী ভাল-মন্দের অতীত।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥

২৮শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩৪০ সন।

গেরস্তদের নিন্দা করতে নেই। এই যে মঠ, মিশন, মন্দির, কাদের টাকায় হয়েছে, বলি? গেরস্তদের টাকায় তো? মুষ্টিভিক্ষা কারা দিচ্ছে? গেরস্তেরা। তারা কত কষ্ট করে নিজেদের অন্ন সংস্থান করছে। তা' থেকে আবার দান কচ্ছে,—এ কি কম ত্যাগ! দুই দিন গেরুয়া নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বলছে,—হাঁ, আমরা গেরস্তদের কথা শুনব? এই অভিমান আছে। গেরস্তদের মধ্যে ঢের ভাল লোক আছে। ব্রহ্মচর্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস,—এই তিন আশ্রমকে গেরস্তরাইতো support করছে। আর সেইজন্যে গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ,—শাস্ত্রে ঋষিরাও তাই বলেছেন।

২৯শে পৌষ, শনিবার, ১৩৪০ সন।

"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥"

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতার ক্লাসে যাইবার পূর্বে স্বামীজী মহারাজ শান্তদাদাকে বলিলেন,—"গীতা হচ্ছে বিপ্লববাদীদের বই,—proscribed.

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

—এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কি করব, বল! যুদ্ধ করতে বলছে। আমি বলব,—হে ভারতবাসী, উঠ, উঠ, জাগো। ভারতকে উদ্ধার কর। গত মহাযুদ্ধে জার্মানদের বাইবেল ছিল এই গীতা। আত্মার যখন ধ্বংস নাই, আত্মা যখন কাউকে মারে না, তাহলে একধার থেকে মার, ধ্বংস কর। আর তোমরা গীতা পড়ে কি কচ্ছ? দেশের স্বাধীনতা আনতে পারলে না! গোলামগিরি কচ্ছ!

২২শে পৌষ, শনিবার, ১৩৪৭ সন।

সেবক-শিষ্য—সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র না বললে কি ভগবানের পূজা হয় না? বাংলায় যদি বলি!

স্বামীজী মহারাজ—কেন হবে না? বাংলা ভাষায় বলা যায়। আমি দীক্ষার সময়তো মন্ত্রের অর্থ বাংলাতেই বলাই! সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ না জেনে আউড়িয়ে লাভ কি? ভগবান্ মনের ভাব গ্রহণ করেন, ভাবগ্রাহী জনার্দন। তাতে প্রাণে ভাব আসে না। যে ভাষায় ডাকলে মন ও প্রাণে ভাব আসে, সে ভাষায় ডাকাই উচিত। মাতৃভাষায় ডাক। ভগবান্ তো ভাষা গ্রহণ করেন না! তিনি হৃদয়ের ভাব, ভক্তি ও বিশ্বাস গ্রহণ করেন। মাতৃভাষায় ডাকাই ভাল, তাতে ভগবান্কে নিজের সব মনের ভাব খুলে জানাতে পারে। চীনা ভাষায় যদি কেউ ভগবানের প্রার্থনা করে, তা' কি ভগবান্ শুনবেন না? জাপানী ভাষায় যদি কেউ ভগবানের প্রার্থনা করে, ইংরেজরা ইংরাজী ভাষায় যীশুখ্রীস্টের প্রার্থনা কচ্ছে, তা কি যীশুখ্রীস্ট শুনছেন না? আমি তো সিস্টার তেজস্বিনীকে ইংরাজীতে সন্ন্যাসের মন্ত্র করে তাকে সন্ন্যাস দিলাম, তাই বলে কি তার সন্ন্যাস হয়নি?

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপদাধমঃ॥

চণ্ডাল যদি হরিভক্তিপরায়ণ হয়, সে ব্রাহ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ যদি হরিভক্তিবিহীন হয়, অর্থাৎ হরিভক্তি না থাকে, সে চণ্ডালেরও অধম।

কাঞ্চীকরণ শূদ্র ছিলেন, পরমভক্ত। ভগবান্ গোপালরূপে এসে তার সঙ্গে খেলা করতেন। শ্রীরামানুজ ব্রাহ্মণ, বেদান্তের ভাষ্যকার,—এই কাঞ্চীকরণের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ভগবানের ভক্তের জাত নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, "ভক্তের আবার জাত কি? ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান্—এক।"

৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৪০ সন। কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ) মহারাজ, আজ অপরাহ্নে, ৫ টা ৩৫ মিনিটে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তটস্থ বেলুড় মঠে তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে অমরলোকে মহাযাত্রা করেন।

স্বামীজী মহারাজ রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকায় পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজজীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া তখনই মোটরযোগে বেলুড় মঠে রওনা হইলেন। মঠে বহু পুরুষ ও স্ত্রীভক্তের সমাগম হইয়াছে। প্রত্যেকেই পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজজীর শ্রীচরণে বহুবিধ পুষ্পমাল্যাদি দিয়া হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছেন।

স্বামীজী মহারাজ "ওঁ হরি ওঁ, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্" গুরুগম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে শ্রদ্ধার সহিত নানাবিধ পুষ্পের সুন্দর একটি মাল্য পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজজীর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি-গদগদভাবে অর্পণ করিয়া তিনি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম জ্ঞাপন করিলেন।

যখন মহাপুরুষ মহারাজের পবিত্র নশ্বর দেহকে মহাশয়নে শায়িত করা হইয়াছে, মঠের সাধুগণ সমস্বরে "ওঁ হরি ওঁ রাম" নাম গাহিতেছেন। পবিত্র চিতার অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই সময় স্বামীজী মহারাজ আমেরিকার ডাক্তার বৈকীকে কহিলেন,—"আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করা যায় না, অগ্নি তাকে পোড়াতে পারে না, জল তাকে সিক্ত করতে পারে না, বায়ু তাকে শুষ্ক করতে পারে না।

নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যসর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

৪ঠা ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৪০ সন।

সেবক-শিষ্যকে উপদেশ প্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজ বলিলেন,—"মানুষকে ভালবাসা দ্বারা আপনার করে নিতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের ভালবাসায় বশ করেছিলেন। তাইতে আমরা বাপ-মাকে ভুলে গিয়েছিলাম। ভালবাসা দ্বারা মানুষকে গোলাম করা যায়। রাখাল মহারাজ আমাকে ভালবাসতেন, তাই আমি তাঁর গোলাম হয়েছিলাম। স্বামীজী আমাকে ভালবাসতেন, তাইতে আমি তাঁর গোলাম হয়েছিলাম।

মানুষমাত্রেই সকলকে মান্যি করতে হয়। নিজে মান্য না নিয়ে অপরকে মান্য দিতে হয়। সেজন্য আমার কাছে যে আসেন, তাঁকেই আমি মান্য করি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যে, কেউ আসতেন, তাঁকেই তিনি অগ্রে নমস্কার করতেন।

১৪

৯ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৪০ সন।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের জন্মোৎসব সভায় স্বামীজী মহারাজ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—"গিরিশবাবুর এরূপ প্রতিভা ছিল যে তিনি দৈনন্দিন জীবনে যা দেখেছেন বা শুনেছেন, নাটকের মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠন করে তা প্রচার করেছেন। সমাজের নিকৃষ্ট হতে উৎকৃষ্ট পর্যন্ত সমস্ত চরিত্র অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। সেজন্যই তিনি আজ মহকবি। তিনি একাধারে প্রথিতযশা অভিনেতা, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার এবং রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টিকর্তা। এরূপ একাধারে তিনটি গুণের অধিকারী দেখা যায় না,—জগতে তিনি অদ্বিতীয়।

গিরিশবাবুর যখন দেহত্যাগ হয়, তখন আমি আমেরিকায়—লস্‌এঞ্জেলস্‌ সহরে। একদিন সন্ধ্যা অতিবাহিত হবার পর আমি ধ্যান করে উঠছি, এমন সময় গিরিশবাবুকে দেখতে পেলাম,—তিনি নিজের শরীরটা দেখিয়ে 'থু! থু!' করছেন। পরে জানতে পারলাম যে তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে। তিনি মহাপুরুষ ছিলেন বলেই এরূপভাবে দেখা দিতে পেরেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র যে শুধু মহাকবি ছিলেন, তা' নয়! তিনি মহাসাধক, মহাপুরুষ ও সিদ্ধ ছিলেন। গিরিশবাবুর শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন,—"লোকের ষোল আনা বিশ্বাস থাকে, কিন্তু গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।" তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বকলমা দিয়েছিলেন। এই বকলমাকেই আত্মসমর্পণ বলে। এই আত্মসমর্পণ করা সোজা নয়!

শ্রীশ্রীঠাকুরের কি মহিমা! গিরিশবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে মা-মাসি তুলে অকথ্য ভাষায় বিশ্রী সব গালাগালি দিতেন। তিনি ঐ সব সহ্য করে নিতেন. কখনও গিরিশবাবুর উপর রাগ প্রকাশ করতেন না! আরও উল্টে, যেদিন গালাগালি খেতেন, তার পরদিনই নিজে গাড়ী ভাড়া করে তাকে তিনি দেখতে আসতেন।

এ শ্রীশ্রীঠাকুরের এক অপূর্ব মহত্ত্ব! তিনি এক আদর্শ দেখিয়ে গেলেন! গিরিশবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাভক্ত ছিলেন। ভক্তি ও বিশ্বাসের জোরেই তিনি তরে গেলেন।

আজকের এই শুভদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, যেন তাঁর আত্মার সদ্গতি হয়।

১৪ই ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৪০ সন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন,—আমি যা সাধন করেছি তার ষোল আনার এক আনা করলেই তোদের সব হয়ে যাবে। আমরা তাঁর মত কি সাধন করতে পেরেছি? তিনি ছাঁচ তৈরী করেছিলেন, আমরা সে ছাঁচে নিজেদের ঢেলে দিয়েছি। আমরা কেন অত কঠোরতা করব? আমরা এখন পৈতৃক সম্পত্তি লুটছি। আমরা পায়ে হেঁটে তীর্থ করেছি, তোরা রেলে যাবি! অত কঠোরতা করবার কোন দরকার নেই। আমরা তোদের হয়ে সব করেছি! তোরাও আমাদের মত পৈতৃক সম্পত্তি লুটবি,—ভোগ করবি। সব জিনিস বিশ্বাস করে রাখা উচিত, তাই বলে কি এক জীবনে সব করা যায়?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সব সন্তানই বড়। কেউ ছোট নয়। স্বামীজী যা করেছিলেন, তা কি অপর কেউ করতে পেরেছিল? রাখাল মহারাজ যা করেছিলেন, তা' কি আর কেউ করেছে? স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, হরি মহারাজ,—এক একজনের মধ্যে এক এক রকম প্রতিভা। তাঁরা যা করেছিলেন, সেইরূপ অপর কেউ কি করেছিল? আমি যা করতে পেরেছি, তা কি আর অপর কেউ করতে পেরেছে? মহাপুরুষ মহারাজ যা করে গেলেন, তা কি আর কেউ করেছে? শ্রীরামকৃষ্ণের মত আর একটি শ্রীরামকৃষ্ণ কি হয়েছে? শ্রীবুদ্ধদেবের শিষ্যেরা কি তাঁর মত কঠোর তপস্যা করেছিল? শিষ্যেরা তাঁর ভাব প্রচার করেছিল। শ্রীবুদ্ধদেব একজনই হয়েছিল,—আর দ্বিতীয় একটি বুদ্ধ দেখতে পাবি না।

১৩ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৪০ সন।

শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীলক্ষ্মণের চরিত্রের ঘটনা আলোচনা হবার পর স্বামীজী মহারাজ বলিলেন,—"শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহ অপূর্ব! ভাইয়ে-ভাইয়ে এরূপ ভালবাসা দেখা যায় না! আবার সত্যের জন্য সেই প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে

শ্রীরামচন্দ্র পরিত্যাগ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বীর, ধার্মিক, প্রজাহিতৈষী, সত্যবাদী, আদর্শ পুরুষ ছিলেন। জগতে শ্রীরামচন্দ্রের মত চরিত্র আর দেখা যায় না। লক্ষ্মণের চরিত্রও অপূর্ব! ত্যাগী, কঠোরী ছিলেন। সর্বদাই শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত ছিলেন। কঠোর ব্রহ্মচর্যও পালন করে-ছিলেন,—কোন স্ত্রীলোকের কোন দিন মুখ নিরীক্ষণ করেন নাই! —এমন কি সীতা দেবীর মুখ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করেন নাই, পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে কথা কইতেন; নিজের স্ত্রীর মুখের দিকেও দৃষ্টিপাত করেতন না।

সীতা দেবীর চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক ছিল। তাঁর খুব পতিভক্তি ছিল। এরূপ পতিভক্তি দেখা যায় না। জীবনে কত দুঃখকষ্ট পেয়েছেন, তবুও তাঁর মন শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে ছিল। অহর্নিশি শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তা করতেন। —তাঁর ভাবে ডুবে থাকতেন। কি ভালবাসা! অদ্ভুত! সীতারামের মত চরিত্র জগতে কোথাও দেখা যায় না।

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ গান গাহিতে লাগিলেন,—

"এতনি মিনতি রঘুনন্দন সে
দুঃখদ্বন্দ্ব হামারো নিবার জী,
আপনে পদপঙ্কজ পিঞ্জরমে
চিত হংস বেঠাবজী,
তুলসীদাস কহত করজোড়ি
ভবসাগর পার উতার জী॥"

১৪ই ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৪০ সন।

স্বামীজী মহারাজ হরিপ্রেম মহারাজকে কহিলেন,—"আমার জন্মাবার পূর্বেই মাতৃস্তনে ভগবান্ আমার আহার যুগিয়ে রেখেছিলেন,—ভগবানের উপর এই বিশ্বাস রেখে আমি দুনিয়া ঘুরে এলাম, কোনস্থানে আমার কোন অভাব হয় নাই।"

হরিপ্রেম মহারাজ—কারো ভাগ্যে ত' আবার মাতৃস্তনের দুগ্ধও জোটে না।

স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া কহিলেন,—"সে নেহাৎ অভাগা! অভাগা যেখানে যায়, সাগর সেখানে শুকায়ে যায়। ভগবানের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি রাখলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কোন দলাদলির মধ্যে যাবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের

কাছে প্রাণমন খুলে প্রার্থনা কর! হৃদয়ে শান্তি পাবে। খুব করে তাঁর নাম কর।"

১লা মাঘ, রবিবার, ১৩৩৯ সন।

প্রাতঃকালে রাস্তা দিয়া ফরিদপুরের শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর ভক্তরা হরিনাম কীর্তন করিয়া যাইতেছেন। তাহা দেখিয়া স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—"প্রভু জগদ্বন্ধুর এক ভক্ত আমার কাছে এসে বলছিল,—আপনারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অবতার বলেন! কিন্তু আমাদের প্রভু ছিলেন অবতারী। অবতার, অবতরী ও অবতারী! অবতারী হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, অবতারী অবতারকে পাঠায়!" আমি বললাম,—'বটে!'

সেবক-শিষ্য—স্বামী বিবেকানন্দজীকেও একজন প্রভুর ভক্ত তাঁর ফটো নিয়ে দেখিয়েছিলেন,—"ইনি কি অবতার?" স্বামীজী তাকে বলেছিলেন—"একটু মাছের ঝোল খেয়ে মস্তিষ্ক ঠিক করো!"—তবে যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবতার বলে!

স্বামীজী মহারাজ—আমরা কি বলেছি? পদ্মনাথ, ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী,—তারাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবতার বলেছেন! তিনিও বলেছিলেন,—পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি রাম ও যিনি কৃষ্ণ হয়েছিলেন, তিনিই এ শরীরে এবার রামকৃষ্ণরূপে এসেছেন। তাই আমরাও বিশ্বাস করি। আর শ্রীশ্রীঠাকুরের চরিত্রের সঙ্গে অন্যান্য মহাপুরুষের চরিত্রের তুলনা করুক! বিচার করে দেখুক!

২রা মাঘ, রবিবার, ১৩৩৯ সন।

সেবক-শিষ্য—আচ্ছা, এমন কি কেউ আছে, যার কখনও বীর্যস্খলন হয়নি?

স্বামীজী মহারাজ—না।

সেবক-শিষ্য—তবে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য কাকে বলে?

স্বামীজী মহারাজ—Naturally, স্বাভাবিক, বাহ্য-প্রসাবের মত বীর্যস্খলন হলে, তাতে কোন দোষ নেই, যদি মনে কোন কুভাব না থাকে! স্ত্রীসঙ্গ করবে না, মনে কোন কুভাব আসবে না, অষ্ট রকম মৈথুন ত্যাগ করতে হয়, তাহলে ব্রহ্মচর্য পালন হয়। বীর্য বেশী হলেও স্খলন হয়, কারণ ধারণ করতে পারে না। বীর্য ধারণ করবারও শক্তি চাই।

সেবক-শিষ্য—কোন কোন লোক, ডাক্তাররাও বলে, বিবাহ্ না করে ব্রহ্মচর্য পালন করা ঠিক নয়, প্রকৃতির নিয়ম নিরোধ করা হয়।

স্বামীজী মহারাজ—ও হচ্ছে পাশব প্রকৃতি। প্রকৃতি কি এক রকম? —Animal nature, Human nature, Spiritual nature ও Divine nature. আমেরিকাতেও ডাক্তাররা আমাকে এই প্রশ্ন করত। আমি তাদের মতকে খণ্ডন করে দিতাম। আহার নিদ্রা, ভয়, মৈথুন নিয়ে তো পশুরাও রয়েছে। ডাক্তাররা তো এই পঞ্চভূতের দেহের পর কি আছে, তা তো বুঝতে পারে না, দেহকেই সর্বস্ব জ্ঞান করে। মানুষ যদি পাশব প্রকৃতির পথে চলে, তাহলে তার সঙ্গে পশুর প্রভেদ কি? মানুষের মনুষ্যত্ব না থাকলে সে কি আর মানুষ! তাকে মনুষ্যত্বের উপরে দেবত্বে পৌছাতে হবে, দেবভাব ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে নিজের ভিতরে—একেই Divine nature বলে।

সেবক-শিষ্য—কেউ কেউ বলে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্ত্রীকে মা বলেছেন, এ আবার কি?

স্বামীজী মহারাজ—স্ত্রীকে মা বলা কি সোজা কথা? সকলেই কি পারে? তাঁর শিষ্যরাই কি তাঁর মতন পারে? তাঁর তো পশুভাব ছিল না,—দেবভাব। সাধারণ লোকে কি বুঝবে?

৩রা মাঘ, সোমবার, ১৩৩৯ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ লক্ষ্মণদাদাকে কহিলেন,—"আমার প্রার্থনা কি জান? আমি ঠাকুরকে বলি,—ঠাকুর, তুমি অশরীরী! এ শরীর তোমার যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। তোমার কাজে, যেমন তোমার খেলবার ইচ্ছে, তেমন খেলিয়ে নাও। আমার কোন অহমিকা নেই। আমি তো মূর্খ। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নির্ভর কচ্ছি, তিনিই সব করিয়ে নিচ্ছেন এ শরীরকে দিয়ে। আমার নিজের কোন কেরামতি নেই। বক্তৃতা দিয়েছি,—সেও তাঁর ইচ্ছা। প্রত্যেকটি কথা আমার অনুভবের,—মুখস্থ করে কোন কথা বলি নাই; তবে নিজের অনুভবের মতকে সমর্থন করবার জন্য অপরের বইয়ের quotation নিয়েছি। কত বই পড়া থাকলে পারা যায়, ভাব। মা আশীর্বাদ করেছিলেন,—"তোমার মুখে সরস্বতী বসুক!"—আমি যখন বক্তৃতা দিই, তখন এই স্মরণ করে লই,—মা, সরস্বতী, তুমি আমার জিহ্বায় বসো। মা যখন বলছেন, মা সরস্বতী বসবেই।

এই আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকেই আত্মপ্রত্যয় বলে। আত্মপ্রত্যয় না থাকলে কিছু হয় না।

রাত্রিতে আহারের পর স্বামীজী মহারাজ লক্ষ্মণ দাদাকে কহিলেন,—ঐ দেখ, রবি কেমন হাসছে। তুমিও ওর মতন হাসবে, হাসিমুখ। আমারও দেখ হাসিমুখ। যে হাসতে জানে, তার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, শরীর মন ভাল থাকে। ও হচ্ছে আমার আদর্শ! দেখ, সর্বদাই কেমন মনের আনন্দে আছে। এই দেখ না, আমার উপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে যায়! তাতে কি আমার মনে কোন দুঃখ দেখ? আমি সর্বদাই হাসছি। তুমিও হাসবে।

লক্ষ্মণ দাদা—আমি তো পারি না, চেষ্টা করছি। রবিকে সকলে ভালবাসে। যেখানে যায়, সকলে ভালবাসে।

স্বামীজী মহারাজ—কেন বাসবে না? ওর ভিতরে আনন্দ রয়েছে, সকলকে আনন্দ দেয়। Outside is the reflection of the inside. হাজার দুঃখকষ্ট আসুক, নিজের দুঃখ, কেউ জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছ?—উত্তর দিলে, বেশ আছি। নিজের দুঃখকষ্টগুলোকে চেপে রেখেই সর্বদা মনের আনন্দে থাকবে। নিজের দুঃখকষ্ট কাউকে জানাতে নেই। ...ওকে (রবিকে) তোমার assistant করে নাও না কেন?

লক্ষ্মণ দাদা—সে এক জায়গায় থাকে না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

তারপর স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া কহিলেন,—রবির ভাব কি জান? আমি বলছি, শোন।—সবসে রসিয়ে সবসে বসিয়ে

সবকো লিজিয়ে নাম;
হাঁজি হাঁজি করতে রহ
বঠিয়ে আপনা ধাম।

রমতা সাধু যেমন সব দেশে বেড়িয়ে বেড়ায়, কোন একস্থানে থাকে না, সেই রকম ও কোন এক স্থানে থাকতে চায় না। ও স্বাধীন, Independent,—বন্ধন চায় না। ও যে রোজ সকালে পাঠ করে, বেশ শুনতে লাগে। ওকে স্বাধ্যায় বলে। প্রত্যেক দিন গীতার শ্লোক ও অন্যান্য শ্লোক যা ভাল লাগে, আবৃত্তি করলে ঐ সব ভাবগুলোর কথা মনে জাগে,—যেমন ঘটিকে রোজ মাজলে পরিষ্কার চকচকে হয়। নিত্য আবৃত্তি করলে একদিন না একদিন ঐ সব ভাব জীবনে ফুটে উঠবে। প্রাতঃকালে পাঠ করলে সারাদিন ঐ ভাবগুলো স্মরণ থাকে।

৩০শে মাঘ, রবিবার, ১৩৩৯ সন।

সেবক-শিষ্য—আচ্ছা, আপনার জপের মালা আছে? আপনি কি পরিব্রাজক অবস্থায় মালা জপ করতেন?

স্বামীজী মহারাজ—মালা একটা আছে, পরিব্রাজক অবস্থায় গলায় পরতাম। শ্রীশ্রীমা শোধন করে দিয়েছিলেন। ঐ মালা আমেরিকাতেও নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে জপ করতুম। পরিব্রাজক অবস্থায় কাশীতে ও হরিদ্বারে আমি মালা জপ করতাম, মালা গাঁথতেও পারতাম। আমি ধ্যান করতাম, ধ্যানই ভালবাসি।

৫ই ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৩৯ সন।

স্বামীজী মহারাজ—কাল রাত্রে আমার পার্থিব পিতাকে স্বপ্নে দর্শন করলাম, বহুদিন পর। আমি একটা hall-এ বেড়চ্ছি। তিনি বার বার আমার দিকে তাকালেন। যুবকের মত দেখতে। আমি বাবাকে চিনতে পারলাম এবং নিকটে গেলাম। তিনি আমায় বললেন,—এখন শরীরটা পুড়ে গিয়েছে, টাকা পুড়ে গিয়েছে, আমি বেশ আছি। বেশ সুন্দর মূর্তি বাবার! আর কি বললেন আমায়, তা' মনে নেই। একে বলে চিত্তাকাশ। এখানেই আমরা স্বপ্ন দেখি। তারপর দেখলাম প্রেত লোকের একটা জায়গায় সব জাতের spirit এসে একস্থান হতে খাবার নিয়ে খেতে লাগল,—যেমন যুদ্ধের সময় এক কিচেন হতে সব জাতের soldier-রা খাবার নেয়। প্রেতলোকে কোন জাতবিচার নেই। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সব এক! সকলেই এক সঙ্গে খেলে। অবশ্য ভাব ভিন্ন! সকলের তো একভাব নয়! কেউ যীশুকে ভজনা করে, সে যীশুর ভাবে ভাবিত; কেউ বুদ্ধকে ভজনা করে, সে বুদ্ধের ভাবে ভাবিত; কেউ হয়ত মহম্মদের ভাবে ভাবিত, কেউ হয়ত ঠাকুরকে চিন্তা করছে। যে কৃষ্ণের ভক্ত, সে কৃষ্ণকে ভজন করছে; যে শৈব, সে শিবের আরাধনা করছে; কিন্তু কারও সাথে কারও বিবাদ-বিসম্বাদ নেই! যে যাঁর আপন ভাবে মাতোয়ারা হয়ে রয়েছে।

আমার বাবা খুব আনন্দে আছেন,—মুক্ত পুরুষ!

৬ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৩৯ সন।

মানুষকে একটা বিষয়ে মতি স্থির করা উচিত। এটা করব। সেটা করব,

তাহলে কোন কাজই ঠিক ঠিক হয় না। একটাই প্রাণের জিনিস হয়। আর সব secondary,—যেমন স্বামীজীর অন্তরের বাসনাই ছিল ঈশ্বর লাভ করা, আর ওকালতি পড়া, গান করা,—এই সব ছিল তার secondary ; ঈশ্বর লাভই তাঁর প্রাণের জিনিস ছিল বলেই তিনি ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন। আমাদেরও জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বর দর্শন করা, আর শাস্ত্র পড়া, এসব ছিল secondary. তাই আমাদেরও ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। স্বামীজী বলতেন, ঠাকুরের শিষ্যদের প্রত্যেকেরই originality আছে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যাঁর originality নাই, সে ঠাকুরের শিষ্যই নয়।

৯ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৩৯ সন।

রাত্রিতে আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ ভক্তরাজের (স্বামীজী মহারাজের জনৈক শিষ্য) কথা কহিলেন,—ও আমাদের কাছে এসেছে, ঠাকুরের ভাব পেয়েছে, এই যথেষ্ট এই জন্মে! পূর্বজন্মের পাপ ছিল, তাই ভুগছে ; পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করছে। —সে দোষতো আমাদের নয়! তাই ছাখো না, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, চিকিৎসা তো যথেষ্ট করা গেল। কি মহাপাপ করেছিল! স্বাস্থ্য ভাল থাকা, এ-ও পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকা চাই। পাপের ফল দুঃখ, শোক ও রোগ ভোগ করা! পুণ্যের ফল আনন্দ ভোগ করা! ভক্তরাজের মত ঠাকুরের শরীর কঙ্কাল হয়ে গিয়েছিল, বিছানার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল ; এক বৎসর ভুগেছিলেন, কিছু খেতে পারতেন না। লোকের পাপ নিয়েই তাঁর অসুখ হলো,—এই জীব উদ্ধারের জন্যে! কোন কোন বিষয়ী লোক তাঁকে পায়ে প্রণাম করলে তাঁর পা পুড়ে যেত! তিনি বলতেন, পা জ্বলে যাচ্ছে! তিনি তখন তখনই পা ধুয়ে ফেলতেন। তখন এসব কিছু বুঝতাম না ; এখন বুঝতে পারি, সত্যিই! এই আমাকে অনেক লেখে,—হাঁ, আপনি ভগবান্। জীব উদ্ধার করতে এসেছেন, আপনি কৃপা না করলে আমাদের উপায় নাই। আমি ভগবান-টগবান নই। স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, জীব উদ্ধার করতেও আসি নাই! ওসব বাজে কথা! আমি কি কৃপা করব? আমার ওসব শক্তি নাই। কর্মফল সকলকেই ভুগতে হবে। যেমন কর্ম করবে, তেমন ফল পাবে। আমার কাছে দীক্ষা নিলেই বুঝি উদ্ধার হয়ে যাবে। তা' হয় না। নিজের চেষ্টা দ্বারা নিজেকেই উদ্ধার করতে হবে। দীক্ষা দেওয়া কি আমার ব্যবসা যে আমি দীক্ষা দেব? আমি লোক ঠকাতে বসি নাই। তুই

যাকে-তাকে নিয়ে আসবি আর আমি দীক্ষা দেব? তোকে আমি ভালবাসি। তাই বলে কি সকলকেই ভালবাসতে হবে? স্বামীজী তো তাঁর বন্ধুদের ঠাকুরের কাছে নিয়ে যেতেন! ঠাকুরতো তাদের সঙ্গে কথা কইতেন না,—তাকাতেন-ও না। স্বামীজী বলতেন,—আপনি আমাকে ভালবাসেন, কই, এদেরতো ভালবাসেন না! এরা সব ভাল ছেলে। ঠাকুর বলতেন,—এদের এজন্মে কিছু হবে না! অত কাঠ পোড়ায় কে? এক সের দুধে এক মণ জল!

সেবক-শিষ্য—আপনার কাছে দীক্ষা নিলে তাদের কল্যাণ হবে!

স্বামীজী মহারাজ—অত কাঠ পোড়ায় কে, বল! যাদের এজন্মে কিছু হবে না, নীচ যোনি হতে জন্ম নিয়েছে, তাদের দীক্ষা দিয়ে লাভ কি? এসব এক জন্মের কাজ নয়। সাক্ষাৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আসলেও উদ্ধার করতে পারবে না! যারা ত্যাগী, পণ্ডিত, চরিত্রবান, তাদের উপদেশ দিলে আনন্দ হয়। বুদ্ধদেব কি আর দীক্ষা দিয়ে বেড়াতেন? যে ভিক্ষু হত, তাদেরই তিনি দীক্ষা দিতেন।

সেবক-শিষ্য—আচ্ছা, লাটু মহারাজের নাম অদ্ভুতানন্দ কে দিলেন?

স্বামীজী মহারাজ—আমাদের সন্ন্যাসের সময় স্বামীজী বললেন, লাটু ভাইয়ের নাম হবে অদ্ভুতানন্দ। একটা বেহারা, বাড়ীর চাকর, সে সাধু, ত্যাগী হল। আশ্চর্য নয়?

সেবক-শিষ্য—হ্যাঁ!

স্বামীজী মহারাজ—অপূর্ব!

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ তাঁহার সেবক-শিষ্যকে লাটু মহারাজের সম্বন্ধে অনেক কথা কহিতে লাগিলেন।

১০ই ফাল্গুন, শিবরাত্রি দিবস, বুধবার, ১৩৩৯ সন।

সেবক-শিষ্য—আপনি তন্ত্রের মতে কি সাধন করেছেন?

স্বামীজী মহারাজ—(খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া) হাঁ, করেছি; ঘটা করে করি নাই। শরৎ পূর্ণাভিষেক করেছিল, আমি পূর্ণাভিষেক করি নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর এসব করতে বলেন নাই। তিনি আমাদের কোন দেবদেবীর পূজা করতে বলেন নাই। তিনি বলতেন, তোরা আমার চিন্তা করিস্, তোদের আর কিছু করতে হবে না! আমি তোদের জন্য সব করেছি। সাধন-ভজনের আর প্রয়োজন হবে না। এসব আমরা ইচ্ছে করে করেছি। পরিব্রাজক

অবস্থায় ডেরাডুনে একস্থানে আমার সঙ্গে তুলসী ছিল। সেই জায়গার নাম মনে নেই। —সন্ধ্যার সময় একজন লোক, গেরস্ত এসে আমাদের বললে, মহারাজ, আজ রাত্রে আপনারা আমার বাড়ীতে যাবেন, কালীপূজা আছে। আমরা স্বীকার করলাম। তার বাড়ীতে গেলাম। সে কালীভক্ত ছিল। রাত্রিতে পূজার আয়োজন হল। আমি বললাম,—তন্ত্রধারক কে হবে? আমরা বরাহনগরে, আলমবাজারে মঠে কালীপূজা করেছি।—আমি তন্ত্রধারক হতাম। বরাহনগর মঠে একবার কালীপূজা হল। খোল বাজিয়ে পাঠাবলি হয়েছিল। নিরঞ্জন বলি দিয়েছিল। এক কোপে বলি দিতে পারে নাই!

তারপর আমাকেই সে তন্ত্রধারক হতে বললে। আমি বললাম,—বেশ! রাত্রিতে পূজা হল, পাঠা বলি দেওয়া গেল, আমি মন্ত্র পাঠ করলাম। তুলসী পাঠার ছাল ছাড়ালো। সেই মাংস রান্না করে মাকে ভোগ দেওয়া গেল। তারপর ভৈরবীচক্রে বসে, মধ্যখানে কারণ থাকে, কারণ শোধন করতে হয়। কারণে মা প্রবেশ করেন। সেই কারণ পান করে মায়ের ধ্যান করতে হয়। ভৈরবীচক্রে স্ত্রী-পুরুষ সকল জাতই বসতে পারে, সকলেই দেবীর সন্তান। আমি শ্মশানেও সাধন করেছি।

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর কারণ জিহ্বায় স্পর্শ করে প্রসাদ করে দিতেন। আমরা সকলে জিহ্বায় ঠেকাতাম। ঠাকুরের কারণ জিহ্বায় স্পর্শ হলেই সমাধি হয়ে যেত। কারণের নাম শুনলেই 'কারণ', 'কারণ', অমনি সমাধি হয়ে যেত।

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ গান গাহিতে লাগিলেন,—

ওরে, সুরাপান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন মাতালে মাতাল করে,
মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত খড়্গা লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি,
পান করে মোর মন মাতালে।
মূলমন্ত্র তন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে॥

স্বামীজী মহারাজ আরও একটি গান করিলেন এবং কহিলেন,—এ "গানটা শিবানন্দ স্বামী গাইত। শ্রীশ্রীঠাকুরত আমাকে গুহ্য সাধন শিখিয়েছিলেন;

অপরকে বলতে নিষেধ করেছিলেন, এমন কি স্বামীজীকে বলতে নিষেধ করেছিলেন। আমি তন্ত্রের সব বই পড়েছি, মহাচীন তন্ত্রও পড়েছি। এ হচ্ছে বীরের সাধনা! তীব্র বৈরাগ্য চাই। মেদাটে ভক্তিতে হয় না। —ডুবে যায়। খুব শক্তি না হলে এ সাধনা করা যায় না। আমি বীরের বীর। শ্রীকৃষ্ণতো কাদম্বরী পান করতেন, বলরাম বারুণী পান করতেন। তাই বলে কি তাদের কোন দোষ হয়েছে? তেজীয়ান্ যারা, তাদের কোন দোষ হয় না! তেজের দ্বারা সব বিদগ্ধ করে দেয়। সে তেজ, সে শক্তি কি সকলে লাভ করতে পারে? ঠাকুরের কৃপায় স্বামীজীর সেই শক্তি লাভ হয়েছিল, রাখাল মহারাজেরও, আমারও। এক এক জনের এক এক ভাব। বাবুরাম, লাটুভাই, তাদের অন্য ভাব।"

সেবক-শিষ্য—আপনিত রাজযোগ ও বেদান্তের সাধন করেছিলেন।

স্বামীজী মহারাজ—হাঁ করেছি, সখ করে। সকল রকমেরই সাধন করেছি!

সেবক-শিষ্য—আচ্ছা, ভগবান শঙ্করাচার্য তন্ত্রের সাধন করেছিলেন কি?

স্বামীজী মহারাজ—করেছিলেন বৈ কি! শক্তির আরাধনা না করলে কি শক্তি হয়? শঙ্করাচার্য যদি শঙ্করই হন, শঙ্করের বুকেই শক্তি দাঁড়িয়ে খেলা কচ্ছেন। তাঁর আনন্দলহরী পড়ে দেখিস্ না! কাঞ্চীতে তিনি শ্রীযন্ত্রে শক্তির সাধনা করেছিলেন। আমি সেই স্থান দেখেছি। তিনি বেদান্তের সাধনও করেছিলেন, জ্ঞানী। জ্ঞানের অধিকারী সকলে হতে পারে না। শঙ্করের জ্ঞানমার্গ ও বুদ্ধের জ্ঞানমার্গ একই। তবে বুদ্ধদেব বেদের কর্মকাণ্ড মানতেন না। শঙ্করের জ্ঞান বৌদ্ধদের জ্ঞানের চেয়ে উচ্চে; সেইজন্যই বৌদ্ধদের জ্ঞানের মতকে শঙ্কর খণ্ডন করেছিলেন।

সেবক-শিষ্য—বুদ্ধদেবের তন্ত্রের সম্বন্ধে কোন কথা শুনি নাই। বুদ্ধদেবের অনেক পরে, শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্বে বৌদ্ধরা তন্ত্রের সাধন করত,—তান্ত্রিক হয়েছিল।

স্বামীজী মহারাজ—বৌদ্ধযুগে তন্ত্র develope (উন্নতি) করেছিল। তন্ত্র বহুদিনের। বশিষ্ঠদেবও তন্ত্রের সাধন করবার জন্যে মহাচীনে গিয়েছিলেন। তিব্বতে অনেক বৌদ্ধতন্ত্রের বই আছে। বৌদ্ধ লামারাও তন্ত্রের সাধন করে, ছ্যাংও (মদ) খায়। শ্রীকৃষ্ণের সময়ও তন্ত্রের সাধন ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যভাবের সাধনই ভাল। এই পথ সহজ, সরল। সাত্ত্বিক ভাবের সাধনা, কোন পতনের ভয় নাই।

তারপর স্বামীজী মহারাজ তন্ত্রের সাধন সম্বন্ধে অনেক কথা সেবক-শিষ্যকে কহিয়া বলিলেন, এসব কথা কাউকে বলবি না। আজ তোকে আমি বলে ফেললাম। কোথাও প্রচার করবি না। অন্তরঙ্গ যারা, তারাই জানে; inner circle-এর বাইরে এসব প্রকাশ করতে নাই।

রাত্রি প্রায় বার ঘটিকা হওয়ায় স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন, —তুই সমিতিতে যেতে পারলি না, এই আমার দুঃখ।

সেবক-শিষ্য—আপনার নিকটে রয়েছি, এতেই আমার সব হয়ে যাচ্ছে।

স্বামীজী মহারাজ—আমিও শিবের দাস।

সেবক-শিষ্য—ভক্তের পূজা করলেই ভগবানের পূজা হয়।

স্বামীজী মহারাজ—আমি জ্ঞানী। শিবের দাস নই।

সেবক-শিষ্য—তাহলে আপনি শিব, জ্ঞানীই শিবস্বরূপ। আপনার সেবা করলেই শিবের পূজা হয়।

স্বামীজী মহারাজ—আমি সকলের প্রশ্নের উত্তর দিই। আজ তোর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। আমার হার হয়েছে।

অতঃপর বালকের মত হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন,—খাতায় লিখে রাখ্‌বি।

১৫ই ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৩৯ সন।

রাত্রি প্রায় ১২৷৷০ ঘটিকার সময় একটি ষাঁড় কামোন্মত্ত হইয়া রাস্তা দিয়া চিৎকার করিতে করিতে যাইতেছে। তাহা দেখিয়া স্বামীজী মহারাজ বলিলেন, —কাম সকল প্রাণীর মধ্যেই আছে। এই ষাঁড়টা যে গরুকে দেখ্‌বে তারই সঙ্গে এর রমণ করার ইচ্ছে। এ এখন রমণ-সুখ চায়। মানুষেরও এই রকম ইচ্ছে। প্রত্যেক পুরুষই প্রত্যেক রমণীর রমণ-সুখ চায়। সমাজ এখানে কি করলে? একটি পুরুষ, একটি স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহের ব্যবস্থা করে, অসীম কামকে সসীম করলে। সে কেবল নিজের স্ত্রীতে স্ত্রীবুদ্ধি করবে। কোন স্ত্রীলোকের মুখের পানে দৃষ্টিপাত করবে না, পায়ের দিকে তাকাবে। জগতের সব নারীকে মাতৃজ্ঞান করবে। তারপর একটি সন্তান, বড় জোর দুইটি সন্তান হলে তখন কামরিপু দমন করবে,—নিজের স্ত্রীকেও মাতৃজ্ঞান করবে। মানুষতো তলিয়ে দেখবে না! ধর্ম কি? সংযম! ইন্দ্রিয় দমন করা। ইন্দ্রিয় সুখের বা কামের দাসত্বই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়। পশুপ্রকৃতির

বা কামের উপর প্রভুত্ব করা ও পরমাত্মার বিকাশই মানব জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ!

২রা ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৩৯ সন।

প্রাতঃকালে রাজসাহীর যোগেন দাদা স্বামীজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, বাসি কাপড়ে, কাপড় না ছেড়ে ভগবানের নাম করলে কি দোষ হয়?

স্বামীজী মহারাজ—আসল হচ্ছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা! তাতে মনে পবিত্র ভাব আসে, চিত্তশুদ্ধি হয়। Cleanliness is next to Godliness. অবশ্য ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা ভিন্ন। সে অবস্থায় শুচি ও অশুচি সমজ্ঞান হয়। সে অবস্থাতো এখন তোমার নয়!

'শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি।'

মধ্যাহ্নে আহারের পর স্বামীজী মহারাজ আপনভাবে গান গাহিতে লাগিলেন,— "শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী।"

২৭শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৪৫ সন।

সকাল প্রায় ৯॥০ টায় স্বামীজী মহারাজ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত সকলকে বলিলেন,—আজ গুরু পূর্ণিমা। জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধ্যান তোমরা সকলে কর। স্বামীজী মহারাজ ধ্যান করিতে করিতে আবৃত্তি করিলেন,— ত্বং হি বিষ্ণুর্বিরিঞ্চি স্ত্বং ত্বঞ্চ দেবো মহেশ্বরঃ।
ত্বঞ্চৈব শক্তিরূপোঽসি নির্গুণ স্ত্বং সনাতনঃ॥
ত্বাং স্তোতুং কোঽত্র শক্তঃ স্যাদ্ভাবাতীতমনাময়ম্।
ভগবন্ সর্বভূতাত্মন্ রামকৃষ্ণঃ নমোঽস্তুতে॥
যং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-গিরিশশ্চ দেবাঃ
ধ্যায়ন্তি গায়ন্তি নমন্তি নিত্যম্।
তৈঃ প্রার্থিতস্তস্য পরাবতারো
দ্বিবাহুধারী ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥
বন্দে জগদ্বীজমখণ্ডমেকং
বন্দে সুরাসেবিত পাদপীঠম্।

বন্দে ভবেশং ভবরোগবৈদ্যং
তমেব বন্দে ভুবি রামকৃষ্ণম্ ॥
নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপম্
ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং
তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ ॥

প্রজ্ঞা মহারাজ (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ) পূজা করিলেন। আমরা সকলে শ্রীগুরুর ধ্যান করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে তিনবার অঞ্জলি প্রদান করিলাম। সুধন্যদা গুরুস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

ওঁ নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখতারিণে ॥
অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞানহারিণে।
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্যদায়িনে ॥
শিবতত্ত্ব প্রকাশায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে ॥
অনাচারাচারভাববোধায় ভাবহেতবে।
ভাবাভাববিনির্মুক্ত-মুক্তিদাত্রে নমোনমঃ ॥
নমস্তে শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে।
জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমোনমঃ ॥
শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে ॥
কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে।
আরক্তনিজতচ্ছক্তি সমভাগ বিভূতয়ে ॥
নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমোনমঃ ॥

অতঃপর আমরা সকলে মিলিতকণ্ঠে আবৃত্তি করিলাম,—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

—এবং স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করিলাম।

১২ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৫ সন।

স্বামীজী মহারাজ—শ্রীশ্রীঠাকুরের উচ্চভাব ধারণা করতে জগৎ এখনও উপযুক্ত হয় নাই।

২১শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪৫ সন।

স্বামীজী মহারাজ সন্ধ্যার সময় বিষ্ণুপদবাবুকে বলিলেন,—আমার বাঁচবার এত সাধ নাই। আমার বিষয় রক্ষা করতেও হবে না, ছেলের বিবাহ, মেয়ের বিবাহ দিতে হবে না। সন্ন্যাসী মানুষ! জগতে একা এসেছি। এ জগতে আমার আর কে আছে, এক ভগবান ছাড়া!

১৭ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৪৫ সন।

বহুদিন পরে স্বামীজী মহারাজের সহিত নগেনদা (নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) সাক্ষাৎ করিতে আসেন। স্বামীজী মহারাজের পুস্তকাবলী সম্বন্ধে তাঁহার সহিত নগেনদার অনেকক্ষণ আলোচনা হইল। নগেনদা আমেরিকার works সম্পর্কে কহিলেন,—স্বামীজী message দিয়ে গেলেন, আপনি fight করলেন,—fighter, আর পরমানন্দ স্বামী, এঁরা সব accept করছে, acceptance. এঁরা আর নূতন কি দিবে? আপনাদের কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে!—সেরকম personality-ও নাই।

নগেনদা চলিয়া যাইবার পর স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বলিলেন, —নগেন আসাতে ভালই হয়েছে।

২৬শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৫ সন।

জামসেদপুরের হরিপদবাবুকে স্বামীজী মহারাজ বলিলেন,—"কেশববাবুর বাড়ীতে যে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো তোলা হয়, ঐ ফটোর যে posture, তা সিদ্ধকালীর ভাব। বাম হস্তে খর্পর, দক্ষিণ হস্তে খড়্গ। চন্দ্রে সুধা আছে; খড়্গ দিয়ে আঘাত করে সুধা এনে পান করছেন!—আধ্যাত্মিক মানেও আছে।

১৭ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৪৫ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যের সহিত জাপানের কবি নোগুচি ও রবীন্দ্রনাথের,—উভয় কবির পত্রের বিষয় লইয়া আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, রবিঠাকুর spirit-এর সঙ্গে নোগুচির পত্রের উত্তর দিয়েছেন। যা' লিখেছেন, তা' বেশ হয়েছে।

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যের সহিত হিটলারের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করিলেন। তিনি হিটলারের চরিত্রের প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, হিটলারের উদ্দেশ্য হচ্ছে জার্মেনী হবে জার্মানদের। অন্য কোন জাত সেখানে থাকতে পারবে না। Pure German blood চায়। হিটলার নিজেকে আর্য মনে করে।

১৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৪০ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। মরিয়া হয়ে লেগে যা। তপস্যা কর, বুদ্ধদেবের মত—একটি চাল খেয়ে, একটি তিল খেয়ে। তুই তো সম্বুদ্ধ! তাঁর মত কঠোরতা কর। এ শরীর থাকে কি না-থাকে, গ্রাহ্যই করবি না। বেঁচে থেকে লাভ কি? না-হয় মৃত্যু হল! আমরা যখন তপস্যা করতাম তখন এমনই আমাদের রোখ ছিল। শরীরের কোন যত্নই ছিল না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে বসতে হয়। যতদিন সিদ্ধ না হব, ততদিন উঠবই না। শরীর পাত হয়ে যাক্।

তারপর স্বামীজী মহারাজ বালকের মত হাসিয়া হাসিয়া কহিলেন, তুই সিদ্ধ হয়ে এসে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করবি।

১৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, দোলপূর্ণিমা, ১৩৪০ সন।

আজ দোল পূর্ণিমা। প্রাতঃকালে সেবক-শিষ্য, নীলমণি ও হরিপদ স্বামীজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে আবির অর্পণ করিল। তাহাতে তিনি আনন্দে হাসিয়া হাসিয়া গান গাহিতে লাগিলেন,—

আজ হোলি খেলব শ্যাম তোমার সনে,
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে,
কুঙ্কুম দিব ঐ রাঙ্গা চরণে।

—আমার গায়ে রং দিলে আমি তাকে কিছু বলব না। এই যে সকলে পায়ে

আবির দিচ্ছে, আমি কি কাউকে দিতে নিষেধ কচ্ছি! বৎসরের একদিন। স্ফূর্তি করতে হয়। স্ফূর্তি করাই জীবনের উদ্দেশ্য। কয়দিনেরই-বা জীবন! জীবনে স্ফূর্তি করে, আনন্দ করে নিতে হয়। রং দেবার ভয়ে পালানো উচিত নয়। এ দেহ কার?

ঐ দিনই তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—যাদের বিবাহ না করলে চরিত্র খারাপ হবার সম্ভাবনা আছে, তাদের বিবাহ করা ভাল। কামাগ্নিতে পুড়ে মরার চেয়ে বিবাহ করা শ্রেয়ঃ। যীশু বলেছেন, It is better to marry than to burn. যে বিবাহ না করে চরিত্র ভাল রাখে, সে-তো মহাপুরুষ, দেবতা!

১৮ই ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৪০ সন।

ডাক্তার শ্রীযুত দুর্গাপদ ঘোষ মহাশয় স্বামীজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজ তাঁহার নিজের বসিবার চেয়ারে ডাক্তারবাবুকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। ডাক্তারবাবু সেই চেয়ারে বসিতে স্বীকার না করায় তিনি তাহাকে বলিলেন,—আপনি আত্মাস্বরূপ। ঈশ্বরের সন্তান। আপনাতে আমাতে কোন ভেদ নাই, অভেদ! আপনি দয়া করে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন, তাইতে আমি বড়ই আনন্দিত হলাম। —আমি তো আপনাদেরই দাস!

ডাক্তারবাবু—মহারাজ, ও কথা বলবেন না। আমাদের অপরাধ হবে।

স্বামীজী মহারাজ—অপরাধ কি! আপনাকেত আমি নারায়ণ দেখছি। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের কি শেখাতেন জানেন?

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদানে কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণের চেয়েও নিজেকে নীচ মনে করবে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হবে, নিজে মান না চেয়ে অপরকে মান দিবে এবং সর্বদা হরিনাম কীর্তন করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কেউ আসলে, তাঁকে নমস্কার করবার আগেই তিনি নমস্কার করতেন। গিরিশবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে নমস্কার করবার পূর্বেই তিনি গিরিশবাবুকে নমস্কার করতেন। এই করে শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশবাবুকে জয় করেছিলেন।

১৫

২০শে ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৪০ সন।

সন্ধ্যার সময় এলবার্ট হলে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি সভায় স্বামীজী মহারাজ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে "মহাপুরুষ" নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিলেন,—আমরা তখন কাশীপুরের বাগানে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখ। সকলে তাঁর সেবা করি। আমরা রাত্রিতে তখন ধুনি জ্বালিয়ে তপস্যা করতাম। তখন আমরা শ্রীবুদ্ধের জীবনী ও তাঁর ত্যাগ,—এই বিষয় নিয়ে খুব আলোচনা করতাম। সেই সময় স্বামীজী একদিন বললেন,- চল, বুদ্ধগয়ায় যাই। আমরা স্বীকার হলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরকে না বলেই পালিয়ে চললাম। স্বামীজীর সঙ্গে শিবানন্দ মহারাজ আর আমি ছিলাম। শিবানন্দ মহারাজ বয়সে স্বামীজী ও আমার অনেক বড় ছিলেন। সেইজন্য আমরা তাঁকে 'তারকদাদা' বলে ডাকতাম।

আমরা ট্রেনে করে গয়ায় আসলাম। গয়ায় এসে আড়াই কি, তিন ক্রোশ হেঁটেই আমরা বুদ্ধগয়ায় এসে উপস্থিত হলাম। বুদ্ধদেব যেই বোধিদ্রুমতলে তপস্যা করেছিলেন, সেইস্থানে অশোক রাজা-নির্মিত প্রাচীন প্রস্তর আসনে বসে আমরা সারারাত্রি তিনজনে ধ্যান করলাম। ভোরের সময় মন্দিরে গেলাম। সেখানে সোনার পাতমোড়া শ্রীবুদ্ধের মূর্তি দর্শন করলাম। ধ্যানভঙ্গের পর স্বামীজী বললেন,—আমি দেখলাম, আমাদের কাছ দিয়ে শ্রীবুদ্ধের জ্যোতি pass করে গেল। কিন্তু আমি ও শিবানন্দ মহারাজ কিছুই দেখি নাই। তবে, আমাদের বেশ শান্তি অনুভব হয়েছিল।

সকাল হল। স্বামীজী বললেন, শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলে আসি নাই, এখন তবে ফিরে চল। কিন্তু আমাদের পাথেয় কিছু নাই। এক পিঠের ভাড়া নিয়ে এসেছিলাম। কি করি! লোকের কাছে বুদ্ধগয়ার মোহান্তের কথা

শুনলাম। তিনি ফল্গুনদীর ওপারে থাকেন। ওপারে তাঁর মঠ। তাঁর খুব সম্পত্তি। তাঁর শিষ্যেরা চাষও করে। তিনি গান শুনতে ভালবাসতেন। স্বামীজী বললেন,—তবে চল, আমি তাঁকে গান গেয়ে শোনাবখন। আমরা ফল্গু নদী পার হয়ে মোহান্তজীর মঠে এসে উপস্থিত হলাম। তারপর মধ্যাহ্নের সময়, যখন পংক্তি হয়েছে, সেই সময় একজন সাধু, তাঁর গলায় খুব জোর ছিল, তিনি খুব জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিলেন,—'পঙ্গতকী হরিহর মহাপুরখো,'—হে মহাপুরুষগণ, পঙ্গতে খেতে আসুন। পশ্চিমে সাধুমাত্রেই মহাপুরুষ। সেই 'পঙ্গতকী হরিহর মহাপুরখো'—আমাদের মনে একটা খুব impression হয়ে রইল। আমরা ফিরে এসে 'পঙ্গতকী হরিহর মহাপুরখো' কাশীপুরের বাগানে পঙ্গতের সময় ঐরূপে ডাক দিতাম এবং পরস্পর পরস্পরকে মহাপুরুষ বলে সম্বোধন করতাম। তারকদা বয়সে বড় বলে তাঁর নাম শেষপর্যন্ত 'মহাপুরুষ' রয়ে গেল।

সেই 'পঙ্গতকী হরিহর মহাপুরখো',—এই কথা মনে করে কাশীপুরের বাগানে ও বরাহনগর মঠে আমরা হাসিতামাসা করে শিবানন্দ মহারাজকে "মহাপুরুষ" বলে ডাকতাম। মহাপুরুষ মহারাজের শরীরের মধ্যে শ্রীবুদ্ধের জ্যোতি প্রবেশ করতে দেখি নাই।

একবার আমরা সব বলরামবাবুদের বাড়ীতে ভিক্ষা করতে এসেছি, নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমাদের বাবুরাম মহারাজের মা পরিবেশন করছেন। তারকদা বয়সে আমাদের বড়। বাবুরাম মহারাজের মা কোন সামগ্রী পরিবেশন করতে আসলে আমরা সব বলতাম,—"ঐ মহাপুরুষ। ওকে আগে দিন।"

তিনি শুনে বললেন, "সে কি! মহাপুরুষতো ব্রহ্মদৈত্যি!—গাছে থাকে গো।"

আমরা সব বললাম,—"উনি আমাদের সাধু মহাপুরুষ।"

২৮শে ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৪০ সন। জামসেদপুর।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ দধি খাইতে খাইতে গান গাহিতেছেন,—"ম্যায় নাহি যায়েঙ্গে দধি বেচ্‌নে।"

অতঃপর বলিলেন,—"স্বামীজী এই গানটা গাইতেন। ব্রজগোপীরা বলছে,—'আর দই বিক্রী করতে যাব না! কেন? না, হাটে না যেতেই পথে চোরের শিরোমণি আমাদের দই সব কেড়ে নেয়।"

তারপর স্বামীজী মহারাজ আবার গান গাহিতে লাগিলেন,—"মুঝে বারি বনোয়ারী সেইয়া।"

৬ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৪০ সন। জামসেদপুর।

স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—"আমার ভিতরে কোন অবিশ্বাস নাই; সর্বদাই হৃদয়ে শাস্তি বিরাজ করছে। এখন আমি ব্যোম্‌ভোলা হয়ে রয়েছি।"

১০ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৪০ সন।

হাওড়া স্টেশন হইতে স্বামীজী মহারাজের সহিত ঘোড়ার গাড়ীতে আসিতেছি। জগন্নাথঘাটের কাছে আমাদের গাড়ী থামিল আর দুইজন সাধু পুরী খাইবার জন্য স্বামীজী মহারাজের নিকট কয়েকটি পয়সা চাহিলেন। স্বামীজী মহারাজ তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলেন। তারপর আমাদের গাড়ী নিমতলা ঘাটের দিকে চলিতে লাগিল। তখন স্বামীজী মহারাজ হাসিয়া বলিলেন,—"দান করতে আমার স্ফূর্তি হয়।" গঙ্গার ধার দিয়া আমাদের গাড়ী যাইতেছে, তাহাতে স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"বেশ, মা গঙ্গাকে দেখে দেখে যাওয়া হচ্ছে।" আহিরীটোলার গঙ্গার ঘাট দেখিয়া স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—এই ঘাটে ছেলেবেলায় কত সাঁতার কেটেছি।" আহিরী-টোলায় অন্য আরেকটি ঘাট দেখাইয়া স্বামীজী মহারাজ বলিলেন,—"এই ঘাট হতে নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যেতাম।

গাড়ীতে বসিয়া স্বামীজী মহারাজ আনন্দের সহিত তাঁহার বাল্যস্মৃতি-বিজড়িত অনেক কথা কহিতে লাগিলেন।

১৪ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৪০ সন।

সেবক-শিষ্য স্বামীজী মহারাজকে বলিতেছেন,—"পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) মোটরে বসে কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলছিলেন আপনার কথা! —"ওকে দেখলে আমার কান্না পায়, ছাড়তে ইচ্ছে হয় না।—জড়িয়ে ধরে রাখি! আমাদের কি ভালবাসা ছিল। এখনই-না ছাড়াছাড়ি হয়েছি! একসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দুইজনে যেতাম। সে একদিন ছিল! একসঙ্গে কত সাধন-ভজন, জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা, কীর্তন-পাঠ করেছি। আহা,

সে-সব দিন কি আনন্দেই না গিয়েছে! উনি এখানে আছেন, তাই ওকে দেখতে এলাম। এখন উনিই এক আছেন গুরুভাই!"

স্বামীজী মহারাজ—হাঁ, ও উদারচেতা। কারো কথা গ্রাহ্য করে না।

৮ই ভাদ্র, সোমবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজ—বিষয়াসক্ত লোক স্বার্থপর। তারা কি কখনও স্বার্থ ত্যাগ করে জগতকে ভালবাসতে পারে? এক একটি টাকা তাদের গায়ের এক এক বিন্দু রক্ত। গান্ধী তাইতে বেশ লিখেছে, যে বিবাহ করে একটি স্ত্রীলোককে বা স্ত্রীলোক পুরুষকে ভালবাসে, সে কখনও জগতকে ভালবাসতে পারে না। বিবাহ না করাই ভাল। যে বিবাহ করেছে, সে অবিবাহিতের মত থাকবে, ব্রহ্মচর্য পালন করবে।

সেবক-শিষ্য—তাহলে কি কেউ বিবাহ করবে না? জগৎসুদ্ধ লোক অবিবাহিত হয়ে থাকবে; সৃষ্টি লোপ পেয়ে যাবে যে!

স্বামীজী মহারাজ—সৃষ্টি লোপ পাবে, কি থাকবে,—তা নিয়ে তোর মাথা ঘামাবার দরকার কি? তুই চরিত্রবান্ হয়ে জগতের সামনে নিখুঁত চরিত্র দেখাবি।

সেবক-শিষ্য—এই মহান আদর্শ সকলে গ্রহণ করতে পারবে না। জগতে তো কত মহাপুরুষ এসেছেন,—বুদ্ধ, শঙ্কর, যীশুখ্রীস্ট, চৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ! কই, সব লোকতো মহৎ হয়নি! দু'চার জন মহৎ হয়ে গিয়েছেন।

স্বামীজী মহারাজ—আরে! জগতের সব লোক মহৎ হয়েছে, কি না হয়েছে, তা' তোর দেখবার প্রয়োজন নাই। তুই মহৎ হ' না! সব লোকই চেষ্টা করবে মহৎ হতে, তার মধ্যে কে যে মহৎ হবে, তা' কে বলতে পারে? তার মধ্যে তুইও মহৎ হতে পারিস্। একজন মেয়ে ভক্ত যীশুখ্রীস্টকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'When will the Kingdom of Heaven come upon earth?' পৃথিবীতে কখন স্বর্গরাজ্য আসবে? তাতে তিনি বলেছিলেন,—'তোমরা, স্ত্রীলোকেরা যখন সন্তান উৎপাদন করতে বন্ধ করবে, তখন এই পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে।' যীশুখ্রীস্ট বলেছেন,—"স্বর্গে বিবাহ নাই, কেউ বিবাহ করেও না, কেউ বিবাহ দেয়-ও না। সেখানে কেবল আনন্দ বিরাজ করে!" কোন লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ নাই, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই, অভেদ। লোকে কাম চরিতার্থ

করবার জন্যই তো বিবাহ করে, পুত্র উৎপাদন করবার জন্য, বংশ রক্ষা করবে। কে কার বংশ রক্ষা করবে? আত্মার তো কোন বংশ নাই।

যদি মানুষ নিজেকে ভগবানের সন্তান মনে করে, তাহলে আর দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয় না। 'আমার ছেলে', 'আমার মেয়ে',—এই আসক্তিতেই লোকে সংসারে জড়িয়ে পড়ে। ঠাকুর নিজের বংশ নির্বংশ করলেন। আমরাও তাই করেছি। আমাদের কাছে যারা আসবে, তাদেরও বংশ নির্বংশ হবে।

গান্ধী লিখেছে,—বিবাহিত হয়ে অবিবাহিতের মত থাকবে। তা' তিনি নিজে জীবনে করতে পারেন নাই, চেষ্টা করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিবাহিত হয়েও অবিবাহিতের মত,—জীবনে দেখিয়ে গেলেন। জগৎ-ইতিহাসে নূতন! এরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাবি না। যীশুখ্রীস্ট ব্রহ্মচারী, বিবাহ করেন নাই। শঙ্কর বিবাহ করেন নাই। তাঁরা চিরকুমার ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব দুইবার বিবাহ করেছিলেন। তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না। বুদ্ধদেব বিবাহ করেছিলেন, তাঁর একটি পুত্র হয়েছিল। শিব বিবাহ করেছেন, তাঁর পুত্রকন্যা আছে। শ্রীকৃষ্ণ বহুবিবাহ করেছিলেন, তাঁর বহু পুত্র ছিল। পূর্বে মুনিঋষিদেরও পুত্রকন্যা ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিবাহ করেও পূর্ণ ব্রহ্মচারী, মহা-কামজিৎ পুরুষ ছিলেন। আমরাও তাঁর কৃপা পেয়েছি; আমাদের জীবনও ধন্য হয়েছে। আমরাও তাঁর মত সকল স্ত্রীলোককে জগন্মাতার অংশ মনে করি এবং মাতৃজ্ঞান করি।

১০ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৩৭ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ আহারের পর তাঁহার সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—শ্রীনাথ বোম্বেতে আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। আবার শেষ বয়সে দেশের কাজ করে শরীর পাত করা যাক। শরীর তো দেশের কাজের জন্য! শরীর তো চিরদিন থাকবে না। তা' দেশের কাজ করে মরা ভাল। ছুটি পাবখন। আবার আরেকটা শরীর ধারণ করে আসব।

সেবক-শিষ্য—আপানারাতো যখন-তখন জন্মগ্রহণ করেন না! শ্রীশ্রীঠাকুর পুনরায় যখন আসবেন, তখন ত আসবেন।

স্বামীজী মহারাজ—হাঁ! শ্রীশ্রীঠাকুর যখন আসবেন, তখনই আসব।

১২ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৩৭ সন।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ খোজা কাহাদের বলে, তাহা

সেবক-শিষ্যকে বুঝাইয়া বলিলেন, যীশুখ্রীস্ট বলেছেন, যাঁরা ভগবানের জন্য unoch (খোজা) হয়েছেন, তাঁরাই ধন্য। সেইরূপ ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব,—কামজিৎ। যাঁরা স্ত্রীসঙ্গ করেন না, ব্রহ্মচর্য পালন করেন ভগবানের জন্য, তাঁদের জীবনই ধন্য। তাঁরাই আনন্দের অধিকারী।

১৪ই ভাদ্র, রবিবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজ—মরবে নারী, উড়বে ছাই।
তবেই নারীর গুণ গাই॥

—পুরুষের ও তাই। পুরুষরাও মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত চরিত্রবান হয়ে থাকবে, তবে তাদের গুণ লোকে কীর্তন করবে। কেবল মেয়েদের বেলাতেই বুঝি! পুরুষরাও কখন চরিত্রভ্রষ্ট হবে না। আমাদের দেশে মেয়েরা চরিত্রভ্রষ্টা হলে সমাজ তাদেরকে নির্যাতীতা করে, আর পুরুষেরা অন্যায় করলে তাদের কোন দোষ হয় না। এ কোন্ দেশী বিচার বাবা! ভগবান্ সাধে কি তোদের ইংরেজের গোলাম করে রেখেছে!

সমাজ তাদেরকে privilage দিবে, একটা chance দিবে সৎ হবার জন্য! তা' নয়! তাকে ঘৃণা করে আরো রসাতলে পাঠাচ্ছে। সে তখন কি করবে? বাধ্য হয়ে অসৎ পথ অবলম্বন করে। আজ যে পিশাচী আছে, কাল সে দেবী হতে পারে। আজ যে পশু আছে, কাল সে দেবতা বনে যেতে পারে। মানুষের এক মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে, মনের ভাব বদলে যেতে পারে। বেদান্ত আমাদিগকে শিক্ষা দিচ্ছে,—জগতে কেউ পাপী-তাপী নাই। সকলেই সেই অমৃতের সন্তান। পাপ বলে জগতে কিছু নাই। যেটাকে আমরা পাপ বলে থাকি, সেটা আমাদের মনের দুর্বলতা।

১৭ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৩৭ সন।

রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—"ভগবানের যা ইচ্ছে, তাই ভাল। তাঁর পাদপদ্মে মন রাখলে তিনিই পথ খোলসা করে দেন। মানুষে ভেবে কিছু করতে পারে? আরো ভেবে ভেবে মনেতে অশান্তি পায়। দুঃখকষ্ট হচ্ছে তাঁর পরীক্ষা, তাতে যে কাতর না হয়ে তাঁকে ভুলে না যায়, সে-ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তাঁর ভক্তকে তিনি সর্বদাই বিপদে ফেলে বিব্রত করেন, তবু যে তাঁকে না ত্যাগ করে, সে-ই তাঁকে পায়।—

"যে করে আমার আশ, তার করি আমি সর্বনাশ।
তবুও যে না হয় নিরাশ, তার-ই হই আমি দাসের দাস॥"

—গরীব না হলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না,—গরীবকেই তিনি কৃপা করেন।"

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"সংসারে বিপদে পড়লে আত্মীয়-স্বজন কেউ সাহায্য করে না,—একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না। তাইতে স্বামীজী নিউ ইয়র্কে আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন,—মরবার পূর্বে আমার একটি বন্ধুও নাই। তাঁর অসুখের সময় তাঁর ইংরেজ বন্ধুরা তাঁকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, একবার এসে খবরও নেয় নাই। শঙ্করাচার্য মোহমুদ্গরে ঠিকই লিখেছেন,—

যাবদ্‌বিত্তোপার্জনশক্ত
স্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনুচ জরয়া জর্জরদেহে
বার্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥

যতদিন শক্তি, সামর্থ্য ও অর্থ থাকে, ততদিনই বন্ধুবান্ধব আসে; পরে শক্তিহীন, সামর্থ্যহীন ও অর্থহীন হলে কেউ এসে জিজ্ঞাসাও করে না। তখন, এমন কি, নিজের আত্মীয় স্বজনেরা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।"

১৮ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজ—বাঙ্গালীর দ্বারা কিছু যে হবে, তা আশা করা যায় না। নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও কলহ করেই জাতটা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। বাংলাদেশ হতে একটা leader বেরুল না। গুজরাট হতে বেরুল গান্ধী! তাইতে স্বামীজী ঠিকই লিখেছেন,—'বাঙ্গালীর স্বভাব Lazy, Useless, Vulger, Jealous, Cowardice and Quarrelsome.' আমি এর সঙ্গে আরও একটা যোগ করে দিব—Passionate.

কেউ কাউকে মানবে না, সকলেই স্ব স্ব প্রধান! হিংসুটে! কারও ভাল দেখ্‌তে পারে না। পরস্পর পরস্পরের নিন্দা করতে মজবুত। এই হচ্ছে আমাদের জাতীয় স্বভাব!

রাত্রিতে আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ সেবক শিষ্যকে কহিলেন,

"দু একটা বোমা মেরে ইংরেজের রাজত্ব ধ্বংস করতে পারে কি? এতে কাজ আরো খারাপ হয়। ও non-violance-ই ভাল। অহিংসা পথ। গান্ধী যদি এ সময় গুলিয়ে না যায়, ঠিক থাকে, তাহলে দেশটা স্বাধীন হতে পারে; কারণ গভর্ণমেণ্ট সন্ধি স্থাপন করবার চেষ্টা করছে কি না! সন্ধি স্থাপন না করাই ভাল! গান্ধীর মাথা বিগড়িয়ে গেলেই গেল! তাহলে এ দেশ আর স্বাধীন হতে পারবে না।

১৬

৩১শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৩৭ সন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর উৎসব উপলক্ষে সভায় স্বামীজী মহারাজ কহিলেন, "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে অনন্ত ভাব আছে। বর্তমানে আমরা তাঁর মহৎ জীবনের কোন্ ভাব গ্রহণ করব? দেশের যেরূপ অবস্থা, তাতে আমরা তাঁর বীরপনা, বীরভাব গ্রহণ করব। তিনি বৃন্দাবনে কৈশোর লীলা করেছিলেন, গোপীদের সঙ্গে খেলা করেছিলেন। তা আলোচনা করবার সময় এখন নয়। এখন আমরা মহাভারতের বীর শ্রীকৃষ্ণকে চাই, যিনি কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে গীতার উপদেশ প্রদান করেছিলেন। আমরা এখন তাঁরই পূজা করব। এখন বীর্য, শৌর্য, শক্তি ও সামর্থ্য দেখাতে হবে। 'আর কি শ্যাম যমুনায় বাঁশী বাজাবে',—ওসব রেখে দাও। এখন চাই পার্থসারথির পাঞ্চজন্যের নিনাদ। যে নিনাদে মানুষের হৃদয়ে সাহস, মনে উৎসাহ, শরীরে বল-বীর্য সঞ্চার করে, মানুষকে দুর্বল হতে নব বলে বলীয়ান করে, তা-ই এখন আবশ্যক। বাঁশীর শব্দে মানুষের মনে কোমলভাব এনে দেয়, তার এখন আবশ্যক নাই।

আপনারা মনে করেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কেবল দ্বাপর যুগেই হয়েছিল। তা' নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বহির্জগতে এবং অন্তর্জগতে সততই হচ্ছে। আর কুরুক্ষেত্র যে কেবল একটি নির্দিষ্ট স্থান, তা-ও নয়। আজ আপনারাও সেই কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের যদি শক্তিসাহস না থাকে, আত্মপ্রত্যয়, ধর্মে বিশ্বাস না থাকে, তাহলে কিরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করবেন?

সেই শক্তি-সাহস, আত্মপ্রত্যয় ও ধর্মে বিশ্বাস দাসত্বে এবং জড়বাদীর শিক্ষাদীক্ষাতে হারিয়ে আজ নির্বীর্য হয়ে পরের দুয়ারে হাত পাতছেন। তারা কিছু দয়া করে দিবে, তবে আপনাদের জীবনধারণ হবে। তবে ভাবুন, আপনারা আজ কোন্ অবস্থায় এসে পৌচেছেন।

আমাদের এই অবস্থা হতে উন্নতি লাভ করতে হলে দেশে আজ শক্তির পূজা ও তাঁর আরাধনা করতে হবে। সেই শক্তি লাভ করতে হলে ভারতে আজ পার্থসারথির পূজা করতে হবে। সেজন্যই কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে আজ আমরা আবার চাই। তিনি আমাদের হৃদয়েই আছেন। যদি আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে ডাকতে পারি, তিনি নিশ্চয় আবার অবতীর্ণ হয়ে দুষ্টের বিনাশ ও সাধুজনের হৃদয়ে শান্তি প্রদান করবেন এবং ধর্ম সংস্থাপন করবেন।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আর যেখানে যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রদাতা এবং যেখানে ধনুর্ধর বীর পার্থ, সেখানেই রাজলক্ষ্মী, অচঞ্চলা নীতি ও জয় অভ্যুদয়,—এ নিশ্চিত বলে মনে হয়।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের অমৃতময় উপদেশ হচ্ছে এই গীতা। গীতার মত পুস্তক আর জগতে নাই,—অদ্বিতীয়।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

এই গীতা, আশ্চর্যের বিষয় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সংগ্রামস্থলে অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন। গীতাতে এই মত উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত রয়েছে—তীব্র কর্মশীলতা; কিন্তু তার মধ্যে আবার অনন্ত শান্ত ভাব। এই তত্ত্বকে কর্মরহস্য বলা হয়েছে। এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য।

মহাত্মা গান্ধী গীতা পাঠ করেন। তাঁর এই গীতা পাঠেতেই আত্মপ্রত্যয় জেগেছে এবং মনেতে অসীম সাহস ও বলের সঞ্চার হয়েছে, জানবেন।

২০শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজ—গান্ধী গভর্ণমেণ্টের মতে মত দেয়নি। তা' ভালই। এতে তার আরও মহত্ত্ব বেড়ে উঠল। কংগ্রেসের জোর হল। দেশের লোক তাঁকে শ্রদ্ধা করবে। ওরা peace চায়। Peace চাওয়া মানেতো গোলামী করা, ওদের গোলাম হয়ে থাকা। দেশের লোক খেতে পাবে না? তা' না খেয়েই মরুক না! ধ্বংস হোক। ওরা খুব অত্যাচার করবে? করুক না!

আমরা ধ্বংসই চাই। দেশের যে অবস্থা, এতে peace স্থাপন করা যায় না। তোমরা চণ্ডনীতি অবলম্বন করে অন্যায় অত্যাচার করবে, আমরা দেশের জন্য প্রাণ দিব। আমরা fight চাই। গত যুদ্ধের সময় ইউরোপে কি ধ্বংসই না হয়েছে! কত বড় বড় নগর, গ্রাম ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, শ্মশানে পরিণত হয়েছে। কোন সহর যে সেখানে ছিল, তার কোন চিহ্নই নাই, অস্তিত্বই নাই,– যেন মরুভূমি। গান্ধী যদি ভাইসরয়ের মতে মত দিত, তা কেমন হত জানিস্? —একটা কুকুর এসেছে, তাকে এক টুকরা রুটি দাও! হেয় মনে করত। কিন্তু ভাইসরয়ের মত নাকচ করাতে গান্ধীর মহত্ত্বই প্রকাশ করা হল, তাকে খাটো করা হল। এ কি কম গৌরবের কথা! কংগ্রেসের কয়েকজন মাথাওয়ালা লোক আছে,—মতিলাল নেহরু, জহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভ-ভাই প্যাটেল এবং সরোজিনী নাইডু।

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ জহরলাল নেহরুর সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন, —জহরলাল খুব তেজীয়ান্ ছেলে। যেমন বাপ তেমন ছেলে। তাকে আমি এলাহাবাদে দেখেছি। বেশ সুন্দর চেহারা! কংগ্রেসের নেতাদের ছেলের মধ্যে এক মতিলাল নেহরুর ছেলে, জহরলালের মত দেশপ্রেম ও তেজ আর কোন নেতাদের ছেলেদের মধ্যে নাই।

২২শে ভাদ্র, সোমবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ নরেনের সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন,— "আমরাও ঐ রকম কাজ করবার সময় একটা কোন শ্লোক নিয়ে মন নিবিষ্ট করে রা৺তাম। কোন স্তবের প্রথম শ্লোকটি নিয়ে আওড়াতাম। যখন পরিব্রাজক অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, তখন ঐ "বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ" ইত্যাদি কিংবা নির্বাণষটক্ আবৃত্তি কচ্ছি, কোন খেয়ালই নাই। ঐ এক একটি শ্লোকের ভাব নিয়ে তন্ময় হয়ে রয়েছি। মনকে উচ্চভাবে রাখতে হয়। "কৌপিনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ",—এই ভাব নিয়ে দুনিয়া ঘুরে এলাম। কৌপীনধারীরাই ভাগ্যবান, সন্দেহ নাই।"

২৩শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ দেশের সম্বন্ধে কিছু কথা বলিয়া অবশেষে বলিলেন,—ইটালী পূর্বে ফ্রান্সের অধীনে ছিল। নেপোলিয়ানকে যুদ্ধে পরাস্ত

করে ইতালীবাসী স্বাধীনতা লাভ করে। Savaronala নামে একজন Roman Catholic monk, সন্ন্যাসী, সে দেশকে মাতিয়ে তুলেছিল। সে চার্চে লোকদিগকে দেশের বিষয় বলে তাদের ভিতর দেশপ্রেম জাগিয়ে দিত। সন্ন্যাসীদের ভিতর তেজ আছে কি না! —ব্রহ্মতেজ। গান্ধীর ভিতর ব্রহ্মতেজ, জহরলাল নেহরুর হচ্ছে ক্ষাত্রবীর্য। ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রবীর্যের সংমিশ্রণে ভারত উদ্ধার হবে, জানবি।

২৭শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩৭ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ জনৈক লেখকের রচিত মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধের বিষয় শুনিয়া বলিলেন,—"অহিংসায় হবে না। কিসে হবে? তা' সে কিরূপে বুঝল? হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়! অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী! অহিংসাতেই হবে। অহিংসা মানেই হচ্ছে non-co-operation! অত্যাচার করবে, নীরবে সহ্য করে যাওয়া, কোন প্রতিকার করবে না। গান্ধীরতো এই ভাব কি না! হিন্দুরাতো আর military race নয় যে যুদ্ধ করবে! অশোক কি আর যুদ্ধ করে তার রাজত্বের বিস্তার করেছিল? বুদ্ধের অহিংসা নীতি অবলম্বনেই তা' পেরেছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধের সময় বহু লোকের বিনাশ হওয়াতেই তার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। যুদ্ধ পরিত্যাগ করল, বৌদ্ধধর্মের শরণাপন্ন হল, তখন তার নাম হল ধর্মাশোক! ত্যাগের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শান্তি প্রচার করল। পূর্বে তার নাম ছিল চণ্ডাশোক। নিষ্ঠুর, নির্দয় ও দাম্ভিক ছিল।

যীশুখ্রীস্ট ক্রুশে প্রাণত্যাগ করলেন অম্লানবদনে, কোন কিছু আপত্তি জ্ঞাপন করলেন না। সহ্য করে যাওয়া! গান্ধী এই ভাব গ্রহণ করেছে, উচ্চ ভাব। সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন সহ্য করে যাওয়া, কোন প্রতিকার করবে না। যেমন ডান গালে চড় মেরেছে, বাম গাল ফিরিয়ে দিবে! —এই হচ্ছে highest morality বা ধর্মনীতি!

২৮শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৩৭ সন।

স্বামীজী মহারাজ—হিতোপদেশের মত বই আর জগতে নাই,—অদ্বিতীয়। আমেরিকাতে আমি ছেলেমেয়েদের হিতোপদেশ পড়াতাম। বিষ্ণুশর্মার কি বুদ্ধি! নীতিপূর্ণ কি সুন্দর গল্প রচনা করেছেন। তোরা হিতোপদেশ

পড়বি। সেই ছেলেবেলা পড়েছি, এখন আবার হিতোপদেশ পেলে পড়তে ইচ্ছা হয়।

২৮শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৪৩ সন। জামসেদপুর।

গভীর রাত্রিতে সেবক-শিষ্য স্বামীজী মহারাজকে তাহার জীবনের ঘটনা ও দর্শনের বিষয় কহিলেন। উহা শুনিয়া স্বামীজী মহারাজ তাহাকে কহিলেন,—"এ যাত্রায় তুই ধন্য হয়ে গেলি! তোর দ্বারা কত লোকের উপকার হচ্ছে! কত প্রচার হচ্ছে! জীবনে পবিত্রভাবে থাকবি, পরোপকারী হবি, আত্মাভিমানী হবি না।"

২৯শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৪৩ সন।

স্বামীজী মহারাজ জনৈক ভক্তকে কহিলেন,—"নিষ্ঠা করে জপ করবে, তাহলে মন ঠিক হয়ে যাবে।"

৮ই পৌষ, বুধবার, ১৩৪৩ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ আপনমনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাবতার স্তোত্র হইতে আবৃত্তি করিতেছিলেন,—

ব্রজবিপিনবিহারে শ্যামলং বাসুদেবং
সুমধুররসকেলিং গোপিকাপ্রাণনাথম্।
মদনরমণবেশং কংসকালং কবীশং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥

সন্ধ্যার সময় জনৈক ভক্ত স্বামীজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ, সংসারে শান্তি পাচ্ছি না!

স্বামীজী মহারাজ—সংসারে কি শান্তি আছে? খালি ছেলে বার করবি, তাহলে শান্তি পাবি কি করে! আমি যদি বে করে বৎসর বৎসর ছেলে বার করতুম, তাহলে কি শান্তিতে থাকতে পারতুম? ঐ জন্যইতো এই বেশ ধরেছি, সন্ন্যাসী হয়েছি!

"সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর, কেউ নয় আপন,
পরপ্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে।"

—এই সব গান-টান গাবি! তবে শান্তি পাবি।"

৯ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩ সন।

রাত্রি এগার ঘটিকার সময় সেবক-শিষ্য স্বামীজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহলে 'রামকৃষ্ণ' নাম শ্রীশ্রীঠাকুরকে কে দিয়েছেন?"

স্বামীজী মহারাজ—"তোতাপুরীই 'রামকৃষ্ণ' নাম তাঁকে দিয়েছেন। নামকরণ যদিও পূর্ণাভিষেকের একটি বিশেষ অঙ্গ, ব্রাহ্মণী নাম দেন নাই।"

১৭ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৪৩ সন।

সৈদপুরের শ্রীনাথবাবুকে স্বামীজী মহারাজ প্রাতঃকালে কহিলেন, "ভগবানকে যে কোন নামে ডাকতে পার। হরি বলে ডাক, আল্লা বলে ডাক, কৃষ্ণ বলে ডাক, যীশুখ্রীস্ট বলে ডাক, দুর্গা বলে ডাক, এক নাম ধরে নিষ্ঠার সহিত ডাকলেই হল। ঈশ্বরের অনন্ত নাম। যে নাম ধরেই ডাক, সেই এক জায়গায়ই যেয়ে পৌছাবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন,—"যত মত তত পথ।" একটা পথ ধরে যেতে হবে। আজ এক পথ দিয়ে যেয়ে কাল অন্য পথ ধরে যাবে, তাহলে কোন কালেই গন্তব্য স্থানে পৌছাতে পারবে না। যে জাতির যে পথ দিয়ে গেলে suitable হয়, সেই জাতি সেই পথ ধরে যাবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় বলেছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

'বর্ত্ম' মানে পথ। মানুষ সকল প্রকারে আমারই পথের অনুসরণ করে থাকে। গীতার এই ভাবটি শ্রীশ্রীঠাকুর practice (সাধন) করে এই যুগে দেখিয়ে গেলেন, সর্বধর্ম সমন্বয় করলেন। সর্বধর্ম সমন্বয় মানে সকল ধর্মের সারটুকু লয়ে নয়,—ec-electicism, যত রকমের মত আছে, সেই সেই মত বা পথ ধরে সাধনায় সিদ্ধ হওয়া। জগতে যত মহাপুরুষ এসেছেন, তাঁরা এক একটি মত বা পথ ধরে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি সকল মতের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত তুমি জগতে আর একটি দেখাতে পারবে না। এই জন্যই তো স্বামীজী "অবতার বরিষ্ঠায়" লিখেছেন।

শ্রীনাথবাবু—মহারাজ, সংসারে কিরূপে থাকা যায়?

স্বামীজী মহারাজ—ভগবানের সংসার,—এই জ্ঞান করে সংসার করবে। কোন জিনিসে আসক্তি রাখবে না। এই যে তোমার মেয়ে, যে মেয়েকে

তুমি 'আমার-আমার' করে আপনার ভাবছ, ভালবাসছ, এই মেয়ে কি তোমার? মরে গেলে আত্মা যে লোকে যাবে, সেখানে গিয়ে কি তোমার এই মেয়ের আত্মা তোমাকে "বাবা" বলে ডাকবে? সেখানে কোন লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ নাই। তুমি এর দেহের জন্ম দিয়েছ কেবলমাত্র, আত্মার জন্ম দাও নাই। Each soul is bi-sexual, প্রত্যেক আত্মার ভিতর স্ত্রী ও পুরুষ দুই ভাবই আছে। যখন যে ভাব প্রবল হয়, সেই ভাবানুযায়ী শরীর ধারণ করে। স্ত্রীভাব বেশী প্রবল থাকলে স্ত্রী-শরীর ধারণ করতে হয়, পুরুষ-ভাব বেশী প্রবল থাকলে পুরুষ-শরীর ধারণ করতে হয়। মাঝামাঝি থাকলে নপুংসক হয়।

বাস্তবিক আত্মা পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক, কোন লিঙ্গই নয়। আত্মার জন্ম ও মৃত্যু নাই, আদি-অন্তহীন। যা কিছু দেশ ও কালের অধীন, তা-ই মৃত্যুর অধীন। আত্মার জন্ম ও মৃত্যু নাই,—দেশকালাতীত, অর্থাৎ দেশকালের অধীন নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপোন শোষয়তি মারুতঃ॥"—অস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করতে পারে না, অগ্নি তাঁকে পোড়াতে পারে না, জল তাঁকে দ্রব করতে পারে না এবং বায়ু তাঁকে শুষ্ক করতে পারে না। এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, অবিকার্য এবং অবিনশ্বর। ক্ষুদ্র জীবাত্মাসমূহ এই আত্মারই বা পরমাত্মারই ক্ষুদ্র অংশরূপে প্রকাশ হচ্ছে। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"—এই পরমাত্মা, পরমেশ্বর বা বিরাট পুরুষ, জীবাত্মারূপ অংশ সকলের পূর্ণ সমষ্টি। এই বিরাট পুরুষই অনাদিকাল হতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র বিষয়ী এবং জ্ঞাতা। এই পরমাত্মাই একমাত্র বিশ্বাত্মা, যাতে জীবাত্মাসমূহ অংশরূপে রয়েছে। পরমাত্মাই এক অদ্বিতীয় অনন্ত-সত্তারূপ সমুদ্র, যাতে আবর্তের ন্যায় ব্যক্তিগত জীবাত্মাসমূহ বিরাজ করছে। এই বিরাট পুরুষই প্রথমজঃ হিরণ্যগর্ভ বলে ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছেন,—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে বিশ্বস্য ধাতা পতিরেক আসীৎ" অর্থাৎ ইনি বিশ্বের বিধাতা ও পতিরূপে ব্রহ্ম হতে প্রথমে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইনিই নির্গুণ পরব্রহ্মের সর্বপ্রথম এবং সর্বোচ্চ বিকাশ,—সগুণ ব্রহ্ম। ইনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্তকরণ। একে আশ্রয় করে প্রকৃতি ক্রমবিকাশদ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রসব করেছেন। এই ভাবটিই গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—"মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্॥" তুমি আমার "আত্মজ্ঞান" বই পড়, তাহলে সব বুঝতে পারবে।

তোমার যে জিনিসের উপর আসক্তি প্রবল থাকবে, মৃত্যুর পর তোমার মন সেই জিনিসেই আবদ্ধ থাকবে, যা চাইবে তাই পাবে,—অবশ্য স্থূলভাবে পাবে না, সূক্ষ্মভাবে পাবে, thought form-এ, ভাবরূপে। তাই এই জীবনে যদি উচ্চভাবের আদর্শে চরিত্র গঠন কর তবে উচ্চলোকে যাবে, সংসারের আসক্তির জিনিসে মনকে যদি রাখ তাহলে তোমার অধোগতি হবে, অশান্তির জ্বালাতে তোমার আত্মা (জীবাত্মা) দুঃখকষ্ট ভোগ করবে। আর, শান্তি যদি পেতে চাও, তাহলে এই আত্মার ধ্যান কর এবং তাঁকে জানতে চেষ্টা কর। আত্মাকে জানলেই তুমি সকল বন্ধন হতে মুক্ত হবে, সদানন্দে থাকবে, জীবন্মুক্ত হবে। —এই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। তুমি Headmaster ; —ছেলেদের মধ্যে এই সব ভাব স্কুলে শিক্ষা দিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজীর বিষয় বলবে,—তাতে তাদের চরিত্র গঠন হবে। এই ছেলেবেলাতেই শিক্ষা দিতে হয়। এই সময় যা শিক্ষা দিবে, তাই শিখবে।

২৮শে পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪৩ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—"বই পড়ার দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। বই পড়ে কিছু হয় না। এখন আমি আর বই পড়ি না। ধ্যান করবি। ধ্যানের দ্বারা অনুভূতি হবে। একমাত্র ধ্যানের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়।"

২৯শে পৌষ, বুধবার, ১৩৪৩ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—"হাম্-বড়া ভাব থাকলে সে বড় হতে পারে না। বিনয় ভাব থাকা চাই। বড় হবি তো ছোট হ।"

-লা মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩ সন।

অপরাহ্ণে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—"শ্রীশ্রীঠাকুর হচ্ছেন সকল শক্তির আধার। তাঁকে ভক্তি-বিশ্বাস করলেই জ্ঞানলাভ হবে। নিজের অহমিকাকে পুছে ফেলতে হবে।"

রাত্রি আড়াই ঘটিকায় স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—"আমি

ধ্যান করা পছন্দ করি। যত ধ্যান করবি তত উন্নতি হবে। আমি তোদের বয়সে রাত্রিতে না ঘুমিয়ে সারা রাত ধ্যান করতুম। আমি শবাসনে শুয়ে শুয়েই সারারাত ধ্যান করতুম। যেই দেখছি ঘুমের ভাব আসছে, অমনি উঠে পড়তুম। তখন বসে বসে ধ্যান করতুম। যদি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করতাম, তাহলে এই জীবনে এত কাজ কি করতে পারতাম? আমি ৩৷৷৹ ঘণ্টা, কি ৪ ঘণ্টার বেশী জীবনে কোনকালেই ঘুমাই নি।

এই যুগে নিরক্ষর শ্রীশ্রীঠাকুর ও ততোধিক নিরক্ষরা শ্রীশ্রীমা যেরূপ চরিত্র দেখিয়ে গেলেন, এইরূপ আর কেউ দেখাতে পারেনি। শ্রীশ্রীমা সাক্ষাৎ দেবী না হলে কি শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শীরূপের পূজা তিনি গ্রহণ করতে পারতেন? শ্রীশ্রীঠাকুর পূজা করতে করতে সমাধিস্থ আর যাঁকে পূজা করছেন তিনিও সমাধিস্থা। অপূর্ব। এরকমটি কারো জীবনে পূর্বে দেখা যায়নি। শ্রীশ্রীঠাকুরের মত কাম জয় করেছে এরূপ একটি চরিত্র বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের মধ্যেও দেখ্তে পাবি না। শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের চরিত্র দেখতে পেয়েছি, আমার সৌভাগ্য।

৩রা মাঘ, শনিবার, ১৩৪৩ সন।

রাত্রি প্রায় ২৷৷৹ ঘটিকায় শয়ন করিবার পূর্বে স্বামীজী মহারাজ মধুর কণ্ঠে মহাশক্তি আনন্দময়ীর গান গাহিতেছেন,—

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দমগনা
সুধাপানে ঢল ঢল, ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)।
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা
উভয়ে পাগলের পারা, লজ্জা-ভয় আর মানে না (মা)।

৫ই মাঘ, সোমবার, ১৩৪৩ সন।

অপরাহ্নে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—মৃত্যুর পর অন্ধকারে থাকতে হবে। যদি সাধনভজন করে নিজের ভিতর আলো বার করতে পারিস, তাহলে ভাল; আর তা' না হলে অন্ধকারে ঘুরে মরতে হবে।

১৭

১৯শে মাঘ, সোমবার, ১৩৪৩ সন। (1st Feb. 1937)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ভবানীপুর নর্দার্ন পার্কে কৃষ্টি-কলা-শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন উৎসব হয়। এই উৎসব সম্পন্ন হইবার পর স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ (বেলুড় মঠ) স্বামীজী মহারাজকে লইয়া প্রদর্শনীর প্রত্যেক বিভাগের গ্যালারি দেখাইতে লাগিলেন। স্বামীজী মহারাজ প্রদর্শনী দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হন এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজকে (বেলুড় মঠ) প্রশংসা করিয়া তিনি কহিলেন,—"তোমাকে প্রেসিডেণ্ট করা উচিত। তোমারই অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রচেষ্টায় এই শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিকী হইতেছে।" স্বামীজী মহারাজ Art gallery-র painting দেখিয়া উচ্চ প্রশংসা করিলেন এবং গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের মণীন্দ্রবাবু এবং সমবেত ভদ্রমহোদয়দিগকে তিনি বলিলেন,—"ঈশ্বরও একজন নিপুণ শিল্পী। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তকালে তাঁর শিল্পনৈপুণ্য আমরা প্রত্যক্ষ করি। একটা বৃক্ষও তাঁর শিল্প। এই অনন্ত আকাশে যে আমরা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদি দেখি, তা' অসীম আকাশে সেই অনন্ত শক্তিমান শিল্পীর হস্তরচিত painting (চিত্র) ব্যতীত আর কিছুই নয়। তিনি তাঁর অদৃশ্য হস্তের দ্বারা এই বিশ্বরাজ্যে নিত্য painting (চিত্রাঙ্কন) করছেন।"

২১শে মাঘ, বুধবার, ১৩৪৩ সন।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে শ্রীশ্রীসারদা দেবীর উৎসবে স্বামীজী মহারাজ শুভাগমন করায় পূজনীয়া শ্রীশ্রীগৌরীমা ও শ্রীশ্রীদুর্গামা অত্যন্ত আনন্দিতা হন। পূজনীয়া শ্রীশ্রীদুর্গামা স্বামীজী মহারাজকে কহিলেন,—"আপনি যে এসেছেন, এতে যে আমি কি খুসী হয়েছি তা' বাইরে প্রকাশ করতে পারি না।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে স্বামীজীর পর আপনার মত আর কে আছেন?—আমার তো এইরূপ মনে হয়।"

এই কথা শুনিয়া স্বামীজী মহারাজ কহিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, নরেনের নীচেই ছেলেদের মধ্যে কালীর বুদ্ধি বেশী। ও একটা মত চালাতে পারবে।"

শ্রীশ্রীদুর্গামা বলিতে লাগিলেন, "আপনার রচিত শ্রীশ্রীমায়ের স্তব আমাদের এখানে নিত্য দুবেলা পাঠ হয়। এই রকম স্তব শ্রীশ্রীমায়ের, আমি তো আর কাউকেও রচনা করতে দেখিনি! কি মধুর!"

পূজনীয়া শ্রীশ্রীগৌরীমা স্বামীজী মহারাজকে কহিলেন,—"বাবা, তুমি যেমন বলতে-কইতে পার, তোমার অগাধ পাণ্ডিত্য! কি কঠোর তপস্যা করেছ!—যে জন্যে তোমার নাম হয়েছে 'কালী তপস্বী'। তোমার তুলনা তুমিই!"

শ্রীশ্রীগৌরীমার কথা শুনিয়া স্বামীজী মহারাজ কহিলেন,—"আপনারা মেয়েদের জন্যে কত উপকার করছেন! আমরা তো এ যাত্রায় কিছুই করে যেতে পারলাম না, অবশ্য মেয়েদের জন্যে!"

ইহার উত্তরে শ্রীশ্রীগৌরীমা কহিলেন,—"মেয়েদের জন্যে না করেছ, তাতে কি হয়েছে! তুমি আমেরিকায়, বিলাতে কত কাজ করেছ,—শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম ও বেদান্ত প্রচার করে এসেছ। —ওতে কত লোকের উপকার হয়েছে! এদেশে এসে কলকাতায় সমিতি করলে, কত লোকের উপকার হচ্ছে! আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির করছ,—এসব কি কম কাজ!"

তারপর শ্রীশ্রীদুর্গামা কহিলেন, "স্বামীজী চলে আসার পর আপনি পঁচিশ বৎসর ওদেশে যে কার্য করে এসেছেন, তার তুলনা হয় না! —আপনি যে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান।"

শ্রীশ্রীগৌরীমা স্বামীজী মহারাজকে কহিলেন,—"বাবা, মাঝে মাঝে দেখা দিও। তা' নাহলে বাঁচবো কি করে?"

স্বামীজী মহারাজ শ্রীশ্রীদুর্গামাকে কহিলেন,—"শ্রীশ্রীমায়ের ঐ স্তবটির ভিতরে তাঁর চরিত্রের সব ভাবই দিয়েছি। ঐ স্তব শুনে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন,—'তোমার মুখে সরস্বতী দেবী বসুক।' যখনই আমেরিকায়, ওদেশে বক্তৃতা দিয়েছি, তখনই বক্তৃতার পূর্বে শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ করে দাঁড়িয়েছি,—মা, তুমি না বলেছিলে আমার জিহ্বায় সরস্বতী দেবী বসুক! অমনি তারপর অনর্গল ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছি। কে যেন জিহ্বায় ভাষার পর ভাষা জুগিয়ে

দিচ্ছেন। এ তাঁর কৃপা! তিনি আবরণী শক্তি! তাঁর (শ্রীশ্রীমায়ের) কৃপা না হলে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পাওয়া যায় না।

তারপর শ্রীশ্রীগৌরীমার সহিত স্বামীজী মহারাজের দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত সেই পুরাতন কাহিনীর ঘটনা লইয়া পরস্পর মধুর আলাপনে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। এদিকে সমবেত সাধু ও ভক্তগণ তাঁহাদের পরস্পরের কি মধুর আলাপন ও কি অপূর্ব ভাব, তাহা বিস্ময়ে অনির্বচনীয় উৎফুল্ল মনে নির্বাক নিস্পন্দে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তারপর রাত্রি অধিক হওয়ায় স্বামীজী মহারাজ শ্রীশ্রীগৌরীমা, শ্রীশ্রীদুর্গামা ও সমবেত ভক্তদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ৭৫তম জন্মোৎসবের মহতী জনসভায় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেন,—"বিবেকানন্দের জীবনের সহিত আমি নিবিড়ভাবে পরিচিত। তাঁর সর্বজীবে দয়া, নরনারায়ণরূপে সকলের সেবা ও অদ্ভুত গুরুভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই জগতে দুর্লভ। কর্মের দিকে প্রথমে তাঁরও তত ইচ্ছা ছিল না। অহরহঃ নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়; কিন্তু অলৌকিক শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সে ইচ্ছার দ্বার রুদ্ধ করিয়া বলিলেন,—'নরেন, নির্বিকল্প সমাধি লাভ অতি তুচ্ছ কথা, এখন তোমায় জগতের কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। চাবিকাঠি আমার হাতে রইল; কর্মশেষে যখন তুমি আপনকে চিনিতে পারিবে তখনই শরীরকে তুচ্ছ জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া তুমি আনন্দধামে চলিয়া যাইবে। তাঁর নশ্বর শরীর এ জগতে বিদ্যমান না থাকিলেও দিব্য ও চিন্ময় শরীরে তিনি এখনও বিশ্বের কল্যাণ কামনা বহন করিয়া বর্তমান রহিয়াছেন। তিনি মরেন নাই, অমর হইয়া আপনাদের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য এখনও তিনি তাঁহার বিরাট মঙ্গলময়ী ইচ্ছা ও আশীর্বাদ আপনাদের শিরে বর্ষণ করিতেছেন।"

২৫শে মাঘ, রবিবার, ১৩৪৩ সন।

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজজী অপরাহ্ণ ৩টা ৭ মিনিটের সময় বেলুড় মঠে নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া মহাসমাধি লাভ করেন। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার কিছু

পূর্বে স্বামীজী মহারাজ বেলুড় মঠে উপস্থিত হন। সেই সময় শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের পবিত্র দেহ পূত ভাগীরথীর বারিতে মঠের সাধুরা "ওঁ হরি ওঁ রাম" এবং "ওঁ হরি ওঁ রামকৃষ্ণ" এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে স্নান করাইলেন এবং তাঁহার দেহে চন্দন লেপন করিলেন। তৎপরে সাধুরা তাঁহার দেহ খাটে করিয়া মঠের প্রাঙ্গণে আনিলেন। তাঁহার দেহ ঘিরিয়া সাধুরা ও ভক্তেরা নানাবিধ পুষ্পাদি দ্বারা বিভূষিত করিলেন এবং অনঙ্গ মহারাজ (স্বামী ওঙ্কারানন্দ) পুষ্পাদি দ্বারা পূজা ও আরতি করিলেন। তৎপর স্বামীজী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণাধিক গুরুভ্রাতা গঙ্গাধর মহারাজকে পুষ্প ও মাল্যাদি দ্বারা শেষ শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করিলেন। সমবেত সাধুরা, পুরুষ ও মহিলা ভক্তেরা তাঁহাদের প্রাণের শেষ ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। সকলে "শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী কি জয়" ধ্বনি ও "হরি ওঁ রাম", "হরি ওঁ রামকৃষ্ণ",—এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার দেহ স্বামীজীর মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে, যে স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য শিষ্যবৃন্দকে সমাধি দেওয়া হইয়াছিল, সেইস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। রাত্রি প্রায় ৮৷৷০ ঘটিকার সময় পবিত্র চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। যখন চিতা দাউ দাউ করিয়া প্রজ্বলিত হইল, তখন স্বামীজী মহারাজ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। তখন Guest House-এর বারান্দায় সমবেত সাধুরা শ্রীশ্রীমহাকালীর ভজন গান গাহিতেছিলেন। রাত্রি প্রায় ১১৷৷০ টার সময় তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

১৮

৩০শে ফাল্গুন, রবিবার, ৩৪৩ সন।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য দ্ব্যধিক শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে উত্তর কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি ভবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।

রাত্রি প্রায় ১১॥০ ঘটিকায় স্বামীজী মহারাজ আনন্দিত ও উৎফুল্ল মনে সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—"আজ আমার চৌদ্দ বৎসরের সাধ পূর্ণ হল। কত বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁর মন্দির তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন। আমি কেবল উপলক্ষ। আমি তার দাস। তাঁর কার্য তিনি করেন। আজ আমার হৃদয় আনন্দে ভরপুর। —তাঁর মন্দির উত্তর কলকাতায় তাঁরই লীলাস্থলে প্রতিষ্ঠা হওয়াতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। তোরা কত খেটেছিস্, তোরাও ধন্য।"

৫ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৪৩ সন।

সন্ধ্যার সময় স্বামীজী মহারাজ সমবেত ভক্ত কিরণবাবু, মহেন্দ্রবাবু, মণীন্দ্রবাবু, মৃণালবাবু ও অন্যান্য ভক্তদিগকে বলিলেন,—"এখানে পচা বস্তি ছিল। দেখুন, এখন এখানে ফুল ফোটান হয়েছে! কি তাঁর ইচ্ছা!

কিরণবাবু—"পাঁকেতেই পদ্মফুল ফোটে।"

স্বামীজী মহারাজ—"এই পথ দিয়ে কত যাতায়াত করতেন। উত্তর কলকাতায় বাগবাজার, শ্যামপুকুর ও শিমলা,—এই তিন জায়গা হচ্ছে তাঁর লীলাস্থল। এই শ্যামপুকুরের বাসায় যখন তিনি পীড়িতাবস্থায় ছিলেন তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তাঁর কত সেবা করেছি। এই তিন জায়গায় কত ভক্তদের বাড়ীতে তিনি দক্ষিণেশ্বর হতে যাতায়াত করতেন। তাঁরই লীলাস্থলে

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল,—কলিকাতায় কিছু হয়। তাঁর সাধও পূর্ণ হল। পঞ্চাশ বৎসরে কত পরিবর্তন দেখছি। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব হত, তখন ৩০ কি ৩৫ জন ভক্তের সম্মিলন হত। চিড়ের মহোৎসব হত। শতবার্ষিকী উপলক্ষে আজ তাঁর উৎসব সারা জগৎ-ব্যাপি হচ্ছে। তাঁর নাম প্রচার হয়ে যাচ্ছে। জগতে তাঁর প্রভাব বিস্তার হচ্ছে। আরো কালে কত কি হবে! আমরা যে এসব দেখে যেতে পারলাম, এতেই আমাদের আনন্দ।"

১২ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৪৩ সন।

সন্ধ্যার সময় স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—তোর নাচ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, যেন ভাবের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের মত নাচছিলি। ঐরকম ভাবে মেতে যেয়ে নিজেকে ভুলে যেতে হবে, তবে ত এই অহংভাব বিলীন হবে। তোদের আনন্দ দেখে আমারও ইচ্ছা হয়েছিল যে তোদের সঙ্গে যোগদান করি। তাইতে আমি নীচে যাই। তোরা তখন মন্দির প্রদক্ষিণ করছিলি।

১৩ই বৈশাখ, সোমবার, ১৩৪৪ সন।

অপরাহ্নে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—তোর বুড়ী মা, শরীর খারাপ! এই আছে, এই নেই! দূরে কোথাও যাবি না। তার কাছে থেকে তার সেবা কর। মাতৃদেবো ভব। তাঁর আশীর্বাদে তোর অনেক উপকার হবে। তুই ছাড়া তোর মার আর কে আছে? হাজার পিতার চেয়ে এক মা বড়। প্রাণ ঢেলে মায়ের সেবা কর। তুই যদি তোর মাকে সেবা করে তার প্রাণঢালা আশীর্বাদ নিতে পারিস, তাতে তোর কল্যাণ হবে। মাকে সেবা করে সন্তুষ্ট কর।

১৯শে চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৪৩ সন।

স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—সর্বত্যাগী না হলে মনের একাগ্রতা আসে না। সংসারের কার্য করলে কি সকল সময় একাগ্রতা আসে? কখন একটু মনে একাগ্রতা আসল, আবার কখন মনে চাঞ্চল্যের ভাব উদয় হল।—ঠিক একাগ্রতা আসে না। নির্জনে বসতে হয়। মনকে বহির্মুখী কার্যে রাখলে চাঞ্চল্য হবেই ত! সংসারও করব, আবার ত্যাগের পথেও চলব, তা হয় না।

২০শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৪৩ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যের নিকট আসিয়া আনন্দে হাস্যানন হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন,—

"কে মা এলি গো গিরে রাজার বেটি !
দোনো ছোকরা বি সাথ্, দোনো ছুকরি বি সাথ্,
আর এক বেটা জুলপিকাটা,
বাঘটা কামড়ে নেছে টুটি।"

অতঃপর তিনি বলিলেন,—"শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গরস করার সময় নেচে নেচে এই গানটা গাইতেন। তাই আমরাও এই গান গাই।"

২৯শে চৈত্র, সোমবার, ১৩৪৩ সন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের message-ই স্বামীজীর message.

স্বামীজী মহারাজ সেবক শিষ্যকে বলিলেন,—"সেদিন স্বামীজী বললেন, কলকাতায় আমার কিছু করবার mission ছিল, তা' তুমি করেছ! তাইতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার সাধ পূরণ করলে। তুমি ঠিক ঠিক ঠাকুরের কাজ করছ। তুমি ঠাকুরের সন্তান। তুমি ঠাকুরকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানে তিনি যাবেন।"

—"সেদিন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা কি মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন উপস্থিত ছিলেন?"

স্বামীজী—হাঁ! শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার প্রিয়তম সন্তান! তুমি আমার ঠিক ঠিক কাজ করছ। তোমার কাজে আমি সর্বদাই সন্তুষ্ট আছি। তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি।

স্বামীজী মহারাজ—আপনার এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করাতে কি ভাল হল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল হল বৈ কি! এতে কত লোকের তুমি উপকার করলে। ভবিষ্যতে এত লোক আসবে, তখন সামলাতে পারবে না। সামলান দায় হবে।

স্বামীজী মহারাজ—টাউন হলের লেকচারের সময় আপনারা কি উপস্থিত ছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাঁ, আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। তোমার বক্তৃতা খুব ভাল হয়েছে। তোমার বক্তৃতায় প্রাণ ছিল। আর কারও বক্তৃতায় প্রাণ ছিল না। আমি প্রাণে সন্তুষ্ট হয়েছি।

স্বামীজী মহারাজের উপস্থিতিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলিলেন,—আজ কেমন সুন্দর atmosphere হয়েছে। আমার প্রিয়তম গুরুভাই এসেছে।

গঙ্গাধর মহারাজেরও message—গুরু মহারাজ আমাকে বলেছেন।

৩০শে চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৪৩ সন।

পঞ্চপাণ্ডব ঃ

মধ্যাহ্নে স্বামীজী মহারাজ সুরেশবাবুর প্রদত্ত ডাব পাঁচটি দেখিয়া সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—"এই পাঁচটি ডাব পঞ্চপাণ্ডবকে দিবি।"

সেবক-শিষ্য—পঞ্চপাণ্ডব কে কে?

স্বামীজী মহারাজ—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির হচ্ছে সুধন্য। ও-ই রাজসিংহাসনে বসবার উপযুক্ত! তুই হচ্ছিস ভীম, প্রজ্ঞা হচ্ছে অর্জুন, শান্ত নকুল আর চণ্ডী হচ্ছে সহদেব।

সেবক-শিষ্য—লক্ষ্মণ দা হচ্ছে বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেব।

স্বামীজী মহারাজ—হাঁ!

সেবক-শিষ্য—শ্রীকৃষ্ণ কে?

স্বামীজী মহারাজ—শ্রীরামকৃষ্ণ। এখন শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে। (এই বলিয়া স্বামীজী মহারাজ স্বীয় হৃদয়ে দেখাইলেন।) এখন অভেদানন্দরূপী শ্রীকৃষ্ণ।

সন্ধ্যার সময় স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—পঞ্চপাণ্ডব ডাব খেয়েছ ত?

সেবক-শিষ্য—হাঁ!

স্বামীজী মহারাজ—আজ চৈত্র সংক্রান্তির দিন। পঞ্চপাণ্ডবকে আমি ডাব খাইয়ে পুণ্য সঞ্চয় করলাম।

৯ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৪ সন।

মধ্যাহ্নে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—আমার যদি টাকা থাকত তাহলে বাঙ্গালী সাধুদের জন্য ঐ অঞ্চলে (হরিদ্বার, হৃষীকেশ, স্বর্গাশ্রম) ডাল-ভাতের জন্য ছত্র খুলে দিতাম। কেবল বাঙ্গালী সাধুরা ভিক্ষে পাবে। অড়র ডাল-রুটি বাঙ্গালী ধাতে সয় না। রোজ রোজ খেয়ে পেটে চড়া পড়ে যায়। ও ঐ দেশের সাধুদের পোষায়। আমাদের প্রত্যেকেরই রক্ত আমাশয়ে

ভুগতে হয়েছে। মহাদেবানন্দ স্বামী যদি একটি ছত্র খুলে দেয়, তাহলে ভাল হয়! মিশন কনখলে ও কাশীতে সেবাশ্রম করাতে ভালই হয়েছে।

বাঙ্গালীদের মধ্যে কত বড়লোক আছে! তারা ইচ্ছা করলেই ছত্র খুলে দিতে পারে! প্রাণ নাই। সাধুদের উপর বাঙ্গালীদের শ্রদ্ধা নাই। ওদেশে সাধুদের উপর লোকের খুব শ্রদ্ধা! গেরুয়া যে পরেছে সে-ই নারায়ণ। গেরুয়া পরে যখনই তোমার কাছে এসেছে, তখনই তুমি নারায়ণ জ্ঞানে তাঁকে ভক্তি করবে। এ ভক্তি বাঙ্গালীদের নাই, ওদের আছে।

অতিথি হচ্ছে নারায়ণ। সর্বদেবময় অতিথি। অতিথির মধ্যে সকল দেবতা বিরাজ করছেন। যখনই তোমার দ্বারে এসে একজন হাত পেতেছে, তখন তুমি তাকে আদর করে বাড়ীতে এনে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করবে। পিতৃহন্তাও যদি তোমার অতিথি হয়, তোমার পরম শত্রু, তাহলেও তুমি তার সেবা করবে। ওদের দেশেও guest-এর আদর আছে। তবে, এ ভাবের নয়। এ ভাব এক ভারতেই আছে। অতিথি সৎ হউক, কি অসৎ হউক, তা তোমার বিচারের অধিকার নাই। তুমি বিচার করবার কে? তুমি কেবল নারায়ণজ্ঞানে সেবা করবে!

এইদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—যে যাই করুক, এখন, এ যুগে রামকৃষ্ণ নামেই সকলে উদ্ধার হবে। এ শ্রীশ্রীঠাকুরের যুগ। দেখবি পরে। জগতে তাঁর নাম ছেয়ে যাবে।

১০ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৪৪ সন।

অপরাহ্নে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—গরীব হলেই বা! ভগবান্ বিদুরের ক্ষুদ গ্রহণ করেন। তিনি ভক্তি চান। ভক্তি থাকলেই হল। তারপর স্বামীজী মহারাজ গান গাহিতে লাগিলেন,—

ম্যয় ত গরীব, গরীব রহু,
তোম্ ক্যায়সে গরীব নেওয়াজ কাহায়ো!

—সবাই কেন তোমাকে গরীবের ত্রাণকর্তা বলে? আমি তো গরীব রইলাম।

তারপর স্বামীজী মহারাজ আবার গান গাহিতে লাগিলেন,—

প্রভু মৈ গোলাম, মৈ গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥

দো রোটি, এক লেঙ্গটি তেরে পাস্ মৈ পায়া।
ভকতি ভাব দে আরোগ, নাম তেরা গাওয়া ॥
তু দেওয়ান, মেহেরবান, নাম মেরা বারেয়া।
দাস কবীর শরণে আয়া চরণ লাগে তারেয়া ॥

১২ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৪৪ সন।

মধ্যাহ্নে স্বামীজী মহারাজ দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে শিষ্যকে বলিলেন,—“মৃত্যুর কবল হতে যে সুভাষবাবু বেঁচেছেন, এ ভগবানের তার উপর বিশেষ কৃপা। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি রোগমুক্ত হন, নীরোগ শরীর লাভ করুন। ভাল স্বাস্থ্য লাভ করে এসে আবার দেশের কাজ করুন। ওর দ্বারা দেশের অনেক উপকার হবে। জহরলালের পর ওর মত উপযুক্ত নেতা আর ভারতে নাই। ওর ভিতর রয়েছে firey spirit.

বাংলায় যদি সকলেই ওকে সর্ববাদী সম্মতিক্রমে leader বলে স্বীকার করে নেয়; তাহলে বাংলায় কংগ্রেসের কত জোর হল। বাংলাইত ভারতের মাথা। বাংলা যত কংগ্রেসের জন্য কষ্ট স্বীকার করেছে, এমন India-তে কোন province করে নাই! মুসলমান নেতারা যদি একটু উদার হয়, তাহলে ভাল হয়। হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে কাজ করলে কংগ্রেস অনেক এগিয়ে যেত। তাহলে ইংরেজ ঘায়েল হত।

সেবক-শিষ্য—সুভাষবাবুর বাড়ীর সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে।

স্বামীজী মহারাজ—করবে না? চরিত্রবান্ লোক। যে চরিত্রবান্, তার কাছে সকলেই মাথা নত করবে।

সেবক-শিষ্য—সুভাষবাবুকে যেদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অভ্যর্থনা করা হয়, সেদিন প্রায় পাঁচশ টাকার মালা তাঁকে উপহার দেয়। একটা ট্যাক্সিতে করে মালা নিতে হয়েছে। বাড়ীতে বারান্দায় ঐ সব বিভিন্ন রকমের মালা ঝুলিয়ে রাখে।

স্বামীজী মহারাজ—সে যা দেশের জন্য কষ্ট স্বীকার করেছে, তার তুলনায় পাঁচশ টাকার মালা কিছুই নয়। লক্ষ টাকার মালা দিলেও তাঁর উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হয় না;—ভারতের কৃতি সন্তান।

১৪ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৪৪ সন।

ফরিদপুরের অঘোরবাবুর পুত্রকে স্বামীজী মহারাজ প্রাতঃকালে বলিলেন,—

"রামানুজের, নিম্বার্কের, মাধবাচার্যের, বল্লভাচার্যের,—এঁদের সকলের চেয়ে শঙ্করের বেদান্ত উচ্চ। সকলেই মনগড়া এক শঙ্কর তৈরী করে তাঁকে খণ্ডন করছে। কিন্তু বাস্তবিক শঙ্করকে কে খণ্ডন করে? শঙ্করের বেদান্ত সকলের উচ্চে।

End of knowledge হচ্ছে—ব্রহ্মজ্ঞান। বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝছ তা relative (আপেক্ষিক) জ্ঞান। বুদ্ধির পারে যেতে হবে।

বেলা প্রায় ১২টার সময় স্বামীজী মহারাজ শিলং-এর শ্রীযুক্তা স্নেহলতা ধরকে বলিলেন,—"তোমার মনে আছে, অম্বুবাচীর সময় তোমাকে আমি গরম দুধ খেতে আদেশ করেছিলাম? আমি বললাম,—যা পাপ হবে, আমি নিলাম।"

স্নেহলতা—"বেশ মনে আছে। আপনিইতো আমাকে বাঁচালেন। আপনি আমাকে অসীম কৃপা করছেন। আপনার কৃপাতেই ত' বেঁচে আছি।"

২৬শে কার্তিক, শুক্রবার, ১৩৪৪ সন।

সন্ধ্যার সময় সমবেত ভক্তদের মধ্যে জনৈক ভক্ত স্বামীজী মহারাজকে কহিলেন,—"আপনাদের মধ্যে আপনিত খুব কঠোরতা করেছেন। এই বইয়েতে আপনাদের আলমবাজার ও বরানগর মঠের তপস্যার কথা উল্লেখ আছে। অপনাদের বর্তমান জীবন দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না যে আপনারা পূর্বজীবনে কত কঠোর তপশ্চর্যা করেছেন।"

ঐ ভক্তটির উক্তি শুনিয়া স্বামীজী মহারাজ কহিতে লাগিলেন,—"আমেরিকাতেও কঠোরতা করেছি। Alaska, Canada, Maxico;—ঐ দেশের সকল স্থানেই গিয়েছি। ইউরোপেও রোম, বার্লিন, প্যারিস, লণ্ডন,—সকল স্থানেই গিয়েছি,—lecture দিয়েছি। স্বামীজীতো বেশীদিন ওদেশে থাকতে পারেন নি। আমাকে পঁচিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। তার ফলেই বর্তমান সাধুদের ও-দেশে কাজ করতে সুবিধা হচ্ছে। স্বামীজীর অল্প বয়সে দেহত্যাগ হয়েছে। তিনি দীর্ঘায়ু পেলে বহু কাজ করে যেতে পারতেন।

১৮ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩ সন।

মধ্যাহ্নে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—"১লা বৈশাখ শান্তিনিকেতনের Chinese Hall জহরলাল open করবে। রবি ঠাকুর একটা

কীর্তি রেখে গেল, যেমন বৌদ্ধ যুগে হয়েছিল। নালন্দা University হতে শিক্ষার প্রচার হত। একশটা pulpit হতে শিক্ষা দেওয়া হত। University-র সঙ্গেই Chapel থাকত।

আমার জীবনেও ঐ রকম idea ছিল কিন্তু তা' করে যেতে পারলুম না। জীবনটা বাধাবিঘ্ন কাটাতে কাটাতে গেল। এখন তো বুড়ো হয়েছি! তা যা হবার তাই হবে, আমি আর কি করব! শ্রীশ্রীঠাকুরের যা ইচ্ছা, তাই হবে!

এখন বুঝলি, শ্রীশ্রীঠাকুর কেন আমাকে কলকাতায় আনলেন! কলকাতায় না আসলে কি এই মন্দির হত?

সেবক-শিষ্য—না।

স্বামীজী মহারাজ—তাঁর কার্য তিনি কি ভাবে কাকে দিয়ে করিয়ে নেন, তা' তিনিই জানেন।

১লা অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৪৪ সন।

প্রাতঃকালে ডাক্তার সুরেন্দ্রমোহন স্বামীজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —মহারাজ, কি কাজ করলে মনে শান্তি পাওয়া যায়?

স্বামীজী মহারাজ—ভগবানের নাম করলেই শান্তি পাবেন।

সেবক শিষ্য—একদিন বৈকালবেলা বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি কথাপ্রসঙ্গে আপনার বাল্যকালের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন (২৯শে মে, ১৯৩৭ সন),—কালী ছিল ডানপিটে কঠোরী। যে কাজ একবার ধরত, সেই কাজ সমাধা না করে ছাড়ত না। ওর এই রকম রোক্ ছিল। কালীকে কেউ তর্কে পরাজিত করতে পারত না। ও যখন যে ভাব নিয়ে তর্ক করত, সেই ভাবের মতকে প্রতিষ্ঠা করত। আমি বরাবরই ওর পক্ষে মত দিতাম। তা' বলে কি ওর সঙ্গে তর্ক করতাম না? তা' করতাম। ওকে উস্‌কে দিতাম কিছু শুনব বলে।

কালী খুব ভয়ঙ্করী কঠোরী ছিল। আমি বাড়িয়ে একটুও বলছি না। ওর কঠোরতার কথা ভাবলে গা' শিউরে উঠে। ও কারও খাতির রেখে কথা বলত না, স্পষ্ট বক্তা।

একবার রামদার বাড়ীতে আমি, লেটো ও কালী উপস্থিত ছিলাম। অন্যান্য আরও লোক ছিল। রামদা'ত আমাদের চেয়ে বয়সে কত বড়। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের চেয়ে ঢের বেশী। আমরা তখন ছেলেমানুষ গা। তাঁর সঙ্গে কথা

কওয়াই ভার!—আর তর্ক করাতো দূরের কথা। সেইদিন দেখলুম, কালী সমানে সমানে রামদার সঙ্গে তর্ক করলে গা। আমরা তখন সকলে বসে চুপ করে শুনছিলাম। রামদাকে তর্কে কালী কোন অসম্মানসূচক কথা বলে নাই, অথচ কি সুন্দরভাবে নিজের ভাবের মতে তর্ক করে গেল। কালীকে রামদা হারাতে পারে নাই। আমরা তখন ভাবছিলাম, এই ছোঁড়াটার মধ্যে তেজ আছে। এ একদিন উঠবে। কালীকে আমরা সকলে ভয় করতাম। ওটা ছিল ডেয়ো পিঁপড়ে।

স্বামীজী মহারাজ—আমার এ ঘটনা মনে নাই। বেশ ত! মহেন্দ্র দত্ত ঠিক কথা বলেছে।··· স্বামীজীও আমার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠতেন না। স্বামীজী বলতেন,—যা, যা, তোর সঙ্গে কি তর্ক করব! স্বামীজী lecture দিতেন,—তার নিজের lecture-এই তিনি নিজেকে contradict (খণ্ডন) করতেন। আমি বলতাম, আপনি lecture-এ বললেন কি? আপনি আপনাকেই খণ্ডন করছেন। তিনি বলতেন, যা মুখে এসেছে তাই বলেছি! রেখে দাও!

গাজীপুরে শিশির বসুর বাড়ীতে ছিলাম। তখন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ,—হরিপ্রসন্ন, গাজীপুরে। এক বড় পণ্ডিতের সঙ্গে আমার অদ্বৈত-বেদান্ত নিয়ে তর্ক হয়েছিল। তাকে আমি পরাজিত করেছিলাম। তাইতে বিজ্ঞানানন্দ আনন্দিত হয়ে বলেছিল, "কালী মহারাজকে তর্কে কেউ হারাতে পারবে না।"

৩রা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৪৪ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ যতীশকে বলিলেন,—জীবনের সকল দুঃখকষ্ট-বিঘ্নের মধ্যে নিজেকে ঠিক রাখতে হবে। ধৈর্য ধরে সকল কার্য করতে হবে,—কিছুতেই বিচলিত হবে না। সাধু হওয়া বড় কঠিন।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪৪ সন।

সন্ধ্যার পর স্বামীজী মহারাজ আনন্দোৎফুল্ল মনে সেবক-শিষ্যকে কহিলেন, —"এ্যায়সা দিন নাহি রয়ে গা।" দেখছিস্, শরীরের সব muscle গলে যাচ্ছে। অঙ্গং গলিতং। —এখন বুঝতে পারছি, বার্ধক্য এসেছে। তোরও এ অবস্থা হবে। তখন আর এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে পারবি না। তাই বলছি, এ্যায়সা দিন নাহি রয়ে গা। অতীতের দিকে তাকালে জীবনের কত

কথাই না মনে পড়ে! এ জীবনে কত কাজ করা গেল! একবার ভাবলে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই। মরিয়া হয়ে কাজ করেছি।

১৪ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৪৪ সন।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার দুর্গাপদকে স্বামীজী মহারাজ বলিলেন,—নির্গুণ ব্রহ্মকে কল্পনা করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান দ্বারাও তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না,—অবাঙ্‌মানসগোচরম্‌।"

১৬ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৪ সন।

সন্ধ্যার পর স্বামীজী মহারাজ ডাক্তার দুর্গাপদকে কহিলেন,—"ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্মেতেই আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলে মানতেন। Religion is the science of soul.

১৮ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪৪ সন।

প্রাতঃকালে অধ্যাপক শ্রীযুত শিশিরকুমার আচার্য মহাশয় স্বামীজী মহারাজের অসুস্থতা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করাতে স্বামীজী মহারাজ তাহাকে বলিলেন,—এ শরীর কি আমার? এ শরীর যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিয়েছি। এ তাঁর শরীর। তিনি যতদিন এ শরীরকে রাখবেন ততদিন থাকবে।

১৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৪৪ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ আনন্দিত হইয়া চেরী পুষ্পের কাহিনী কহিতে লাগিলেন,—"চেরীর ফল ফুলেরই মত দেখতে। খেতে বেশ লাগে। চেরী ফুলের বাইরের পাপড়ি দেখতে সাদা, আর মধ্যে গোলাপী রংয়ের আভা। ফুলের গন্ধও আছে। California-তে চেরী ফুলের বন আছে। যখন ফুল ফুটতে আরম্ভ করে, এই শীতের সময়, সব গাছের পাতা ঝরে পড়ে যায়। বসন্ত আসাতে গাছে নূতন নূতন পাতা হয়, গাছগুলি পুনর্জীবিত হয়। একেই resuraction বলে। চেরী গাছে পাতা না জন্মাবার পূর্বেই কিন্তু ফুল ফোটে, পরে পাতা জন্মায়। এত ফুল ফোটে গাছে যে, গাছ একেবারে ঢেকে যায়! ওঃ! সে এক অপূর্ব শোভা! গন্ধে সারা বনকে আমোদিত করে। আর এ সময়েই ওদের দেশে Easter festival হয়।

জাপানেও চেরী ফুলের বন আছে। ওদের দেশেও চেরীফুল খুব ফোটে। যখন ফুল ফোটে, তখন সারা দেশটা আনন্দে মেতে উঠে। যেমন আমাদের দেশে দোলের সময় হয়। এ হচ্ছে বসন্তের উৎসব। এই বসন্তোৎসব সব দেশেই আছে।

৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৪ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ ষষ্ঠীবাবু, প্রিয়বাবু, কৃষ্ণবাবু প্রভৃতিকে কহিলেন,—মনে যদি শান্তি পেতে চাও তবে আকাঙ্ক্ষা কমিয়ে দাও। পার্থিব জিনিস নশ্বর। শঙ্করাচার্য বলেছেন,—

যল্লভসে নিজ কর্মোপাত্তম্।
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥

—তুমি নিজ কর্মফলে যা লাভ করতে পার, তাইতেই চিত্তকে সন্তুষ্ট রাখ। ঈশ্বরের উপর নির্ভর রাখবে। যে ভগবানকে ডাকবে ভগবান তাকে রক্ষা করবেন।

১১ই পৌষ, রবিরার, ১৩৪৪ সন।

প্রাতঃকালে স্বামীজী মহারাজ অধ্যাপক শিশির আচার্য ও অন্যান্য ভক্তদিগকে বলিলেন,—কে কাকে উদ্ধার করে?

উর্দ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মানো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করবে। আত্মাকে অবসন্ন করবে না, অর্থাৎ নিম্নদিকে যেতে দিবে না। কেন না, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। নিজেকেই নিজের উদ্ধার করতে হবে। কেউ কাউকে উদ্ধার করতে পারে না।

১২ই মাঘ, বুধবার, ১৩৪৪ সন।

মধ্যাহ্নে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—বেঁচে থেকে লাভ কি? ছেলের বিয়ে দেখতে হবে? শরীর দুর্বল। এ শরীর আর বইছে না। যে আমি পৃথিবী ঘুরেছি, তিব্বতে গিয়েছি, সেই আমাকে আজ কাত করে রেখেছে। নীরোগ শরীরে স্বাধীনভাবে চিরদিন কাজ করে এসেছি, এখনও

তাই চাই। তা' যদি না হয়, মরে যাওয়া ভাল। পরমুখাপেক্ষী হতে চাই না। আমার সেবার জন্য কাউকে আমি কষ্ট দিতে চাই না। একদিন ঘুমাতে যাব, বিছানায় যেন একেবারে শেষ নিদ্রা যাই। শ্রীশ্রীঠাকুর কি আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ করবেন ?

স্বামীজী মহারাজের এই বাণী শ্রবণে সেবক-শিষ্য মস্তক নত করিয়া স্তম্ভিত ও নির্বাক হইয়া রহিল। তাহার মুখে কোন বাক্য আসিল না।

২৯শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৪ সন।

সন্ধ্যার পর স্বামীজী মহারাজ জামসেদপুরের সুরেশবাবুর নিকট বেলুড়ের নবনির্মিত শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরের ও উৎসবাদির বর্ণনা শুনিয়া, উপস্থিত সুরেশবাবু, ললিতবাবু ও অন্যান্য ভক্তদিগকে কহিলেন,—"শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই নিজের ছবি পূজা করে বললেন,—মা আমায় দেখালেন, এ ছবি ঘরে ঘরে পূজা হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্তি যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল। এ দেখেই আমার আনন্দ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কি দেখেছি। আর এখন কি দেখছি! কত পরিবর্তন!

৭ই মাঘ, শুক্রবার, ১৩৪৪ সন।

প্রাতঃকালে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শেষ শিষ্য, যিনি মর্ত্যলোকে এখনও খেলা করিতেছেন, তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া তাঁহার আশ্রমে আসিয়াছেন। তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানকে দর্শন করিয়া অপূর্ব আনন্দানুভব করেন এবং ধন্য হন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানও তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,—এ জগতে ভগবানই সত্য। তিনিই সকলের স্বামী,—জগন্নাথ। তাঁর উপর আত্মসমর্পণ করলেই শান্তি পাবেন।

২৩শে মাঘ, রবিবার, ১৩৪৪ সন।

প্রাতঃকালে বেলুড় মঠের স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী পবিত্রানন্দ মহারাজ পরমারাধ্য স্বামীজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজের সহিত তাহাদের বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হইতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বিশ্বানন্দ মহারাজকে বলিলেন,—

"মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্‌।
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্‌॥

—যৌবনের গর্ব করো না, জনের গর্ব করো না, ঐশ্বর্যের গর্ব করো না। ক্ষণকালের মধ্যে কাল সব হরণ করে নিবে। ভোগের দিকে মন দিও না। ত্যাগ দেখাও।"

রাত্রিতে সেবক-শিষ্য স্বামীজী মহারাজের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"শান্তিজল (সরস্বতী পূজার) এনেছি।"

স্বামীজী মহারাজ—দে। মাথায় দে।

সেবক-শিষ্য স্বামীজী মহারাজের শ্রীমস্তকে শান্তি জল দিলেন। তারপর সেবক-শিষ্য বিডন ষ্ট্রীটের পথের দিকে নানা সম্প্রদায়, ক্লাব, স্কুল-কলেজ, সঙ্ঘ ইত্যাদির প্রতিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে স্বামীজী মহারাজ আনন্দিত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া সেবক-শিষ্যকে বলিলেন,—"তোর চক্ষুতে আমার দেখা হল।"

স্বামীজী মহারাজ অতঃপর সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—"সরস্বতী দেবীকে বিসর্জন দিলি?"

সেবক-শিষ্য—সরস্বতীকে কি বিসর্জন দেওয়া যায়? প্রতিমাকে বিসর্জন দেওয়া হল।

স্বামীজী মহারাজ—সরস্বতীতো আমার জিহ্বায় রয়েছে।

১৬ই ফাল্গুন, সোমবার, শ্রীশ্রীশিবরাত্রি, ১৩৪৪ সন।

আজ শিবচতুর্দশী। সন্ধ্যা অতীত হওয়ায় সেবক-শিষ্য তাহার পরম দেবতার গলায় নানাবিধ পুষ্পরচিত মাল্য বিভূষিত করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নানাবিধ পুষ্প ও বিল্বপত্র, তুলসী-দূর্বা দিয়া বার বার অঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং পরে স্বামী সদাত্মানন্দ মহারাজ ও ব্রহ্মচারী সদাশিব মহারাজও স্বামীজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে নানাবিধ পুষ্প দিয়া অঞ্জলি প্রদান করিলেন। তারপর আমরা তিনজনে সমবেত কণ্ঠে ভক্তিভাবে শ্রীশ্রীগুরুর স্তব আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। আর পরম দেবতা প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন,—"তোদের জ্ঞানলাভ হোক, ঈশ্বর-দর্শন হোক।"

তারপর সেবক-শিষ্য তাহার পরম দেবতার ললাটে ৺কাশী বিশ্বনাথের বিভূতির ফোটা প্রদান করেন। আর গণেশদা স্বামীজী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ

প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"আপনি সাক্ষাৎ শিব। আজকে রাত্রে আপনি আশীর্বাদ করুন,—কেবল আমাকে নয়,—সকল গুরুভাইদের এবং জীবজগতের সকলকে,—যাতে সকলের কল্যাণ হয়।"

রাত্রিতে আশ্রম প্রাঙ্গণের মাঠে ধুনি জ্বালান হয়। প্রভুর শ্রীমন্দিরে প্রহরে প্রহরে স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ মহারাজ শিব পূজা করিতে থাকেন। সাররাত ধুনী জ্বালান হয় ও সাধু ব্রহ্মচারিগণ "হর হর বম্ বম্" ও শিবনাম কীর্তন করিতে করিতে ও মাঝে মাঝে সঙ্গীত করিত করিতে ধুনির চারিদিকে নৃত্য করিতে থাকেন আর প্রহরের পূজান্তে সকলে শ্রীমন্দিরে অঞ্জলি ও স্তব পাঠ এবং জপ করিতে থাকেন। সেবক-শিষ্য ভৈরব সাজিয়া সকলের সহিত নৃত্য করিতেছিল। উপরের বারান্দা হইতে সদানন্দময় স্বামীজী মহারাজ ঐ নৃত্য দেখিয়া আনন্দে সকলকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। রাত্রিতে সেবক-শিষ্য ভৈরব সাজে স্বামীজী মহারাজের শয়নকক্ষে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তিনি সেবক-শিষ্যকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া কহিলেন,—"বাঃ, তোকে ঠিক ভৈরব মানিয়েছে। বেশ সেজেছিস্ তো! হাতে চিমটে—নাগা সাধুদের মত।"

এইরূপে আমাদের ঐ রাত্রি মহানন্দে কাটিয়া গেল।

১৭ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৪৪ সন।

প্রাতঃকালে সেবক-শিষ্য যখন স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, তখন তিনি তাহাকে আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "তোর নাচ দেখে আমি খুশী হয়েছি। তুইতো সারারাত সকলকে মাতিয়ে রেখেছিলি। "রূপবাণী"র বারান্দা হতে মেয়েরা তোর নাচ দেখে অবাক হয়েছে। একজন বলছিল,—"যেন সাক্ষাৎ শিব নৃত্য করেছেন।"

২৮শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৪৪ সন।

আজ একাদশী। সন্ধ্যা আরত্রিকের পর ভক্তেরা শ্রীশ্রীরামনাম কীর্তন করিলেন। তারপর সমবেত ভক্তেরা স্বামীজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। জনৈক ভক্ত স্বামীজী মহারাজের শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর করিলেন,—"বেশ আছি। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার অসুখ দিয়েছেন। আমি বিশ্রাম করতে পারছি। আমাকে টাকাও উপার্জন করতে হবে না, মেয়ের বিবাহও দিতে হবে না। ছেলের চাকুরীর চেষ্টাও করতে হবে

না। মহাসুখে আছি। কোন উদ্বেগ নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।" এ শরীর তাঁর যন্ত্র। তিনি যন্ত্রী। তিনি মহাশান্তিতে রেখেছেন।"

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৪৪। রাত্রি।

জনৈকা ভক্ত মহিলা তাঁহার গলার হার দীক্ষার সময় গুরুদক্ষিণা হিসাবে স্বামীজী মহারাজকে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। চণ্ডীদা (স্বামী সদাত্মানন্দ) এই কথা স্বামীজী মহারাজকে জ্ঞাপন করাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন, "হার দিয়ে কি করব? তার ব্যবহৃত। এ্যাকে কাঞ্চন, তাতে আবার রমণীর ব্যবহৃত। সোনায় সোহাগা। ওরে বাবা! শ্রীশ্রীঠাকুরই স্পর্শ করতেন না!"

১লা বৈশাখ, ১৩৪৫ সন।

প্রাতঃকালে প্রায় দশ ঘটিকার পূর্বে নববর্ষের শুভ দিনে সেবক-শিষ্য তাহার পরমারাধ্য দেবতা স্বামীজী মহারাজের শ্রীচরণে ১০৮টি পদ্ম দিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যের পূজা দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইয়া নগেন্‌দাকে উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিলেন,—"নগেন্, নগেন্।"

নগেন্‌দা আসিলেন।

স্বামীজী মহারাজ তাহাকে বলিলেন, "গ্যাখ, গ্যাখ, রবি আমাকে কেমন সুন্দর সাজিয়েছে। পা পদ্মে একেবারে ঢেকে গিয়েছে।"

নগেন্‌দা ও শিষ্য ভক্তিসহকারে স্তব পাঠ করিতে লগিলেন। স্বামীজী মহারাজ নগেন্‌দাকে কহিলেন,—"আশ্রমে আর যে যে আছে, সকলকে ডেকে নিয়ে আয়।"

অতঃপর আশ্রমের সকল সাধুই ঐ উৎসবে আসিয়া যোগদান করিলেন। শান্তদা, লক্ষ্মণদা, মাধব মহারাজ, প্রজ্ঞা মহারাজ, সুধন্যদা, যতীশ, চণ্ডীদা, হেমন্ত, জগন্নাথ, আশুদা, রঞ্জিত, বঙ্কিম মহারাজ প্রভৃতি স্বামীজী মহারাজের শ্রীচরণের শোভা দর্শনে পুলকিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া সমবেত কণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরুস্তব আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য পুরুষ ও মহিলাগণ এই দৃশ্য দর্শন করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। অতঃপর স্বামীজী মহারাজ একটু সন্দেশ গ্রহণ করেন। ঐ প্রসাদ উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রদান করা হয়। সারাদিন ঐ প্রসাদী পদ্মফুল আগত ভক্তগণকে বিতরণ করা হয়।

১৪ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৫ সন।

সন্ধ্যার পর স্বামীজী মহারাজ ডাক্তার দুর্গাপদকে কহিলেন,—"শনিবার দিন সুভাষবাবুর মা এখানে এসেছিলেন। সুভাষবাবুর ছোট ভাই শৈলেশবাবু ও তার স্ত্রী এসেছিল। বুড়ীর টঙ্গ আছে, খুব ভক্তি। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখেছেন বলরামবাবুর বাড়ীতে। বলরামবাবুদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে। সুভাষবাবুর কথা বলেছিলাম, তিনি দেশের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করছেন। এতকাল জেলে ছিলেন। এখন তিনি যে সম্মান পেয়েছেন, এ তার উপযুক্ত দানই হয়েছে। বাঙ্গালীর গৌরব। বহু বৎসর পর বাঙ্গালী কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হল।

সেবক-শিষ্য—সুভাষবাবুর মা বলেন,—সুভাষ ভগবানের সন্তান, ঈশ্বরের কাজ করতে এসেছে,—কর্মযোগী। কাজ হয়ে গেলেই চলে যাবে। নয় বৎসর বয়সে বিবেকানন্দ স্বামীর বই হড়্ হড়্ করে পড়ত। সুভাষ যেখানে যা পাবে, তা আমাকে এনে আগে দেবে। আমাকে খুব ভক্তি করে। সুভাষ মাতৃভক্ত।

স্বামীজী মহারাজ—সুভাষের মার ঈশ্বরে খুব বিশ্বাস। খুব ভক্তিমতী। সাত ছেলের মা। ছেলেরা সব হীরের টুক্‌রো! সৌভাগ্যবতী!

২০শে বৈশাখ, বুধবার, ১৩৪৫ সন।

মধ্যাহ্নে স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—সর্বত্যাগ না হলে শান্তি পেতে পারে না। সর্বত্যাগ মানে আসক্তি ত্যাগ।

২১শে বৈশাখ, বুধবার, ১৩৪৫ সন।

সন্ধ্যার পর স্বামীজী মহারাজ সুরেশ ও সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—সাংসারিক লোকগুলি কত কষ্ট পাচ্ছে, তবু আসক্তির জিনিস ত্যাগ করতে পারে না। দুইটা জিনিস,—এই জিহ্বা আর উপস্থকে (লিঙ্গ) যে দমন করতে পারে, তার আর এই জগতে জয় করার কিছু বাকি থাকে না। দুনিয়াতে তাকে কেউ বাঁধতে পারে না। সে-ই প্রকৃত বীর। আমি পৃথিবী ঘুরে এলাম, কেউ আমাকে কোথাও, কোন জায়গায় আটকাতে পারে নাই।

দুনিয়ার লোকগুলি খেতে চায় আর রমণ করতে চায়!—এ বৈ-ত আর কিছু নয়।

সাধারণতঃ মানুষের মন মূলাধার ও সাধিষ্ঠানে আবদ্ধ থাকে। এই দুই স্থানে মন আবদ্ধ থাকলে মনেতে কামভাব জাগে। মনিপুরে মন থাকলে ভাল

ভাল জিনিস খেতে ইচ্ছা হয়। মনেতে খুব কামভাব জেগেছে, তখন এই আজ্ঞাচক্রে মনকে তুলে ধ্যান কর। ধ্যানেতে ডুবে যাও। ঐ দেখ আমার গভীর ধ্যানের ফটো,—কালী তপস্বীর ফটো। ঐ রকম ধ্যানে ডুবে যেতে হবে। তখন দেখবে, তোমার কামভাব কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। এই সব কথা কাকে বলব, কেই-বা শুনে, কেই-বা বোঝে!

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃনোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

১৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৫ সন।

রাত্রিতে আহারের সময় স্বামীজী মহারাজ সেবক-শিষ্যকে কহিলেন,—আমার কোন বাসনা নাই। এই আশ্রম শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে দেবোত্তর করে দিয়েছি। এখন সব তাঁর। আমার আর কোন আশ্রম করা, কি অন্য কোন কাজ করা,—সে বাসনা নাই। বাসনা থাকলেই জন্মাতে হবে। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের যদি এ শরীরকে দিয়ে তাঁর কাজ করানোর উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন, তা' না হলে মেরে ফেলবেন। তিনি যা করবেন, তা-ই হবে। আমার নিজের কোন ইচ্ছা নাই। এখন আমার ভাব হচ্ছে—প্রভু, মঁ্যায় গোলাম, মঁ্যায় গোলাম, মঁ্যায় গোলাম তেরা।"

৩২শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৬ সন।

কিশোরীদা স্বামীজী মহারাজকে প্রশ্ন করিলেন,—মনের জোর হয় কিসে, মহারাজ?

উত্তরে স্বামীজী মহারাজ বলিলেন,—দৃঢ় করে প্রতিজ্ঞা করবে।

কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজ বলিলেন,—যে এই জিহ্বা ও লিঙ্গকে দমন করতে পারে, তার আর জগতে কি রইল? সে-ত মুক্ত পুরুষ! এই কাম-ক্রোধ ও লোভই মানুষকে নরকের দ্বারে নিয়ে যায়। এই তিনটির বেগ যে ধারণ করতে পারে, সে-ই জগতে সুখী।

১৫ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৪৬ সন।

শিষ্য—মনের বৃত্তি কি?

স্বামীজী মহারাজ—চিন্তাশক্তির আবর্ত।

অতঃপর তিনি পাতঞ্জল দর্শন হইতে অনেক আলোচনা করিলেন।

১৭ই ভাদ্র, রবিবার, ১৩৪৬ সন।

জনৈক ভক্ত—অনুভূতি কিসে হয় জীবনে?

স্বামীজী মহারাজ—প্রার্থনা করবে।

ভক্ত—দীক্ষা যদি না লই, রামকৃষ্ণ দেবকে ভগবান্ জ্ঞান করে ভক্তি করি, চিন্তা করি,—তা'হলে হবে তো?

স্বামীজী মহারাজ—দীক্ষার প্রয়োজন আছে। সদ্গুরুর অনুসন্ধান করে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে হয়। গুরু হচ্ছেন পথপ্রদর্শক। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবেন, তিনিই সদ্গুরু জুটিয়ে দেবেন। গুরু না হলে পথ বাত্‌লাবে কে? বহু পথ। কি করে খুঁজে নেবেন? যিনি পথ প্রদর্শক, তিনি গুরু। সৎচরিত্র, ত্যাগী, সাধু ব্যক্তি গুরুপদবাচ্য। গুরু না হলে জপ-ধ্যান কি করে শিখবেন? যাঁর উপর শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়, তাঁকে গুরুরূপে বরণ করবেন।

স্বামীজী মহারাজের, দেহত্যাগের (২২শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৪৬ সন) কয়েকদিন পূর্বে ভূতনাথবাবুর ছোট মেয়ে যোগা স্বামীজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছে।

যোগা—মহারাজ, আপনি কেমন আছেন?

স্বামীজী মহারাজ—(হাসিয়া) আর কেমন আছি! দেখছিস্ না! পেটটা গর্ভের মত হয়েছে। গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করছি।

যোগা—(হাসিয়া) আপনি কি গর্ভযন্ত্রণা বোঝেন? আপনারা পুরুষ মানুষ, কেমন করে বুঝবেন?

স্বামীজী মহারাজ—কত গরু, ঘোড়া, মুরগী, হাঁসের প্রসব হতে দেখেছি। তাই দেখে অভিজ্ঞতা হয়েছে। তা' আমরা বুঝতে পারি।

আমেরিকায় আশ্রমে আমাদের গরু ছিল, ঘোড়া ছিল। তাদের গর্ভের প্রথম অবস্থা হতে শেষ,—প্রসব পর্যন্ত সব লক্ষ্য রাখতে হত। ওরা অবোলা। ওদের হাবভাব দেখে, সব বুঝে ঠিক করতে হয়। জানোয়ার পোষা কি সোজা কথা? আমার সব বিষয়েই জ্ঞান আছে, বুঝলি?

যোগা—(হাসিয়া) বাব্বাঃ! আপনি সব জানেন।

স্বামীজী মহারাজ—কেবল রোগভোগটা বাকি ছিল। সেই রোগ ভোগ এখন কচ্ছি। ঐ ডাক্তারী-কবিরাজী চিকিৎসা বাকি ছিল। সেই বিষয় এখন শ্রীশ্রীঠাকুর শেখাচ্ছেন। আমি একজন আদর্শ রোগী! মৃত্যুর পূর্বে এই জ্ঞান লাভ করে যাচ্ছি। শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় বলেছিলেন,—'তোকে সব শিখ্‌তে হবে।'

কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে একদিন গভীর রাত্রে স্বামীজী মহারাজ উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছেন,—

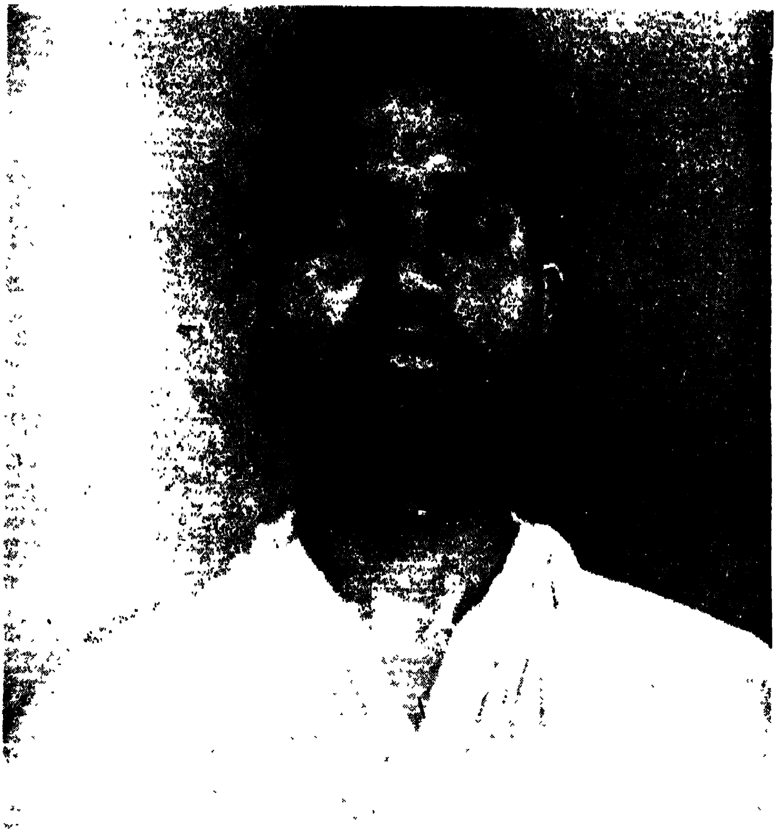
"গুণদোষ বিবর্জিত তত্ত্বমসি,
সুখ দুঃখ বিবর্জিত তত্ত্বমসি।
যদি গগনোপম তত্ত্বমসি,
কিমু রোদসি মানসি সর্বশিবম্‌॥

অতঃপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি সেবক-শিষ্যকে বুঝাইলেন। পরিশেষে তিনি বলিলেন, "এইটি যখনই আমি আবৃত্তি করি, তখন মনে শান্তি পাই। এইটি আওড়িয়ে আমি জগৎ ঘুরে এলাম।



পবিত্র দন্তমন্দির (বেলানগর)

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬, সোমবার, বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক ডাঃ আর আমেদ স্বামী অভেদানন্দের একটি দাঁত তোলেন। স্বামিজীর সেবক-শিষ্য, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার নিকট দাঁতটি লইবার জন্য প্রার্থনা করিলে স্বামিজী মহারাজ স্মিতহাস্যে শিষ্যকে বলেন—"তুই কি আমার দাঁতের মন্দির করবি? সিংহলের ক্যাণ্ডীতে যেমন বুদ্ধদেবের দন্ত মন্দির আছে।" স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের হৃদয়-তন্ত্রীতে তখন শ্রীমুখের এই বাণী যে ঝঙ্কার ও প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল, তাহারই বাস্তব রূপায়ণ হইয়াছে বেলানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে।





প্রনাম রত

সম্বুদ্ধ চৈতন্য



পরিব্রাজক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ।
শিকাগো (আমেরিকা)



নিউইয়র্কে পরিব্রাজক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের
সহিত শ্রীঅনুপ রায়চৌধুরী



নিউইয়র্ক বিমান বন্দরে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সহিত
শিখা রায় চৌধুরী ও প্রলয়শঙ্কর সরকার



স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
(বেলেঘাটা)



বিশ্বপথিক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ,—
সঙ্গে ডাঃ তপেন্দু বসুর পুত্র অনির্বান (শিকাগো-কাঙ্কাকী)



বিশ্বপথিক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সহিত
ডাঃ অমলেন্দু মজুমদার ও পূরবী মজুমদার (শিকাগো)



স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
(জামসেদপুর)



হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৩৮)
দেশ গৌরব সুভাষচন্দ্র বসু।

(শ্রীযুক্তা লালিমা বসুর সৌজন্যে ছবিখানি প্রাপ্ত)

স্বামী অভেদানন্দের প্রিয় স্তোত্রাবলী

স্তব

যে সকল স্তবস্তুতি শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আপন মনে আবৃত্তি করিতেন, তাহারই কিছু কিছু স্তোত্র এখানে সন্নিবেশিত হইল।

'আমি যখন পরিব্রাজক অবস্থায় ভ্রমণ করতাম তখন শুকদেবের এই মায়াশান্তি শ্লোক ও ভগবান শঙ্করাচার্যের কৌপীন-পঞ্চক আবৃত্তি করতাম।'

—স্বামী অভেদানন্দ

মায়াশান্তি শ্লোকাঃ

ভেদাভেদৌ সপদিগলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে
মায়ামোহৌ ক্ষয়মধিগতৌ নষ্টসন্দেহ বৃত্তিঃ।
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্যতত্ত্বাববোধং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥ ১ ॥

যদ্‌বাত্মানং সকল বপুষামেকমন্তর্বহিঃস্থং
দৃষ্ট্বা পূর্ণং খমিব সততং সর্বভাণ্ডস্থমেকম্।
নান্যং কার্যং কিমপি চ ততঃ কারণাদ্ভিন্নরূপং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥ ২ ॥

হেম্ন কার্যং হুতবহগতং হৈমমেবেতিতদ্বৎ
ক্ষীরে ক্ষীরং সমরসগতং তোয়মেবাম্বুমধ্যে।
এবং সর্ব সমরসতয়া ত্বং পদং তৎপাদার্থে
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥ ৩ ॥

যস্মিন্ বিশ্বং সকলভুবনং সামরস্যৈকভূতম্
যৎ উর্বীহ্যাপোঽনলমনিল খং জীব এতৎক্রমেণ।
যৎ ক্ষারাব্ধৌ সমরসতয়া সৈন্ধবৈকত্বরূপং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥ ৪ ॥

দ্রষ্টব্যার্থং পরমমমৃতং স্বাত্মবোধস্বরূপং
বুদ্ধ্যাত্মানং সকলবপুষামেকমন্তর্বহিঃস্থম্।
ভূত্বা নিত্যং সদুদিততয়া স্বপ্রকাশস্বরূপং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥ ৫ ॥

যদ্বন্নদ্যোঽম্বুধিপরিগতাঃ সাগরত্বং হ্যবাপ্তাঃ
তদ্বজ্জীবা লয়পরিগতাশ্চিৎস্বরূপং প্রপন্নাঃ।
ভেদাতীতং লয়পরিগতং সচ্চিদানন্দরূপং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥ ৬ ॥

কার্যাকার্যে কিমপি সততং নৈব কর্তৃত্বমস্তি
জীবন্মুক্তস্থিতিরিহগতো দগ্ধবস্ত্রাবভাসঃ।
এবং দেহে প্রবিলয়গতে তিষ্ঠমানোবিমুক্তো
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥ ৭ ॥

কস্মাৎ কোঽহং কিমপি চ ভবান্ কোঽয়মত্র প্রপঞ্চঃ
তৎ সংবেদ্যং গগনসদৃশং পূর্ণতত্ত্বপ্রকাশম্।
আনন্দাখ্যে সমরসঘনে বাহ্যমন্তর্বিহীনে
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥ ৮ ॥

সত্যং সত্যং পরমমমৃতং শান্তিকল্যাণরূপং
মায়ারণ্যে দহনমনিলং শান্তিকল্যাণদীপম্।
তেজোরূপং নিগমসদনং ব্যাস-
পুত্রাষ্টকং যঃ প্রাতঃকালে পঠতি
মনসা যাতি নির্বাণমার্গে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ ব্যাসপুত্রবিরচিতং শুকাষ্টকং নাম ময়াশান্তি-শ্লোকাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

কৌপীনপঞ্চকম্

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ১ ॥

মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ, পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমামন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ২ ॥

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ, স্বশান্তসর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মমুখে রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৩ ॥

দেহাদিভাবং পরিবর্তয়ন্তঃ, স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তো, ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৫ ॥

'কাশীতে যখন ছিলাম তখন আমি কাশী বিশ্বনাথের, মা অন্নপূর্ণার ও কাশীপঞ্চকম্ স্তোত্র আবৃত্তি করতাম।' —স্বামী অভেদানন্দ।

বিশ্বনাথাষ্টকম্

গঙ্গাতরঙ্গরমণীয়জটাকলাপং
গৌরীনিরন্তরবিভূষিতবামভাগম্।
নারায়ণপ্রিয়মনঙ্গমদাপহারং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ১ ॥

বাচামগোচরমনেকগুণস্বরূপং
বাগীশবিষ্ণুসুরসেবিতপাদপীঠম্।
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ২ ॥

ভূতাধিপং ভুজগভূষণভূষিতাঙ্গং
ব্যাঘ্রাজিনাম্বরধরং জটিলম্ ত্রিনেত্রম্।
পাশাঙ্কুশাভয়বরপ্রদশূলপাণিং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৩ ॥

শীতাংশুশোভিতকিরীটবিরাজমানং
ভালেক্ষণানলবিশোষিতপঞ্চবাণম্।
নাগাধিপারচিতভাস্বরকর্ণপূরং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৪ ॥

পঞ্চাননং দুরিতমত্তমাতঙ্গজানাং
নাগান্তকং দনুজপুঙ্গবপন্নগানাম্।
দাবানলং মরণশোকজরাঽটবীনাং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৫ ॥

তেজোময়ং সগুণনির্গুণমদ্বিতীয়-
মানন্দকন্দমপরাজিতমপ্রমেয়ম্।
নাদাত্মকং সকলনিষ্কলমাত্মরূপং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৬ ॥

আশাং বিহায় পরিহৃত্য পরস্য নিন্দাং
পাপে রতিঞ্চ সুনিবার্য মনঃ সমাধৌ।
আদায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৭ ॥

রাগাদিদোষরহিতং স্বজনানুরাগং
বৈরাগ্যশান্তিনিলয়ং গিরিজাসহায়ম্।
মাধুর্যধৈর্যসুভগং গরলাভিরামং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৮ ॥

বারাণসীপুরপতেঃ স্তবনং শিবস্য
ব্যাখ্যাতমষ্টকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্তকীর্তিং
সংপ্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ১০ ॥

অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্যরত্নাকরী
নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১ ॥

নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কাশ্মীরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ২ ॥

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্মার্থনিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্বৈশ্বর্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৩ ॥

কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৪ ॥

দৃশ্যাদৃশ্যপ্রভূতবহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ ॥

উর্বীসর্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী
বেণীনীলসমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্বানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৬ ॥

আদিক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী
কাশ্মীরা ত্রিজনেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরা শর্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জ্ঞানোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৭ ॥

দর্বী স্বর্ণবিচিত্ররত্নখচিতা দক্ষে করে সংস্থিতা
বামে স্বাদুপয়োধরী সহচরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী দৃশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৮ ॥

চন্দ্রার্কানলকোটিকোটিসদৃশা চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুণ্ডলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।
মালাপুস্তকপাশকাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৯ ॥

ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরশ্রীধরী।
দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১০ ॥

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্বতি ॥ ১১ ॥

মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১২ ॥

কাশীপঞ্চকম্

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ
সা তীর্থ্যবর্ষা মণিকর্ণিকা চ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ১ ॥

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং
চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্।
সচ্চিৎসুখৈকা পরমাত্মরূপা
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ২ ॥

কোশেষু পঞ্চস্বধিরাজমানা
বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহম্।
সাক্ষী শিবঃ সর্বগতোঽন্তরাত্মা
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ৩ ॥

কাশ্যাং হি কাশুতে কাশী কাশী সর্বপ্রকাশিকা।
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা ॥ ৪ ॥

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃ সাক্ষিভূতোঽন্তরাত্মা
দেহে সর্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি ॥ ৫ ॥

'এই হরগৌরীর স্তবটি গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ) বরাহনগর মঠে আবৃত্তি করত। সে এই স্তবটি আবৃত্তি করতে ভালবাসত।'

—স্বামী অভেদানন্দ

হরগৌর্যষ্টকম্

কস্তুরিকাচন্দনলেপনায়ৈ, শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥

মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ, কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ২ ॥

চলৎক্বণৎকঙ্কণনূপুরায়ৈ, বিভ্রৎফণাভাস্বরনূপুরায়।
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

বিলোলনীলোৎপললোচনায়ৈ, বিকাসিপঙ্কেরুহলোচনায়।
ত্রিলোচনায়ৈ চ বিষমেক্ষণায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥

প্রপন্নপৃষ্ঠে সুখদাশ্রয়ায়ৈ, ত্রৈলোক্যসংহারকতাণ্ডবায়।
কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

চাম্পেয়গৌরার্ধশরীরকায়ৈ, কর্পূরগৌরার্ধশরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটাধরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬ ॥

অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ, বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৭ ॥

সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ, সদাঽশিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৮ ॥

কখন কখন স্বামিজী মহারাজ শিবরাত্রির দিনে ও অন্যান্য দিনে শিবাষ্টকস্তোত্রম, বেদসারশিবস্তোত্রম্ এবং শিবনামাবল্যষ্টকম্ আবৃত্তি করতেন।

শিবাষ্টকস্তোত্রম্

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং, গুণহীনমহীশগরাভরণম্।
রণনির্জিতদুর্জয়দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ১ ॥

গিরিরাজসুতান্বিতবামতনুং, তনুনিন্দিতরাজিতকোটিবিধুম্।
বিধিবিষ্ণুশিরোধৃতপাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ২ ॥

শশলাঞ্ছিতরঞ্জিতসন্মুকুটং, কটিলম্বিতসুন্দরকৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনীকৃতপূতজটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৩ ॥

নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং, মুখপদ্মপরাজিতকোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিতভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৪ ॥

বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং, গরলাশনমাজিবিষাণধরম্।
প্রমথাধিপসেবকরঞ্জনকং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৫ ॥

মকরধ্বজমত্তমাতঙ্গহরং, করিচর্মগনাগবিবোধকরম্।
বরমার্গণলবিষাণধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৬ ॥

জগদুদ্ভবপালননাশকরং, ত্রিদিবেশশিরোমণিঘৃষ্টপদম্।
প্রিয়মানবসাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৭ ॥

অনাথং সুদীনং বিভো বিশ্বনাথ পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিলদুঃখসমূহহরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৮ ॥

বেদসারশিবস্তোত্রম্

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং
গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজুটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং
মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্॥ ১ ॥

মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং
বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং
সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ২ ॥

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং
গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং
ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ৩ ॥

শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্ধমৌলে
মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥ ৪ ॥

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং
নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥ ৫ ॥

ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু-
র্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেশো
ন যস্যাস্তি মূর্তিস্ত্রিমূর্তিং তমীড়ে ॥ ৬ ॥

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্ ॥ ৭ ॥

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮ ॥

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ
মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে
ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥ ৯ ॥

শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক-
স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি ॥ ১০ ॥

ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে
ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ
লিঙ্গাত্মকে হর চরাচরবিশ্বরূপিন্ ॥ ১ ॥

শিবনামাবল্যষ্টকম্

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতভয়সূদন মামনাথং
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ১ ॥

হে পার্বতী-হৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে
ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ।
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে
সংসার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২ ॥

হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র
লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব।
হে ধূর্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৩ ॥

হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব
গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৪ ॥

বারণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ
বীরেশ দক্ষমখকাল বিভো গণেশ।
সর্বজ্ঞ সর্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো
হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ।
ভস্মাঙ্গরাগ নৃকপালকলাপমাল
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৬ ॥

কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে হে
মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৭ ॥

বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিত বিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাধিবাস।
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৮ ॥

'ঐ গোমুখী, গঙ্গোত্রী, হৃষিকেশ, স্বর্গাশ্রমে ও হরিদ্বারে তপস্যা করতাম আর অঞ্জলি ভরে গঙ্গাজল পান করতাম। আহা! কি সেই সব দিন ছিল, আর মা গঙ্গার স্তব পাঠ করতাম।' —স্বামী অভেদানন্দ

গঙ্গাস্তোত্রম্

গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতম্।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
শৈলপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি
গাঙ্গ্যং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥

'এইটি বাল্মীকির রচিত। ভগবান শঙ্করাচার্যের রচিত গঙ্গাস্তোত্রও পাঠ করতাম।'

—স্বামী অভেদানন্দ

গঙ্গাস্তোত্রম্

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥ ১ ॥

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত-স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্ ॥ ৩ ॥

তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪ ॥

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে, পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৫ ॥

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি লোকে।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে, বিবুধবধূকৃততরলাপাঙ্গে ॥ ৬ ॥

তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥ ৭ ॥

পরিলসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥ ৮ ॥

রোগং শোকং পাপং তাপং, হর মে ভগবতি কুমতিকলাপং।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥ ৯ ॥

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য হি বাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥ ১০ ॥

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথ গব্যূতৌ শ্বপচো দীনো, ন পুনর্দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥ ১১ ॥

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তবমিমমমলং নিত্যং পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥ ১২ ॥

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ, তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুরমনোহরপজ্ঝটিকাভিঃ পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥ ১৩ ॥

গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঞ্ছিতফলদং বিদিতমুদারং।
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং, পঠতু চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্ ॥ ১৪ ॥

একদিন স্বামীজী মহারাজ স্নানের পর আনন্দোৎফুল্ল মনে গুর্বষ্টকম্ আবৃত্তি করিতেছেন,—

গুর্বষ্টকম্

শরীরং স্বরূপং সদা রোগমুক্তং,
যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
গুরোরঙিঘ্র-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ১ ॥

কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি সর্বং,
গৃহং বান্ধবাঃ সর্বমেতদ্ধি জাতম্।
গুরোরঙিঘ্র-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ২ ॥

ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা,
কবিত্বঞ্চ গদ্যং সুপদ্যং করোতি।
গুরোরঙিঘ্র-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৩ ॥

বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ,
সদাচারবৃত্তেষু সক্তস্তথাপি।
গুরোরঙিঘ্র-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৪ ॥

ক্ষ্মামণ্ডলেঽশেষভূপালবৃন্দৈঃ,
সদা সেবিতং যস্য পদারবিন্দম্।
গুরোরঙিঘ্র-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৫ ॥

যশশ্চেদ্ গতং দিক্ষু দানপ্রতাপা-
জ্জগদ্বস্তু সর্বং করে যৎ প্রসাদাৎ।
গুরোরঙিঘ্র-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৬ ॥

ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিমেধে,
ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্।
গুরোরঙিঘ্র-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৭ ॥

অরণ্যে ন বা স্বস্য গেহে ন কার্যে,
ন দেহে মনো মে বর্ততে ত্বনর্ঘ্যে।
গুরোরঙিঘ্র-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৮ ॥

অনর্ঘ্যানি রত্নানি ভুক্তানি সম্যক্,
সমালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু।
গুরোরঙিঘ্র-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৯ ॥

গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী,
যতির্ভূপতির্ব্রহ্মচারী চ গেহী।
লভেদ্বাঞ্ছিতার্থং ব্রহ্মসংজ্ঞং,
গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নম্ ॥ ১০ ॥

একদিন সন্ধ্যার সময় স্বামীজী মহারাজ হিমালয়ের শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের আরতি স্তব আবৃত্তি করিতেছেন,—

শ্রীশ্রীবদরীনাথের আরতি

পবনমন্দ সুগন্ধ শীতল হেম মন্দির শোভিতং
নিকট গঙ্গা বহতি নিরমল শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥ ১ ॥

শেষ স্থমিরণ করত নিশিদিন ধ্যান ধরত মহেশ্বরং
শ্রীবেদব্রহ্মা করত স্তুতি শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥ ২ ॥

ইন্দ্র চন্দ্র কুবের ধুনীকর ধূপ দীপ প্রকাশিতং
সিদ্ধমুনিজন করত জয় জয় শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥ ৩ ॥

শক্তি গৌরী গণেশ শারদ নারদমুনি উচ্চারণং
যোগধ্যানি অপার লীলা শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥ ৪ ॥

যক্ষ কিন্নর করত কৌতুক জ্ঞান গন্ধর্ব প্রকাশিতং
শ্রীলক্ষ্মী কমলা চমর ডোলে শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥ ৫ ॥

কৈলাসমে একদেব নিরঞ্জন শৈল শিখর মহেশ্বরং
রাজা যুধিষ্ঠির করত স্তুতি শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীবদরীনাথজীকে পঞ্চরত্ন স্তুতি পঠন পাপবিনাশনং
কোটীতীর্থ ভ'য়ে হৈ পুণ্যং প্রাপ্ত ফলদায়কম্ ॥ ৭ ॥

প্রায়ই মাঝে মাঝে স্বামিজী মহারাজ কখন প্রাতঃকালে, কখন সন্ধ্যায় বা কখন রাত্রিতে মোহমুদ্গর ও চর্পটপঞ্জরিকা স্তোত্র আবৃত্তি করিতেন,—

মোহমুদ্গরঃ

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু সদ্বুদ্ধিং মনসি বিতৃষ্ণাম্ ।
যল্লভসে নিজকর্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥ ১ ॥

কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ ।
কস্য ত্বং কঃ কুত আয়াত-স্তৎ চিন্তয় যদিদং ভ্রাতঃ ॥ ২ ॥

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্ ।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৩ ॥

নলিনীদলগতজলমতি তরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্ ।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতারণে নৌকা ॥ ৪ ॥

যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্ ।
ইতি সংসার স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ৫ ॥

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥ ৬॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃত কম্পিত-শোভিতদণ্ডং, তদপিন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥ ৭॥

সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥ ৮॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং, বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্॥ ৯॥

অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্রাঃ, ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥ ১০॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি মহ্যসহিষ্ণুঃ।
সর্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং, সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্॥ ১১॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ,পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥ ১২॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ॥ ১৩॥

যাবদ্‌বিত্তোপার্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জর দেহে, বার্তাং কোঽপিনপৃচ্ছতি গেহে॥ ১৪॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানাং পশ্যতি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া-স্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥ ১৫॥

সৎসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্বং নিসঙ্গত্বে নির্মোহত্বম্।
নিশ্চলিতত্বং নির্মোহত্বে, জীবন্মুক্তির্নিশ্চলিতত্বে॥ ১১॥

ষোড়শ পজ্‌ঝটিকাভিরশেষঃ, শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ।
যেষাংনৈব করোতি বিবেকং, তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্॥ ১৭॥

চর্পটপঞ্জরিকা

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌপুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে॥ ১ ॥

অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চুবুকসমর্পিতজানুঃ।
করতলভিক্ষা তরুলবাস-স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ॥ ২ ॥
ভজ গোবিন্দং—ইত্যাদি
যাবদ্বিত্তোপার্জনশক্ত-স্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনুচ জরয়া-জর্জরদেহে বার্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে॥ ৩ ॥

জটিলো মুণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ, কাষায়াম্বরবহুকৃতবেশঃ।
পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি মূঢ় উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেশঃ॥ ৪ ॥

ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজললবকণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চাম্॥ ৫ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপিণ্ডম্॥ ৬ ॥

বালস্তাবৎক্রীড়শক্ত-স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥ ৭ ॥

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্।
ইহসংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়াঽপারে পাহি মুরারে॥ ৮ ॥

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ।
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম॥ ৯ ॥

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ।
নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ॥ ১০ ॥

---

* এই শ্লোক-স্তোত্রের "ধ্রুবপদ" অর্থাৎ একবার ছাপা হইলেও গানের ধুয়ার মত প্রতি শ্লোকের পর আবৃত্তি করিতে হইবে।

নারীস্তনভরণাভিনিবেশং মিথ্যামায়ামোহাবেশম্ ।
এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারংবারম্ ॥ ১১ ॥

কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ কা মে জননী কো মে তাতঃ ।
ইতি পরিভাবয় সর্বমসারং বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিকারম্ ॥ ১২ ॥

গেয়ং গীতানামসহস্রং ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্ ।
নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্ ॥ ১৩ ॥

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে ।
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে ভার্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে ॥ ১৪ ॥

সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ ।
যদ্যপি লোকে মরণং শরণং তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্ ॥ ১৫ ॥

রথ্যাচর্পটবিরচিতকন্থঃ পুণ্যাপুণ্যবিবর্জিতপন্থঃ ।
নাহং ন ত্বং নায়ং লোক-স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ ১৬ ॥

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনমথবা দানম্ ।
জ্ঞানবিহীনে সর্বমনেন মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন ॥
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে ।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌ করণে ॥ ১৭ ॥

প্রার্থনা

ভ্রমন্ নানাযোনৌ বহুবিধশরীরং পরিগতঃ ।
সুখং নাল্পং লেভে কনকযুবতী ভোগবিষয়ৈঃ ॥

ইদানীং জ্ঞাত্বা ত্বাং প্রণতসুহৃদং শান্তিসুখদং ।
বিরক্তোঽহং যাচে তব চরণয়োর্ভক্তিমচলাং ॥

গৃহীত্বা ভ্রান্তং মাং কুমতি বিষয়াশাপরিবৃতং ।
সদা রক্ষ ব্রহ্মণ্ কুপথগমনাদ্দুঃখগহনাৎ ॥

কৃপাসারান্ প্রাণে বিতর সততং শোকদলিতে ।
বিবেকং বৈরাগ্যং পরমমপি মে দেহি ভগবন্ ॥

"আমেরিকায় যখন আমি একা একা থাকতাম নিঃসঙ্গ অবস্থায়, তখন আপন মনে আমি এই সব স্তবস্তুতি আবৃত্তি করতাম;—এরাই ছিল আমার সাথী। এই স্তবস্তুতি আবৃত্তি করলে মনে তেজ, বল ও শক্তির প্রেরণা আসে।"

—স্বামী অভেদানন্দ

ওঁ অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়
আবিরাবি মে এধি রুদ্র
যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং ॥

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর। অজ্ঞান অন্ধকার হইতে আমাকে জ্ঞানের জ্যোতিতে লইয়া চল। মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতত্ব প্রদান কর। হে প্রকাশস্বরূপ! আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও। হে রুদ্র, তোমার করুণামাখা যে বদন তাহাদ্বারা সর্বদা আমাকে রক্ষা কর।

O Soul of our Souls! O Light of the Universe! Lead us from Unreal to Real, from darkness to light, from Death to Immortality. O Destroyer of all evils! protect us with thy compassionate face, remove all obstacles that prevent manifestation of Thy Divine power and do not let us forget that our true nature is one with Thee for ever and ever.

'এ বৈদিক যুগের ঋষিদের প্রার্থনা! অপূর্ব! এর তুলনা হয় না।'

—স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন প্রাতঃকালে স্বামিজী মহারাজ জগন্নাথদেবের স্তোত্র আবৃত্তি করিতেন,—

শ্রীশ্রীজগন্নাথস্তোত্রম্

কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীতকরবো
মুদাভীরীনারীবদনকমলাস্বাদমধুপঃ।
রমাশম্ভুব্রহ্মাসুরপতিগণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১ ॥

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং বিলসয়ন্।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২ ॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কণককরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রসাদান্তঃ সহজবলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥

কৃপাপারাবার সজলজলদ শ্রেণীরুচিরো
রমাবাণীরাম স্ফুরদমলপঙ্কেরুহমুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্ল নয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহতচরণোঽনন্ত শিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গনমুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কণকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকল জনকাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রথমপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপারাং যাদবপতে।
অহো দীননাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

'আমি, বাবুরাম আর শরৎ পুরীতে ছয় মাস ছিলাম, ওখানে থেকে তপস্যা করতাম। আহা! সেই সব দিনের জীবনের কথা মনে পড়লে কত আনন্দ হয়। আমি পুরী থাকবার সময় জগন্নাথদেবের এই স্তোত্রটি আবৃত্তি করতাম।'

—স্বামী অভেদানন্দ

বিডন স্ট্রীটে ত্রিতলের বারান্দায় একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময়ে স্বামীজী মহারাজ যুক্ত করে চেয়ারে বসিয়া গুরু গম্ভীর উদাত্ত স্বরে গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন,—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি চ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে ॥

স্বামীজী মহারাজ কখন প্রাতঃকালে, কখন সন্ধ্যার সময়, কখন গভীর রাত্রে নির্বাণ-ষটক আবৃত্তি করতেন। এই জগত হতে চলে যাবার পূর্বে তিনি এই নির্বাণ-ষটক স্ত্রোত্রটি প্রায়ই আবৃত্তি করতেন। আবৃত্তি করতে করতে কি এক অপূর্ব অব্যক্তাবস্থায় তাঁর মন চলে যেত, পরে তিনি বলতেন,—'এ-ই সমাধির অবস্থা।'

নির্বাণষটকম্

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম্।
ন চ ব্যোমভূমি র্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ১ ॥

অহং প্রাণসংজ্ঞো ন চ পঞ্চবায়ু-
র্ন বা সপ্তধাতু র্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ২ ॥

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৩ ॥

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৪ ॥

ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৫ ॥

অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুর্ব্যাপী সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তি র্ন ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৬ ॥

বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে অবস্থানকালে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে অনেকগুলি স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। এখানে কয়েকটি স্তোত্র দেওয়া হইল। স্তোত্রগুলির বঙ্গানুবাদও স্বামীজী মহারাজ নিজেই করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রম্

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

লোকনাথশ্চিদাকারো রাজমানঃ স্বধামনি
কলিকল্মষমগ্নানামুত্তারণচিকীর্ষয়া।
মায়াশক্তিং সমাশ্রিত্য যোঽবতীর্ণো মহীতলে
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১ ॥

সদ্‌ব্রাহ্মণকুলে জাতো দিব্যদেহং সমাশ্রিতঃ
বাল্যে যো ভক্তিভাবেন বয়স্যৈর্মুদমাবহৎ।
বিরক্তো যৌবনে তীব্রং মায়াপাশবিবর্জিতঃ
নিত্যমুক্তস্বভাবোঽপি লোকানুগ্রহকামতঃ ॥ ২ ॥

লোকানামেব শিক্ষার্থং তপস্তপ্‌ত্বা সুদুষ্করম্
নিদ্রাশনং পরিত্যজ্য বর্ষাণাং হ্যধিকান্ দশ।
স্বস্বরূপং সমাধায় সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্
দয়ামূর্তিঃ সদানন্দো জিজ্ঞাসূনুপদিষ্টবান্।
তেষামজ্ঞাননাশায় লাভায় চ পরমাত্মনঃ
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩ ॥

সত্যবোধতয়া সাঙ্গান্ সর্বধর্মান্ সমাচরণ্
ধর্মমাত্রস্তু সত্যং বৈ যেন সম্যক্ সুনিশ্চিতম্।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪ ॥

যো ভক্তান্ ভক্তিমার্গে তু নিনায় লোকনায়কঃ
আকৃষ্য মানসং তেষাং ভক্তিভাবার্দ্রয়া গিরা।
দর্শয়িত্বা মহাভাবং পরমানন্দদায়কম্
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৫ ॥

জ্ঞানিনো জ্ঞানমার্গে চ যেন সম্যক্ প্রবর্ত্তিতাঃ
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৬ ॥

যৈর্যৈর্ধার্মিকো যস্মিন্ ধর্মমার্গে ব্যবস্থিতাঃ
তেষাং তন্মতমাদৃত্য ভক্তিস্তত্র দৃঢ়ীকৃতা।
প্রোৎসাহিতা যথান্যায়ং যেন তৎসাধনেষপি
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৭ ॥

পূজিতা যেন বৈ শশ্বৎ সর্বেঽপি সাম্প্রদায়িকাঃ
সম্প্রদায়বিহীনো যঃ সম্প্রদায়ং ন নন্দতি।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৮ ॥

শশ্বল্লীলাবিলাসেন যেন বিশ্বমিদং ততম্।
লীলারূপং সদানন্দং রামকৃষ্ণং নমাম্যহম্ ॥ ৯ ॥

সর্বধর্মপ্রণেতারং ধর্মগ্লানিবিনাশকম্।
সাধুমিত্রং শিবং শান্তং রামকৃষ্ণং নমাম্যহম্॥ ১০ ॥

অজ্ঞান তিমিরে যস্তু জ্ঞানালোকপ্রদীপকঃ
বিমলানন্দদানায় প্রাদুরাসীন্ মহীতলে।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১১ ॥

সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১২ ॥

ত্বং হি বিষ্ণুর্বিরিঞ্চিস্ত্বং ত্বঞ্চ দেবো মহেশ্বরঃ
ত্বঞ্চৈব শক্তিরূপোঽসি নির্গুণস্ত্বং সনাতনঃ।
ত্বাং স্তোতুং কোঽত্র শক্তঃ স্যাদ্ভাবাতীতমনাময়ম্
ভগবন্ সর্বভূতাত্মন্ রামকৃষ্ণ নমোঽস্তুতে ॥ ১৩ ॥

সর্বায় সর্বপারায় সর্বভাবস্বরূপিণে।
সর্বভাব বিহীনায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥ ১৪ ॥

মহামায়াস্বরূপায় মহামোহবিনাশিনে।
মায়াতীতায় শান্তায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥ ১৫ ॥

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং
ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং
তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ বিরচিত।

বঙ্গানুবাদ

সর্বলোকনাথ যিনি চৈতন্য আকার
বিরাজিত নিরন্তর ধামে আপনার,
কলির কলুষমগ্ন জীবে উদ্ধারিতে
অবতীর্ণ মায়াশক্তি লয়ে অবনীতে।
নররূপে যুগে যুগে প্রকাশ ধরায়
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥ ১ ॥

সদ্‌ব্রাহ্মণ-কুলে জাত দিব্যদেহধারী
বাল্যে বন্ধুগণ সাথে প্রেমলীলাকারী।
যৌবনে বিরক্ত তীব্র মায়া-বিবর্জিত
নিত্যমুক্ত তবু লোকহিতে নিয়োজিত ॥ ২ ॥

লোকশিক্ষা হেতু যিনি দ্বাদশ বৎসর
ত্যজি নিদ্রাশন করি তপ উগ্রতর
সচ্চিদ্‌-আনন্দ স্বীয় স্বরূপ জানিলে
দয়াসিন্ধু জিজ্ঞাসুরে উপদেশ দিলে
তাদের অজ্ঞাননাশ ইষ্টলাভ তরে,
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমারে ॥ ৩ ॥

সত্য বোধ করি সর্বধর্মের আচার
প্রত্যেকের অঙ্গসাথে করিয়া বিচার
জানিলে প্রত্যেক ধর্ম সত্য সুনিশ্চয়
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥ ৪ ॥

ভক্তিপথে ভক্তগণে করি প্রদর্শন
ভক্তিভাবসিক্ত বাক্যে করি আকর্ষণ
দেখাইয়া মহাভাব আনন্দদায়ক
ভক্তসঙ্গে থাকি সদা ভক্তের নায়ক
ভক্তিতত্ত্ব শিখাইলে প্রেমে করুণায়
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥ ৫ ॥

জ্ঞানযোগে অনুরক্ত সাধকেরা যত
জ্ঞানমার্গে তাহাদের করিলে নিরত।
শিখালে বিচার-পথে সাধন-উপায়
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥ ৬ ॥

সর্ববিধ ধর্মমতে তব সমাদর
ধর্মে ধার্মিকের নিষ্ঠা করি দৃঢ়তর
উৎসাহে সাধনরত করিলে সবায়
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥ ৭ ॥

কোন সম্প্রদায়মাঝে ছিলেনাকো কভু
না করি তাদের নিন্দা, কর শ্রদ্ধা তবু।
ধর্মের আদর্শ নব আনিলে ধরায়
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥ ৮ ॥

নিত্যলীলারূপে যিনি ব্যাপ্ত বিশ্বময়
লীলারূপী রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥ ৯ ॥

অবতাররূপে সর্বধর্মপ্রবর্তক
যুগে যুগে যিনি ধর্মগ্লানি বিনাশক
সাধুজন-মিত্র সেই শান্ত শিবময়
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥ ১০ ॥

অজ্ঞান-তিমিরে যিনি জ্ঞানলোক-দীপ
(সে আলোকে উদ্ধারিল অগণিত জীব)
বিমল আনন্দ দিতে আসিল ধরায়
সেই গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥ ১১ ॥

সংসার-অর্ণবঘোরে যিনি কর্ণধার
জগদ্‌গুরু সেই রামকৃষ্ণে নমস্কার ॥ ১২ ॥

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর
তুমি শক্তিরূপ নিত্য নির্গুণ ভাস্বর।
কে তোমা বন্দিবে ভাবাতীত অনাময়
সর্বাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥ ১৩ ॥

তুমি সর্ব সর্বপার সর্বভাবময়
সর্বাতীত রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥ ১৪ ॥

মহামায়া স্বরূপেতে ভুবন মোহিলে
মহামোহ বিনাশিয়া জীবে মুক্তি দিলে।
শুদ্ধ শান্ত জীব তুমি স্বীয় মহিমায়
মায়াতীত রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥ ১৫ ॥

নিত্য নিরঞ্জন সেই অনন্তস্বরূপ
ভক্ততরে কৃপা করে ধরে নানারূপ।
পূজ্য পরমেশ সেই ঈশ-অবতার
রামকৃষ্ণে নতশিরে নমি বার বার ॥ ১৬ ॥

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ কৃত অনুবাদ।

শ্রীশ্রীসারদাদেবী স্তোত্রম্

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং
নররূপধরাং জনতাপহরাম্।
শরণাগতসেবকতোষকরীং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥ ১ ॥

গুণহীন সুতানপরাধযুতান্
কৃপয়াহদ্য সমুদ্ধর মোহগতান্।
তরণীং ভবসাগরপারকরীং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥ ২ ॥

বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা
চরণাম্বুরুহামৃতশান্তিসুধাম্।
পিব ভৃঙ্গ মনো ভবরোগহরাং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥ ৩ ॥

কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে ॥ ৪ ॥

লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে।
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে ॥ ৫ ॥

রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬ ॥

পবিত্রং চরিতং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা।
পবিত্রতাস্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ কুর্মো নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্ ॥ ৮ ॥

স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং
দোষানশেষান্ সগুণকরোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্ ॥ ৯ ॥

প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে
নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে
বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্ ॥ ১০ ॥

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ বিরচিত।

বঙ্গানুবাদ

পরমা প্রকৃতি দেবী মানবীরূপিণী
অভয়া বরদা জন-ত্রিতাপহারিণী।
আশ্রিত সেবকে কর সদানন্দময়
জগত-জননি নমি সারদে তোমায়॥ ১ ॥

কৃপা করি গুণহীন অপরাধী সুতে
উদ্ধার কর মা আজি মায়া মোহ হতে।
ভবার্ণবে তুমি তরী তার মা আমায়
জগত-জননী নমি সারদে তোমায়॥ ২ ॥

বিষয়-কুসুম ত্যজি মন-মধুকর
পাদপদ্মামৃত শান্তি-সুধা পান কর।
ভবরোগ দূরে যাবে না থাকিবে ভয়
জগত-জননী নমি সারদে তোমায়॥ ৩ ॥

কৃপা কর মহাদেবি প্রণত সন্তানে
সারদে করুণাময়ি পদাশ্রয় দানে॥ ৪ ॥

জ্ঞানদাত্রি হে সারদে লজ্জাপটাবৃতে
নমি তোমা কৃপাময়ি—তারো পাপ হতে॥ ৫ ॥

রামকৃষ্ণগত প্রাণ প্রিয় তাঁর নাম গান
ভালবাস সদা তুমি শুনিতে শ্রবণে।
তাঁহার ভাবেতে হয় তব তনু ভাবময়
নমস্কার বারম্বার তোমার চরণে॥ ৬ ॥

পবিত্র চরিত যার পবিত্র জীবন
পবিত্রতা-স্বরূপারে নমি অনুক্ষণ॥ ৭ ॥

যোগীন্দ্রপূজিতা মাতা সুপ্রসন্ন হয়ে
করো নাশ প্রণতের দুঃখসমুদয়ে।
যুগধর্মরক্ষাকর্ত্রী দাও জ্ঞান ভক্তি
সারদে করুণাময়ি চরণে প্রণতি॥ ৮ ॥

বেঁধেছ মোদের মন স্নেহের বন্ধনে
দোষ সব গুণ ক'রে নে'ছ নিজগুণে।
রাখিয়াছ স্নেহক্রোড়ে দোষী সবাকারে
অহেতুকী কৃপা তব কে বুঝিতে পারে ॥ ৯ ॥

জননি প্রসাদ তব যাচি গো বিনয়ে
স্নেহময়ী স্নেহ নিত্য দাও মা তনয়ে।
দগ্ধচিত্তে প্রেমবিন্দু বিতর সারদে
হৃদে শান্তিবারি দাও মাগি ভিক্ষা পদে ॥ ১০ ॥

জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ জননি সারদে।
প্রণমি সর্বদা ধরি পাদপদ্ম হৃদে ॥ ১১ ॥

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ কৃত অনুবাদ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাবতার স্তোত্রম্

হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পং
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্।
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্তিং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১ ॥

নিরুপমমতিসূক্ষ্মং নিষ্প্রপঞ্চং নিরীহং
গগনসদৃশমীশং সর্বভূতাধিবাসম্।
ত্রিগুণরহিতসচ্চিদ্‌ব্রহ্মরূপং বরেণ্যং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ২ ॥

প্রলয়জলধিমগ্নং বেদরাশিং দিধীর্ষু-
দনুজমতিবিশালং হংসি শঙ্খং বিচিত্রম্।
তমপরিমিতবীর্যং মীনরূপং দধানং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ৩ ॥

অতুলবিপুলদেহে চিন্ময়ে কূর্মরূপে
বহসি সকলমেতদ্বিশ্বমাধারশক্ত্যা।
তব খলু মহিমানং কোঽল্পধীর্বর্ণয়েৎ ত্বাং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ৪ ॥

দশনবিধৃতপৃথ্বীং শূকরং শ্বেতকায়ং
দলিতদিতিজরাজং দংষ্ট্রিণং চক্রপাণিম্।
অমিতবিভবশক্তিং পালকং দেবতানাং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ৫ ॥

বিকটদশনবক্ত্রং লোলজিহ্বং প্রচণ্ডং
গিরিবরসমকায়ং রক্তহস্তং নৃসিংহম্।
প্রশমিতসুরখেদং কোটিসূর্যপ্রকাশং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ৬ ॥

ছলয়িতুমবতীর্ণো বামনস্ত্বং বলিং বৈ
ত্রিচরণকমলেন ক্রামসি স্বর্ভুবো ভূঃ।
পরমপুরুষমাদিং কাশ্যপং বিশ্বরূপং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ৭ ॥

নিশিতপরশুধারং ক্ষত্রসন্তানকেতুং
নবজলধরবর্ণং ভার্গবং ভীমবীর্যম্।
শমনসদৃশঘোরং জামদগ্ন্যং বিশালং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ৮ ॥

রঘুকুলবরমীশং জানকীপ্রাণনাথং
সমরকুশলবীরং রাঘবং রাবণারিম্।
হনুমদনুজসেব্যং ধার্মিকং সত্যপালং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ৯ ॥

হলধরমতিশুভ্রং নীলবস্ত্রং সুরেন্দ্রং
দনুজদলনকার্যে পারগং মত্তসিংহম্।
যমমিব যমুনায়া ভীতিদং রৌহিণেয়ং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১০ ॥

ব্রজবিপিনবিহারে শ্যামলং বাসুদেবং
সুমধুররসকেলিং গোপিকাপ্রাণনাথম্।
মদনরমণবেশং কংসকালং কবীশং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১১ ॥

পশুবধমতিঘোরং চোদিতং বেদশাস্ত্রৈঃ
শময়িতুমবতীর্ণং জ্ঞানদং শাক্যসিংহম্।
প্রকটিতনবমার্গাদ্বৈতনির্বাণকল্পং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১২ ॥

মধুরসরলবাক্যৈরীশতত্ত্বং প্রকাশ্য
ক্রুশগতপরিশেষোঽপীশপুত্রোঽমৃতো যঃ।
তমতিশয়পবিত্রং মেরিজং লোকবন্ধুং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১৩ ॥

যবনভজনরীতিং নীতিমিশ্লামশাস্ত্রং
উপদিশতি বিনেয়ান্ তত্ত্বমাল্লাভিধস্য।
পরমপুরুষদূতো যে মহম্মদপুত্তং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রুতিনিগদিতমার্গস্থাপনায়াবতারং
জিননয়বহুবাদভ্রান্তিমুন্মূলয়ন্তম্।
ভুবনবিজয়কীর্তিং শঙ্করং ভাষ্যকারং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১৫ ॥

কলিমলহরনাম্নঃ কীর্তনং ঘোষয়ন্তং
করধৃতজলপাত্রং দণ্ডিনং হেমবর্ণম্।
ভবজলনিধিপোতং কৃষ্ণচৈতন্যরূপং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১৬ ॥

বিতরিতুমবতীর্ণং জ্ঞানভক্তিপ্রশান্তীঃ
প্রণয়গলিতচিত্তং জীবদুঃখাসহিষ্ণুম্।
ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১৭ ॥

হরিহরবিধিদেবা মূর্তিভেদাস্তবৈতে
নিরুপমবহুমূর্তির্মায়য়া কল্পয়ন্তম্।
অতীবগুণচরিত্রং দীনবন্ধুং দয়ালুং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১৮ ॥

জয় জয় করুণাব্ধে মোক্ষসেতো স্মরারে
জয় জয় জগদীশ জ্ঞানসিন্ধো স্বয়ম্ভো।
জয় জয় পরমাত্মংস্ত্রাহি মাং ভক্তিহীনং
জয় জয় ভবহারিন্ রামকৃষ্ণ দ্বিবাহো ॥ ১৯ ॥

মূকোঽহং নাভিজানামি তব স্তুতিং জগদ্গুরো।
তথাপি ত্বৎকৃপালেশাদ্বাচালোঽস্মি পুনঃ পুনঃ ॥ ২০ ॥

—শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ বিরচিত।

বঙ্গানুবাদ

হৃদয়-কমলে শোভে নির্বিকল্প রূপ
সদসদ্ভেদাতীত অদ্বয় স্বরূপ।
প্রকৃতিবিকারশূন্য সত্য সনাতন
চিন্ময় আনন্দঘন মূর্তি নিরঞ্জন।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ১ ॥

নিরুপম অতিসূক্ষ্ম প্রপঞ্চরহিত
ইচ্ছাহীন যিনি সদা—সর্বভূতে স্থিত।
গগন সদৃশ ব্যাপ্ত সবার ভিতর
গুণাতীত পূর্ণব্রহ্ম চৈতন্য আকর।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ২ ॥

ছিল যবে মগ্ন সব প্রলয়-সাগরে
বেদরাশি উদ্ধারিলে মৎস্যরূপ ধ'রে।
মহাকায় শংখাসুরে করিলে সংহার
দেখালে বিচিত্র শক্তি কী বীর্য তোমার।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ৩ ॥

চিন্ময় বিপুলরূপে কূর্মদেহ ধ'রে
বহিলে পৃথিবী নিজ পৃষ্ঠের উপরে।
ক্ষুদ্রবুদ্ধি কেবা তব মহিমা বর্ণনে
সক্ষম হইবে দেব কিরূপে—কেমনে ?
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ৪ ॥

দশনে ধরিলে পৃথ্বি বরাহ আকারে
শ্বেতকায় চক্রপাণি—রক্ষিতে সবারে।
অমিত বিভব শক্তি পাতা দেবতার
হিরণ্যাক্ষে দন্তাঘাতে করিলে সংহার।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ৫ ॥

নরসিংহরূপে হরি ভীষণ-দর্শন
লোলজিহ্বা রক্তহস্ত বিকট দশন।
হিমাদ্রি সদৃশ কায় কোটি সূর্যপ্রভা
দেবতার দুঃখহারী তব সম কেবা ?
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ৬ ॥

বলিরে ছলিতে হরি বামন হইলে
স্বর্গ মর্ত্য ভুবলোক ত্রিপদে ব্যাপিলে।
কাশ্যপসুন্দর তুমি বিশ্বরূপধারী
পরমপুরুষ আদি সর্ব পাপহারী।

বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ৭ ॥

শাণিত পরশু করে ক্ষত্রনাশকারী
নবীন জলদবর্ণ ভীমবীর্যধারী।
জমদগ্নিসুত রাম ভৃগুবংশধর
বিশাল শরীর যম সম ভয়ঙ্কর।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ৮ ॥

জানকীর প্রাণনাথ রঘুকুলেশ্বর
রাবণারি চিরজয়ী সকল সমর।
হনুমান লক্ষ্মণের চির-সেবনীয়
ধর্মনিষ্ঠ সত্যব্রত-পালনেতে প্রিয়।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ৯ ॥

শুভ্রকান্তি হলধর নীলবস্ত্রধারী
প্রমত্ত কেশরীসম দানবসংহারী।
যমুনা কাঁপিত ভয়ে জানি যম সম
রোহিণীনন্দন সেই অমিত বিক্রম।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ১০ ॥

বাসুদেব শ্যাম ব্রজবিপিনবিহারী
কবীশ্বর জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কংসদর্পহারী।
সুমধুর রাসলীলা গোপীগণ সঙ্গে
মদনমোহন বেশে খেলে নানা রঙ্গে।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ১১ ॥

পশুবধ অতি ঘোর বেদেতে বর্ণিত
নিষেধ করিয়া সর্ব জীবহিতে রত।

জ্ঞানদাতা শাক্যসিংহ হয়ে অবতার
অদ্বৈত নির্বাণমার্গ করিলে প্রচার।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ১২ ॥

মধুর সরল বাক্যে ঈশতত্ত্ব দিলে
মেরির নন্দন যীশু-রূপেতে আসিলে।
ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে শেষে উঠিলে অমৃত
ঈশপুত্র লোকমিত্র পবিত্র চরিত।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ১৩ ॥

আরব সন্তানগণে করিতে উদ্ধার
ইস্‌লাম ও নীতিশাস্ত্র করিতে প্রচার।
আল্লা নামে ঈশ্বরের তত্ত্ব শিখাইতে
পাঠালে ধরায় তব মহম্মদ দূতে।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ১৪ ॥

বেদের বিহিতমার্গ করিতে স্থাপন
বৌদ্ধ আদি নিরীশ্বর মতের খণ্ডন
করিবারে অবতীর্ণ শঙ্কর-রূপেতে
বেদান্তের ভাষ্যকার বিখ্যাত জগতে।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ১৫ ॥

দণ্ড-কমণ্ডলুধারী হেমবর্ণ কায়
কলির কলুষহারী হরিনাম গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ ভবে
পারের তরণী দিব্য যেই ভবার্ণবে।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ১৬ ॥

জ্ঞান ভক্তি পরাশান্তি জীবে বিতরিতে
কোমল মূরতি অবতীর্ণ অবনীতে
চিন্ময়—সহজে যিনি হন সমাহিত
জীবদুঃখে সকাতর প্রেমে বিগলিত।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি নানা মূর্তি তব
মায়ায় রচিলে এই নিরূপম সব।
দীনের সহায় চির-দয়ার সাগর
অদ্ভুত চরিত্র দিব্য-গুণের আকর।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥ ১৮ ॥

জয় জয় দেব জয় করুণা-সাগর
জয় জয় মোক্ষসেতু স্মরারি শঙ্কর।
জয় জয় জগদীশ জ্ঞান-পারাবার
জয় জয় পরমাত্মা স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর।
জয় জয় ভবপাশ নাশো নিজগুণে
দ্বিভুজ হে রামকৃষ্ণ তারো ভক্তিহীনে ॥ ১৯ ॥

জগতের গুরু তুমি আমি মূক অতি
মহিমা বর্ণিতে তব নাহিক শকতি।
তথাপি লভিয়া তব করুণার কণা
বাক্‌শক্তি লভি করি মহিমা বর্ণনা ॥ ২০ ॥

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ কৃত অনুবাদ।

যেমন শুনিয়াছি

(প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

প্রকাশক : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
বেলানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,
পোঃ অভয়নগর ; জিলা—হাওড়া।

সমালোচনা

(১)

…গুরুদেবকে (শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ) যেমন তিনি (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) দেখেছেন, বিশেষ করে তাঁর মুখনিঃসৃত কথা যেমন শুনেছেন, সে সবই নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখেন। বইখানা যাঁরা পড়বেন, তাঁরা তাঁদের সামনে যেন রামকৃষ্ণদেবের কৃপাধন্য ওই মহাসাধকের (বিবেকানন্দ যাঁকে বলতেন "কালী তপস্বী") উপস্থিতি অনুভব করবেন।…অনেক কথাই আমাদের জানা, শোনা। তবু, গুরু-শিষ্যের সহজ আলাপে সে-সব নতুন করে এখানে শুনতে ভাল লাগে। গিরিশচন্দ্রের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ এই গ্রন্থে আছে, যা ইতিপূর্বে সম্ভবত আর কোথাও বর্ণিত হয় নি।

কথার রেখা ও রঙে অভেদানন্দের একটি অকৃত্রিম চিত্র এখানে উপস্থাপিত। লেখকের আশ্রয় প্রধানত তাঁর গুরুদেবেরই ভাষা। বলা যায়, এ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। আর সেই গঙ্গা যে অন্তহীন মহাসাগরে লীন, তাঁর নাম রামকৃষ্ণ।…

(২)

…স্বামী অভেদানন্দের মুখ-নিঃসৃত উপদেশাবলী "যেমন শুনিয়াছি" গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। এক অর্থে এই গ্রন্থের মূল্য অনেক বেশী।…স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

ষোল বৎসর কাল সেই মহান্ পুরুষের নিবিড় সঙ্গ লাভ করেছিলেন, সেই সময় তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী ও উপদেশগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করেছিলেন—…

এই গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্পর্কেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা শোনা যাবে ; এ ছাড়া ভগবদ্-তত্ত্ব জিজ্ঞাসু বা ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিদের পক্ষে গ্রন্থখানি পরম মূল্যবানই হবে। এর বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

(৩)

…১৯২৩-২৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্বামীজি মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি স্থাপন করে এবং ১৯২৯-৩৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উক্ত স্থানসমূহে যে সব আলোচনা ও উপদেশাদি দান করেছিলেন সেবক-শিষ্যরূপে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ স্বামীজি মহারাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকার সুযোগ লাভ করে যে-সব আলোচনাদি এবং ব্যক্তিগত প্রশ্নের কিছু কিছু উত্তর যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন আলোচ্য "যেমন শুনিয়াছি" তাহাই বর্তমানে পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত।

…"যেমন শুনিয়াছি" পাঠকালে স্বামীজি মহারাজের বলার সেই অপূর্ব ভঙ্গিটি স্বতঃই প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বহু গ্রন্থ সংকলনের সময় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লেখকদের স্বকীয়ভাব ও চিন্তাধারার সহিত সংকলিত বিষয় বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটার ফলে প্রকৃত বক্তার বক্তব্য, ভাষার ছন্দ ও রূপ যায় পরিবর্তিত হয়ে। আলোচ্য "যেমন শুনিয়াছি" গ্রন্থের সংকলক সে দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকায় পুস্তকখানি স্বামী অভেদানন্দজীর বাণী ও উপদেশের যথার্থ প্রতিফলন রূপেই আমরা পেয়েছি।

কেমন করে ভগবৎ চেতনা লাভ করা যায়, কী তপস্যায় প্রসন্ন হন তিনি এবং কী সম্পদের অধিকারী হয়ে মানুষ তাঁকে লাভ করে, এসব ইঙ্গিত পুনঃ পুনঃ তিনি যা প্রশ্নোত্তর-ছলে ও আলোচনা-প্রসঙ্গে দিয়ে গেছেন সেগুলি যথাযথ

লিপিবদ্ধ করে লেখক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সকলের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।...উত্তম প্রচ্ছদে শোভিত "যেমন শুনিয়াছি" বহুল প্রচার ও সমাদর লাভ করবে, সন্দেহ নাই।...

(৪)

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তাঁহার গুরুদেব স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া সুন্দরভাবে "যেমন শুনিয়াছি" পুস্তকে সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা পাঠকমাত্রেরই আনন্দবর্ধক এবং অধ্যাত্মজ্ঞানদায়ক।...আশৈশব কালী তপস্বী কিভাবে ঘটনাপ্রবাহে সৎসঙ্গ লাভ করিয়া ও অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাধন্য হইয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম প্রতিভার স্ফুরণে অভেদানন্দে পরিণত হইয়াছিলেন তাহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং অভিব্যক্তি সুনিপুণভাবে ত্যাগী ব্রহ্মচারী গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।...স্বামী অভেনানন্দ সম্পর্কে যাহা কিছু প্রাথমিক তথ্য তাহা এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে এবং পাঠকের উপলব্ধি হইবে যে, তিনি পাশ্চাত্ত্য জাতির হৃদয় কতটা অধিকার করিয়াছিলেন ও তাঁহার অবদান কত শ্রেষ্ঠ।

(৫)

...ঘরোয়া পরিবেশে গুরু-শিষ্যের সংলাপের মাধ্যমে যে তত্ত্ব ও তথ্যের আলোচনা হইয়াছে দিনের পর দিন—তাহারই রূপায়ণ আলোচ্য গ্রন্থ—স্বামীজীর জীবনের অপূর্ব আলেখ্য। সম্বুদ্ধানন্দ স্বামীজীর এমন একটি চিত্ররূপ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়া যে মহান কার্য সম্পাদন করিয়াছেন তজ্জন্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেরই তিনি ধন্যবাদার্হ।

(৬)

শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ অপেক্ষা শাস্ত্রবিৎ উপলব্ধিমান মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ শ্রেয়স্কর নিঃসন্দেহ।…কথোপকথনচ্ছলে প্রদত্ত মানবজীবনের নানা জটিল সমস্যার সহজ সরল সমাধান বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও অনুধাবনযোগ্য। প্রারম্ভে স্বামী অভেদানন্দজীর জীবনী, শেষাংশে তাঁহার প্রিয় স্তোত্রাবলী, অনেকগুলি ছবি পুস্তকখানির অন্যতম আকর্ষণ।…

(৭)

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, অর্থাৎ "রবি মহারাজ" তাঁর গুরু মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর মহাত্মা শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের কাহিনী এবং তাঁর কাছ থেকে যে উপদেশ পেয়েছিলেন, যে অমৃতবাণী শুনেছিলেন, সেই সকলই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ভক্ত শিষ্যের তুলিকায় ছবির মত এঁকে দিয়েছেন এই গ্রন্থের দুটি ভাগে।…এই গ্রন্থ ভক্ত ও বিদগ্ধজনের কাছে অবশ্যই সমাদর লাভ করবে।

(৮)

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় পরিকর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ।…স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় সুহৃৎ, দেশ-বিদেশে বেদান্ত প্রচারে স্বামীজীর প্রধান সহায়।…তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী। গুরুবাক্য পরম ভাবভক্তি দিয়ে সংকলন করেছেন। সাধন সাগরের অনেকগুলি রত্ন তুলেছেন ডুবুরী।…এই রত্নরাজির কান্তিতে আকৃষ্ট হয়ে সেই সাগরে দুটি একটি ডুব দেবার অকুতিও যদি আমাদের জাগে, তাহলে আমরা ধন্য হয়ে যেতে পারি। সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের মহাবাণী সাক্ষাৎ শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে নতুন রূপ নিয়ে এই গ্রন্থে ঘুরে ঘুরে এসেছে। বেদান্তীর কণ্ঠে ভক্তির সুর মধুর হয়ে বেজেছে।…

(৯)

"যেমন শুনিয়াছি"—সংকলক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, বইখানি খুব সুন্দর হয়েছে। এরূপ বই পড়ে সবাই আনন্দ পাবে। আশ্রমের বহু লোকই বইখানা পড়েছে। সকলেই বলে,— এরূপ বই খুবই কম দেখা যায়।

(১০)

শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সঙ্কলিত "যেমন শুনিয়াছি" বাইখানি পড়িলাম। খুব ভাল হইয়াছে। অতি চমৎকার! চমৎকার! চমৎকার হইয়াছে—অপূর্ব।

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
রেজিস্ট্রার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

(১১)

…আপনার (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) লেখা "যেমন শুনিয়াছি" বইখানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। আমি সকলকেই বলিতেছি।…

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী সরকার
নিউ আলিপুর
কলিকাতা-৫৩

(১২)

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের "যেমন শুনিয়াছি" পড়লাম। খুব ভাল বই হয়েছে।

কে. কে. মিত্র
জাষ্টিস্, কলিকাতা হাইকোর্ট

(১৩)

‥ আপনার (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) "যেমন শুনিয়াছি" গ্রন্থ পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত মানবাত্মাকে যুগে যুগে পথের নিশানা দেখিয়ে দেবে—শুধু ধর্মজীবনে নয়,

ব্যক্তিজীবনে এবং সমাজ-জীবনেও।—এর মূল্যের পরিমাপ করা যায় না, প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায় না।…

আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে আপনার গুরুদেবের বাণী লিপিবদ্ধ করার বিশ্বস্ততা। তাঁর কথাগুলি এমন যথাযথভাবে আপনি আমাদের শুনিয়েছেন যে, গ্রন্থের রচনার মধ্যে সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর পরম সুন্দর মহাযোগীর স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পাই। সার্থক আপনার গ্রন্থের নাম। জীবন সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্নের অসংখ্য উত্তর আমি আপনার গ্রন্থে খুঁজে পেয়েছি। আপনি যেন গণ্ডুষের মধ্যে মহাসমুদ্রকে ধরে রেখেছেন। এই বইখানি আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে রইল।

প্রণব রায়
গীতিকার

(১৪)

…ঠিক এই বইটিরই (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সঙ্কলিত "যেমন শুনিয়াছি") একান্ত প্রয়োজন ছিল আমাদের। সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার শ্রীহস্তে এমনভাবে জীবন্ত প্রকট হইয়া রহিলেন। বড় আনন্দ পাইয়াছি মনের ব্যথিত, বেদনাতুর অবস্থায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা কতভাবে লেখা হইয়াছে এবং হইতেছে, আরও হইবে। স্বামীজী মহারাজের কথাগুলি একান্ত স্বতন্ত্র, সুন্দর, মৌলিকতা সুস্পষ্ট। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীগুলি যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—তাহাও স্বতন্ত্র। এত উদার মহান্ ব্যাখ্যা আর যেন হইতে পারে না।

আত্রেয়ী মজুমদার
কলিকাতা

(১৫)

"যেমন শুনিয়াছি" নামক বইটি পড়ে প্রভূত আনন্দ পেয়েছি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে রিরাংসাপূর্ণ কাহিনীর ধারাপ্রবাহ চলেছে, আপনার বইটি তার অতি সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী একমাত্র আমাদের ভরসা। বইটিতে আপনি এমন অনেক বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যা আমি ইতিপূর্বে ভালোভাবে বুঝতে পারিনি।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে আবার নতুন করে ফিরে পেলাম আপনার বইটিতে। কি ভালোই না লেগেছে আপনার বইটি—তা কি বলবো! এক কথায় অপূর্ব! জ্ঞান ও বিশ্বাস, যুক্তি ও ভক্তি, সাধনা ও করুণা—এ সবের অভেদজ্ঞান লাভ করবার একমাত্র উপায় হোল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী এবং তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের বাণী ও ব্যাখ্যা। সেইদিক থেকে আপনার বইটি একটি অমূল্য সংযোজন।…

অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
দয়ানন্দ বেদিক কলেজ, ওরাই
(ইউ. পি.)

(১৬)

"যেমন শুনিয়াছি" বইটি পড়িয়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বিষয়ে অনেক কিছুই জানিতে পারিলাম যাহা পূর্বে জানা ছিল না। বইটি এত সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে মোহিত হইয়া যাইতে হয়। স্বামী অভেদানন্দের বাণী জাতির এক অমূল্য সম্পদ। তাঁহার নিষ্কাম কর্মযোগের বাণী ও অপরাপর অমূল্য উপদেশ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ এই পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেশের এই সঙ্কটময় সময়ে এইরূপ পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।

শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ সেন
শ্রীঅরবিন্দ মন্দির
D14/3B, Terhineem
Varanasi-1

(১৭)

…পূজনীয় গম্ভীরানন্দ মহারাজজীর হাতে আপনার (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) "যেমন শুনিয়াছি" বইটি দিয়া আসিয়াছি। তাহার পূর্বে আমি মোটামুটি পড়িয়া লইয়াছি। আমার ভাল লাগিয়াছে। যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহারা স্বামী অভেদানন্দের মনীষা ও সাধক চিত্তের পরিচয় পাইবেন।…

অধ্যক্ষ অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়
রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির
পোঃ বেলুড় মঠ ; হাওড়া

মহাজীবন

শ্রীভুপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
গ্রাম—বেলানগর, পোষ্ট—অভয়নগর ; জিলা—হাওড়া

(সমালোচনা)

(১)

"মহাজীবন" শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর জীবন কথা। সম্বুদ্ধানন্দজী স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, মহাপুরুষ। ঈদৃশ ক্ষণজন্মা জীবনের সঙ্গে আমরা যতই পরিচিত হই, ততই আমাদের মঙ্গল হয়, আমরা উচ্চভাবে ভাবিত হই।

ধর্মপ্রাণ ভক্ত গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত যত্নসহকারে ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর গুরুভক্তির অপূর্ব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন আলোচ্য "মহাজীবন" গ্রন্থখানির মধ্যে। সাধকপ্রবর কর্মযোগী সম্বুদ্ধানন্দজীর জীবন-কথা রচনায় গ্রন্থকার যে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা ভক্তিমান পাঠক-পাঠিকাকে অভিভূত না করে পারে না। সংসার-তাপক্লিষ্ট মানুষ এই মহান্ জীবন-কথা পাঠ করে পরম তৃপ্তি লাভ করবেন।...এরূপ একখানি সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশের জন্য গ্রন্থকারকে আমরা অসংখ্য সাধুবাদ দিই।

বসুমতী

(২)

একটি অপরূপ সুন্দর ভক্তিরসাশ্রিত বই। পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ মন্ত্রশিষ্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজীর অন্যতম একনিষ্ঠ সেবক ও শিষ্য স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের বিচিত্র জীবন-কথা এই "মহাজীবন" বইখানিতে সংকলিত হয়েছে। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের জীবনে আছে কতো অপূর্ব ঈশ্বরানুভূতি, বিদ্যা, স্মৃতি আর আছে ঈশ্বরের অপার করুণার অনন্ত অভিধার মহতী প্রকাশ। বইখানিতে সেই সব বিষয় অত্যন্ত নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। "মহাজীবন" বইখানিতে রচনারীতি চমৎকার। ঝরেঝরে গল্পের মতো করে এই পবিত্র জীবন কথা ও তৎসংশ্লিষ্ট নানা ঘটনা মনোরম ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

বেতার জগৎ

(৩)

আলোচ্য "মহাজীবন" একখানি জীবনী গ্রন্থ।...ব্রঃ সম্বুদ্ধ চৈতন্যের জীবনের মুখ্য ঘটনা—১৯২৩ সাল হতে স্বামীজী মহারাজের মহাসমাধির দিনটি পর্যন্ত (১৯৩৯) ষোড়শ বর্ষকাল সেবক-শিষ্যরূপে তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের শান্ত-স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় লাভ। দীর্ঘদিনের এই পুণ্য সাহচর্যলাভের ফলশ্রুতিরূপে রয়েছে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনের বহু জ্ঞাত-অজ্ঞাত ঘটনাবলীর উল্লেখ। এইজন্য এই অধ্যায়টি পাঠকালে পাঠকমাত্রেরই মনে হবে যেন স্বামীজী মহারাজের স্মৃতি চারণাই পাঠ করছেন তাঁরা ব্রঃ সম্বুদ্ধ চৈতন্যের কথোপকথন ও আলোচনার মাধ্যমে। এটি লেখকের রচনানৈপুণ্যের সার্থকতা প্রমাণ করে সন্দেহ নাই।...শ্রীশ্রীসারদাদেবী, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের বহু চিত্রসম্বলিত পুস্তকখানির প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই উত্তম। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

(৪)

"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"—এই মরজীবনে যাঁদের মধ্যে এই গুণের বিকাশ বা আধিক্য দেখা যায়, মানুষ তাঁদের প্রতিই হয় আকৃষ্ট, তাঁদের ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।...স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ এমনই একজন মানুষ। তাঁরই জীবনকথা বিবৃত হয়েছে এই পুস্তকে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অধ্যায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাই-ঝি বেলা দেবীর কথা, রামকৃষ্ণ মঠ ও তার সংশ্লিষ্ট মহান্ পুরুষদের কথার সঙ্গে স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দের কথাও আছে এই পুস্তকে। "মহাজীবন" সত্যই এক মহাজীবনের আলেখ্য। এই পুস্তক নিশ্চয়ই আদৃত হবে।...

(৫)

"মহাজীবন" গ্রন্থটি পাঠে জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য মণীন্দ্রনাথের (পরবর্তীকালে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ পুরী) বাল্য-কৈশোরের ভক্তি ও গৌতম-বুদ্ধ-প্রীতি, কৈশোর-যৌবনে স্বামী অভেদানন্দের শিষ্য-সেবকত্ব লাভ, পরিব্রাজকরূপে

সম্বুদ্ধানন্দের ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহলে বৌদ্ধ ও হিন্দু তীর্থভ্রমণ ও বেলানগরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা এবং সেই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ-ব্রহ্মানন্দ-অভেদানন্দ প্রমুখ রামকৃষ্ণ-লীলাসহচরদের শ্রুত-অশ্রুত আকর্ষণীয় বেশ কিছু কাহিনী যা গ্রন্থটির মূল্য বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।...সুভাষচন্দ্রের "সমাজের নিম্নস্তরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব" ও ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের "শ্রীবুদ্ধ" শীর্ষক দুটি বক্তৃতার সংকলনও গ্রন্থটিকে মূল্যবান করে তুলেছে।

(৬)

...স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের এই জীবন কথাটি একাধারে আধ্যাত্মিক সাধনা এবং কর্মব্রতের একখানি দৃষ্টান্তস্থল। এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি স্বামীজি স্বয়ং অনুমোদন করেছেন। অতএব, এর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আনন্দবাজার পত্রিকা

(৭)

যাঁহার জীবন কথা এই গ্রন্থ, তিনি গুরুকৃপাধন্য—সত্যই মহাজীবনের অধিকারী। গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেবের অন্যতম পার্ষদ কালী তপস্বী, শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। সম্বুদ্ধানন্দজীর অপূর্ব জীবন কথা সহজ সরল ভাষায় বলিয়াছেন। প্রকাশভঙ্গী মনোরম, ফলে গ্রন্থটি হইয়াছে প্রাণস্পর্শী। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহাও সোনায় পরিণত হয়। এ কি শুধু কথার কথা? না,—তাহা নয়। গুরু-কৃপা রূপ স্পর্শমণির স্পর্শে সম্বুদ্ধানন্দজীর জীবন কিভাবে অনন্য সাধারণ—মহাজীবনে পরিণত হইয়াছে তাহার বিস্ময়কর কাহিনী গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্য যখন আমাদিগকে মোহান্ধ করিয়া জড়ের উপাসনাই একমাত্র ধর্ম বলিয়া বিভ্রান্ত করিয়াছে, সেই স্থলে এমন একটি অধ্যাত্ম জীবন, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে চলিবার সঠিক পথ নির্দেশ করিবার প্রতিশ্রুতি এই গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসুদর্শন

(৮)

"মহাজীবন" বইখানা কি যে অপূর্ব হয়েছে তা' ভাষায় ব্যক্ত করবার ক্ষমতা আমার নাই। জগতে একমাত্র রবিই রবিকে প্রকাশ করে। অন্য কিছুর দরকার হয়নি, সেইরূপ এই "মহাজীবন" বইখানা হয়েছে। বইখানা যে কতবার পড়েছি, তার ইয়ত্তা নাই, সব সময়ই মনে হয় নূতন।

স্বামী পূর্ণানন্দ (পণ্ডিচেরী)

(৯)

"মহাজীবন" বইটি পড়িয়া খুবই আনন্দ পাইয়াছি। লেখক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের জীবনের ঘটনাগুলি অতি সুন্দরভাবে লিখিয়াছেন। "মহাজীবন" বইটি পড়িয়া বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বর্তমান ভারতের একজন মহান্ সাধক এবং যোগী। তাঁহার নিষ্কাম কর্মযোগ এক মহান আদর্শ স্থাপন করিয়া অনেককেই অনুপ্রাণিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ সেন

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

D14/3B, Terhineem, Varanasi-1.

(১০)

"মহাজীবন" গভীর আগ্রহের সহিত পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আপনি (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) মহৎ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ,—এই আমার ধারণা ছিল ; কিন্তু আপনার কর্মময় মহাজীবন ও পরিব্রাজক অবস্থার তথ্য প্রায় অজ্ঞাত ছিল।···আপনার মহাজীবন কিছু যেন বুঝিতে পারিতেছি। শ্রীভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবন দান করিয়া সকলের মঙ্গল করুন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায়

(১১)

"মহাজীবন" পড়েছি। খুব ভালো লাগল।···শ্রীগুরুপাদপদ্মে এমনভাবে আত্মসমর্পণ একান্তভাবে বিরল এই কলিযুগে। আপনি সত্যই নিজের 'অহং' (ego) বিসর্জন দিতে সমর্থ হয়েছেন শ্রীগুরুর সংস্পর্শে।···শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর দীপ্ত ছটায় "রবি" আরো ভাস্বর হয়েছেন, আরো তেজোময়

হয়েছেন, আরো প্রখর হয়েছেন।...আপনার জীবন সত্যিই "মহাজীবন।"... বইটি পড়ে আমার মনে হয়েছে—ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ, উভয়ে হাত ধরাধরি করে চলেছে আপনার জীবনে।...মহাজীবন শুধুমাত্র একজন ভক্তের জীবনই নয়,—এক মহাপ্রাণ কর্মযোগীর জীবনীও বটে।

অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
New Ramnagar, Orai (U. P.)

(১২)

"মহাজীবন" বইখানা একবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়া হইয়া গিয়াছে। অনাবিল আনন্দে মন ভরিয়া গিয়াছে। আপনি ৺প্রভুর অতি আদরের শিশু-সন্তান। সেই চিত্রটিই সারা বইখানির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।...অনাড়ম্বর, স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল ভাস্বর পবিত্র সর্বত্যাগী সাধকজীবনের একটি অপূর্ব রূপায়ন এই বইখানি।...বইখানিতে আতিশয্য নাই, অসঙ্গতি নাই। সর্বোপরি লেখক নিজেকে কোথাও জাহির করেন নাই। সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে সব কিছুই সুন্দর সুসমঞ্জস ও যথাযথভাবে লিখিত হইয়াছে। পড়িয়া শান্ত আনন্দে মন ভরিয়া গিয়াছে, আশা করি অন্যেরাও বইখানি পড়িয়া অপার্থিব রাজ্যের আনন্দ আস্বাদন করিবে।

জ্যোতির্ময়ী সরকার

(১৩)

'মহাজীবন' বইখানার পাতা উল্টাতে বসি—পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ বই-এর লেখার মধ্যে চোখ পড়ে গেল।...পাতার পর পাতা দ্রুতগতিতে পড়ে যাচ্ছি—বইখানার ভাষাই যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে।...পড়ছি আর মুগ্ধ হচ্ছি—অভিভূত হচ্ছি। ভাষা ও ঘটনাবলী শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করছে।

চারু চৌধুরী
গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান—কলিকাতা কেন্দ্র
১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

(১৪)

ভূপতিবাবুর (শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিত) "মহাজীবন" পড়িয়া আনন্দ লাভ করিলাম। আপনার (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) সেবকরূপ, তপস্বিরূপ, কর্মিরূপ ও প্রেমিকরূপ বইখানিতে সুন্দর রূপায়িত হয়েছে। সেই সঙ্গে আপনার পরিব্রাজকরূপটি সংযোজিত হওয়ায় বইটি সুখপাঠ্য হয়েছে।

অধ্যক্ষ অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়
রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির

(১৫)

(শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র হইতে।)

আপনার রচিত অসামান্য গ্রন্থ "মহাজীবন" পাঠ করে কৃতার্থ বোধ করেছি। মাত্র তিন শত ষাট পৃষ্ঠার মধ্যে গুরুজী মহারাজ সম্বুদ্ধানন্দের মহাজীবন রূপায়িত করা প্রথমে অসম্ভব বলেই আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু পাঠ করে দেখলাম, আপনি আশাতীত ভাবে সফল হয়েছেন।

...আপনার সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠার গ্রন্থ একটি সুন্দর দর্পণ—যার মধ্যে একটি বিরাট জীবনের বিশাল প্রতিচ্ছায়া ধরা পড়েছে। সেই মহাজীবনের মহিমা আপনার রচনায় কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি।

...সাধুবাদ জানাই আপনার রচনাকে। কারণ, আপনার রচনায় ভাষার চাতুরি নেই, আছে সত্যনিষ্ঠা ;—অলংকারের বাহুল্য নেই, আছে সহজ সরল সুষমা। আর, সেই কারণেই আপনার রচনায় সরল মানুষ গুরুজীর মহাজীবন স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। আপনার গ্রন্থ পড়তে পড়তে কৈলাসপতির মতো তাঁর আনন্দময় মূর্তি বার বার দেখতে পেয়েছি, অনুভব করেছি আমার চেতনায় তাঁর উপস্থিতি। আপনার রচনার সার্থকতা এইখানে।...

গুরুজী মহারাজের মহাজীবন যেন গঙ্গাধারা—অভেদানন্দরূপ গোমুখী থেকে উৎসারিত হয়ে সারা ভারতের তীর্থ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বহু সাধু-সন্তের সঙ্গ করে পরমানন্দের মহাসাগরে মিশেছে। ভাবলে বিস্ময় বোধ হয় যে, এক জীবনে ভারতের সমস্ত তীর্থ পরিক্রমা করা কী করে সম্ভব! একমাত্র পরিব্রাজক সম্বুদ্ধানন্দের পক্ষেই বোধ করি সম্ভব।

শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতের বাইরে সিংহল ভ্রমণ বুদ্ধানুরাগী সম্বুদ্ধানন্দের জীবনের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। সিংহলের মিহিন্টাল পাহাড়, স্বামী পাহাড়

প্রভৃতি প্রত্যেকটি পর্বত, চৈত্য ও মন্দির তিনি দর্শন করেছেন। হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ সাড়ে দশ মাইল জঙ্গল—পথ ভেঙ্গে তাঁর কাতারগাম তীর্থদর্শন, য়্যাডাম্‌স্‌ পীক বা সমানকূট পরিভ্রমণ গুরুজী মহারাজের প্রাচ্য ঐতিহ্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাই প্রকাশ করে। স্বামী পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত স্বামী মন্দিরের চারপাশের নৈসর্গিক শোভার বর্ণনা অপরূপ। ঊর্ধ্বে দিগন্তপ্রসারী মহাকাশ, নিম্নে আদিগন্ত সুবিশাল সাগর! মনে হয়, এইখানেই স্বামীজী অনন্তের স্বাদ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

"মহাজীবন" গ্রন্থপাঠে জানা যায়, গুরুজীর শুধু ধর্মজীবনই বিশাল নয়, কর্মজীবনও বিরাট। প্রমাণ বেলানগর আশ্রম, দন্তমন্দির এবং বেলানগর রেলস্টেশন। তাই ভাবি, তাঁকে ধর্মবীর বল্‌ব, না কর্মবীর বল্‌ব?

এই গ্রন্থ বিক্ষুব্ধ জীবন-সাগরে আমার মতো পথসন্ধানী মানুষের কাছে পথের ইঙ্গিত, অশান্ত চিত্তে শান্তির আলো।

এমন গ্রন্থ রচনায় কল্যাণ,—পাঠেও কল্যাণ। আপনার গুরুসেবার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই "মহাজীবন"। আপনার সাহিত্যিক ক্ষমতার পরম সার্থকতা এই গ্রন্থ প্রণয়নে।......

প্রণব রায় (গীতিকার)

(১৬)

"মহাজীবন" বইখানি পড়িয়া শান্তি লাভ করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন 'সাধুসঙ্গ' করিতে। এই বইখানি পড়িতে পড়িতে প্রতি মুহূর্তে মনে হইতেছিল, —সত্যজ্যান্ত 'সাধুসঙ্গ' করিতেছি। এক অপূর্ব অনুভূতি এবং অভূতপূর্ব আনন্দের সঙ্গ। যেখানেই সাধুসঙ্গ সেখানেই আনন্দের ধারা। তাই বইখানি লইয়া যখনই পড়িতে বসিয়াছি, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দরসের আপূর্ণ আস্বাদন পাইয়াছি।

...মহারাজজীর ভ্রমণবৃত্তান্ত কাহিনী মৌলিকতাপূর্ণ এবং অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ (educative)। বিশেষ করিয়া সিংহল দেশের এবং গোমুখীস্থানের প্রতিটি বিবরণ কথন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রণিধানযোগ্য এবং ইতিহাস-জ্ঞানে গ্রহণযোগ্য। কাজেই এই বইখানির ঐতিহাসিক মূল্যায়নও যেন রহিয়াছে।

আত্রেয়ী মজুমদার

১৯শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ সাল

শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রণাম
মন্ত্র রচনা করিয়া সেবক শিষ্যকে দিলেন ;

ত্রেতায়াং যোঽভবদ্ রামঃ শ্রীকৃষ্ণো দ্বাপরে তথা।
রামকৃষ্ণঃ কলৌ সোঽয়ং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

পাঠশুদ্ধি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হইবে
৯	১	প্রত্যবর্তন	প্রত্যাবর্তন
১১	২৪	Reincernation	Reincarnation
২১	৬	love	Divine love
২১	৭	of	to
২১	১৩	পনর্জন্মবাদ	পুনর্জন্মবাদ
২৯	২৬	অসামান্ত	অসামান্যা
৩৮	১০	চিয়দিন	চিরদিন
৩৯	১৪	খেন্নে	খেয়ে
৪৮	১০	সাংসারে	সংসারে
৬১	১৯	যাবে	যবে
৬২	১৫	ভদ্রোলোকের	ভদ্রলোকের
১০৪	২২	শাস্ত্রাণি	শস্ত্রাণি
১২৪	৭	করে	করে
১২৪	১৭	করে করে	কবে
১৩৫	১৪	Barhma	Brahma
১৩৭	২১	স্মশন	স্পৃশন্
১৪২	১৪	পোগীদের	গোপীদের
২০১	১৩	যেই	যে
২৩৩	৮	সুরেশবাবুর	সুরেনবাবুর
২৩৩	১০	সুরেশবাবুর	সুরেনবাবুর